বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

[১৯০১-১৯৫২]

প্রথম খণ্ড

(উপন্যাস)

অনিল বিশ্বাস

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা

নিরর্থক চরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারা বেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—

*   *   *

সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হ'তে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।

—রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবী,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, পি-এইচ্-ডি
মহোদয়ের করকমলে—

নিবেদন

আনবিক যুগের দানবিক লীলায় পৃথিবী আজ হাঁপিয়ে উঠেচে। এর উৎসমূলে আছে যে লোভ তাকে "লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো" আর এ "দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত।" তাই তো চারিদিকে নেমেচে ধ্রুবতারাহীন অন্ধকার। ঘর বাড়ি ভেঙে যাচ্চে, সংসার উবে যাচ্চে নটরাজের এই তাণ্ডবে। রণদেবের দামামা বাজচে, ক্রন্দসী কাঁদচে বোমার ধারায় আর ট্যাঙ্কে বিমানে ছেয়ে গেচে দিক। এতে মনে হয় এ জীবন না মৃত্যু। বস্তুত এ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কত কথাই না মনে আসচে। সংস্কৃতি আজ বিপন্ন; এর আয়ুষ্কাল আর কতদিন। পুত্রের জন্ম দিয়ে মা যে আজ তার কাছেই বন্দিনী। সভ্যতা পরশুরামের মতো কামানে-বিমানে টহল দিচ্চে মাতৃহত্যার পাপে। রাজনীতি হ'লো এর অভিশাপ। তাই মানুষ আজ ক্ষতবিক্ষত। তার কণ্ঠে কেবলি উৎসারিয়ে উঠচে—

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে,
সামনে মরু অস্থিসমাকুল;
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিলো আজকে মোরে,
অস্তমিত বিধির আমি ভুল।

এ-পরিস্থিতিতে সৃষ্টির কাজ, বিশেষ ক'রে শিল্পসৃষ্টি এক রকম অসম্ভব। এর জন্যে যে পরিবেশ, অবকাশ ও সংযমের দরকার, এখানে তা অনুপস্থিত। আবেষ্টনীর প্রতিকূলতা ছাড়াও আছে উপাদানের অপ্রতুলতা। এরি সঙ্গে যুক্ত হয়েচে বাঙালীর চারিত্র দৈন্য যা উচ্ছ্বাস-প্রবণতা ও ইতিহাস-বিমুখতার দু'টো ডানায় এগিয়ে চলেচে। ফলে বিজ্ঞান ও ইতিহাস রয়ে গেচে সাহিত্যের উপেক্ষিত। ইউরোপীয় সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্য তাই এগোয়নি। ইতিহাসের তো কথাই নেই। বহু আগে বঙ্কিমচন্দ্র এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন: "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।" হাল আমলে অবিশ্যি বাঙালী মনীষা এদিকে অনুসন্ধিৎসার আলো ফেলেচে। কিন্তু গবেষণা তেমন কোন মৌল আবিষ্কারে সমর্থ হয়নি। তবুও এসব প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, এতে ক'রে সম্ভব হয়েচে ইতিহাসের অগ্রগতি। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও এসেচে প্রগতিচর্যা। তাই বিশ শতকের সাহিত্য-ইতিহাস লিখতে ব'সে অসুবিধা হয়েচে অনেক দিক থেকেই। পূর্বগদের পরিক্রমা যেমন সীমায়িত, তেমনি আছে লেখনের সন-তারিখের অনুল্লেখ। লিখিয়েদের কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জীর অভাবও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপাদান ছাড়া ও ব্যক্তিক জীবন থেকে এসেচে বাধার কিছুটা। আমার কর্মজীবন

এক বিরাট যন্ত্রদানব, যা গোটা জীবনটাকে গ্রাস করবার জন্যে সদাই চেষ্টিত। এখানে রঙ্গমঞ্চ আছে, কিন্তু নেপথ্য বুঝি-বা একেবারেই নেই। তা সত্ত্বেও এ-গোলকধাঁধা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি এসেচে কর্তব্যের নিয়ম-মাফিক পরিচালনায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে বেশি কাজ করবার সুবিধা ও ক্ষমতা আসে। এখানেও হয়েচে তাই।

সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় অনুসৃত হয়েচে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ভাবধারার বিকাশে দেশ ও কালের দাবী অনস্বীকার্য। ভাববিন্যাস তাই রূপায়িত হয়েচে দেশ-কালের সন্ততি হিসেবেই। এতে মিশেচে ভাষার যাদুও। বস্তুত ভাব ও ভাষার যৌথরূপই সাহিত্যায়ন আর এর কেন্দ্রক হ'লো উপলব্ধির স্বকীয়তা। পূর্বসূরীরা মালমশলা জোগালেও, দিতে পারেননি এ-অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান। তাই ভিন্ন ভিন্ন বাগিচার ফুল নিয়ে যে মন্তব্যের মালা গাঁথা হয়েচে, তা লেখকের নিজস্ব। এরজন্যে প্রশংসা বা নিন্দা তারি প্রাপ্য। বইয়ের পরিকল্পনায় শব্দচয়নের নতুনত্ব লক্ষণীয়। পরিভাষায় প্রয়োজন অনুভূত হয়েচে চিন্তনের জটিলতার জন্যে। তাই তো নতুন নতুন শব্দতৈরি। নয়নিমায় ধরা পড়বে জীবিত লেখকের "শ্রী"হীনতাও। এও প্রয়োজনধর্মী। বইয়ের কলেবর কমানোর জন্যেই এ-প্রচেষ্টা। এ বই পথিকৃৎ এই হিসেবে যে গোটা বিশ শতক নিয়ে আলোচনা এর আগে আর হয় নি। এই বাহান্ন বছরের ইতিহাসে দাগ কেটেচে সাহিত্যিক রূপগুলি। এরি পরিচয়ে পাওয়া যাবে গোটা যুগ-সংস্কৃতির এক ঝলক প্রাণন। এ-কাজ দুরূহ। তাই ভুল-ত্রুটী এর স্বাভাবিক বাসিন্দা। এ দূরীকরণে সুধীজনের সাহায্য প্রার্থনীয়।

বর্তমান পরিস্থিতির বেদনা মিশিয়ে উপহার দিলাম এ-বই। এতে মানবতার ক্রন্দনই ফুটেচে। পাঠক যদি এ-থেকে জাতির ভাব-ধারার কিছুটা পরিচয় পান, তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করবো। বাঙালী জাতির তথা সংস্কৃতির যে বিপদ আজ ঘনীভূত, বারে বারে শুধু তাই ভেসে আস্‌চে। কি ক'রে জাতি ও সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে আজকের প্রশ্ন তাই। জাতি না বাঁচলে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই। এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করচি। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির এরকম মিশোল এর আগে আর ঘটেনি। গোটা জীবনটাই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন যার হাঁ-এর মধ্যে জড় হয়েচে শুধু জীবিকাবৃত্তি। এতে মনন বা অধ্যাত্মায়ন, যা মানুষের উদ্বৃত্ত ধন, তার কোন স্থান নেই। সভ্যতার এ-সংকটে তাই দরকার হয়েচে সংস্কৃতি-ধারক ও বাহকের। আজ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাবচি ৩০০০ খৃস্টাব্দের কথা, যখন বিজ্ঞানের নতুন গবেষণায় দেশের এ-অবস্থা থাকবে না। প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় বর্তমান যুগকে টেনে বের করা হবে, সংগৃহীত হবে নতুন মালমশলা, রচিত হবে সাহিত্যের নতুন ইতিহাস। তখন হয়ত বর্তমান বইয়ের কদর তেমন থাকবেনা। এর মূল্য তখন থাকবে বিরাট বাংলা সাহিত্যের ইমারতের ইট হিসেবে। তাই কালের বৈনাশিক দৃষ্টিতে এ পুড়ে গেলেও এর সমসাময়িক উপলব্ধির রস নিশ্চয়ই সহৃদয় পাঠকের কাছে ধরা পড়বে। ভবিষ্যৎ নিয়ে যাবে নব নব বিজয় যাত্রায়, এ-আশা

চিরকালই তার বুকে ধুকপুক করে। এ না হ'লে বাঙালী মানসের দৈন্যই প্রকাশ পাবে। কাজেই যুগ-পরিচায়ক এ ইতিহাস রইল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, যা স্মরণ করিয়ে দেবে শতাব্দীর পর শতাব্দীকে—

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।

এ বই খণ্ডশঃ বেরোবে। তিন খণ্ডেই শেষ হবে। প্রথম খণ্ডে থাকবে উপন্যাস; দ্বিতীয়ে ছোট গল্প, কবিতা ও নাটক; আর তৃতীয়ে প্রবন্ধ ও শাখাসাহিত্য। এ-ভাবেই "বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য" শেষ হবে।

এবার ঋণ-স্বীকৃতির পালা। উপাদানের জন্যে রইল গ্রন্থপঞ্জী আর সংগ্রাহক হিসেবে শান্তিনিকেতন, হেতমপুর, কুর্মিঠা, সাঁইথিয়া, শিউড়ি, লাভপুর, কীর্ণাহার প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগার। এ-ছাড়া আছেন সাহিত্যরসিক সুধীবৃন্দ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপদ ঘোষ, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুকুমার দত্ত। এঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশ এম, এ মহাশয়কে। এঁর মতো বিদগ্ধমনা বন্ধু খুব কমই পাওয়া যায়। বর্তমান বইয়ের উৎসাহ ও পরিকল্পনা এসেচে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। ইতি—

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ অনিল বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

কথারম্ভ

বাংলা সাহিত্য বর্তমানে যেরূপ পেয়েচে তার পেছনে আছে শতাব্দীর সাধনা। যুগে যুগে বেড়েচে এর কলেবর, গড়ে উঠেচে এর স্বাতন্ত্র্য। এ সম্ভব হয়েচে ভাষা ও লিপির মাধ্যমে, দেশ ও জাতির যুক্ত সাধনায়। এর বিকাশধারা বয়ে চলেচে বিবর্তনের প্রবাহে। কিন্তু বিবর্তনের গঙ্গোত্রী হ'লো বিপ্লব। ইতিহাস-পুরুষ চলে বিবর্তনে, বিপ্লবের পদক্ষেপে; কাজেই স্রোতস্বিনীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ে প্রয়োজন আছে উৎসমূলেরও।

(১) গোড়ার কথা

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যে নর-প্রবাহ চ'লে এসেচে, তাতেই গড়ে উঠেচে বাঙ্গালীর 'জন'-সাংকর্য। এর নির্মাণকার্যে সহায়তা করেচে কত না "দ্রাবিড়", "কোলিড", "মেলানিড" ও "পূর্ব ব্রাকিড" ধারা। নিগ্রোবটু ও মঙ্গোলীয় ধারারও আমেজ লেগেচে কিছুটা। এ সবের মিশোলে তৈরি হয়েচে বাঙ্গালী। এ নাম এসেচে দেশ থেকে। এখন যে দেশ পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় বিভক্ত তা পুরাকালে আঞ্চলিক নামেই অংশত পরিচিত ছিলো। বঙ্গ-গৌড় পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, রাঢ়-সমতট, বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি ছিলো এক একটি অংশ। তুর্কী-বিজয়ে ঐক্য এলো, আর গোটা দেশ "বাংলা" বা "বাঙ্গাল" নামাঙ্কে চিহ্নিত হ'লো। এ নাম অবিশ্যি ফারসী "বাঙ্গালহ্" থেকে এসেচে, যার বিস্তার ছিলো চট্টগ্রাম থেকে গর্হি পর্যন্ত। শশাঙ্কের সময় থেকেই গৌড় ও বঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লে এসেচে, যার পরিচয় মেলে ঔরংজীবী "গৌড়মণ্ডলে" ও মধুসূদনী "গৌড়জনে"। এ-যুদ্ধে জয়লাভ করেচে 'বঙ্গ', যা পাল-সেন আমলেও 'গৌড়ের' কাছে লাঞ্ছিত ছিলো। তুর্কী-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গ' জয়যাত্রার পথে এগিয়ে এসেচে, যা কায়েম হ'লো ব্রিটিশ শাসনে। তাই আজ দেশ হিসেবে "বাংলা" ও জাতি পরিচায়ক "বাঙ্গালী" চলচে ভাষায়।

জাতি ও দেশ

এই ভাষা এসেচে মাগধী প্রাকৃত থেকে। অবিশ্যি দূরযানী দৃষ্টিতে দেখা যায় এর আদি বৈদিক ভাষাকে, যার যাত্রাপথ আলোকিত হয়েচে সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশ-অবহট্‌ট্ড এ। বাংলারও বিবর্তনে ধরা পড়ে তিনটি স্তর—আদি, মধ্য ও আধুনিক। এর মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে "বৌদ্ধগান ও দোহা," "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" ও ইংরেজি আমলের লেখন। ভাষার লেখ্যরূপই

ভাষা ও লিপি

হ'লো লিপি, যা উচ্চারণকে বর্ণমালায় স্থায়ী করে। ভারতীয় লিপির ইতিহাসে "খরোষ্ঠী" ও "ব্রাহ্মী" আসন দখল করেচে। প্রথমটি সেমীয় আর দ্বিতীয়টি মোহেঞ্জোদড়োর মুদ্রালিপি থেকে যাত্রা সুরু করে একটা পরিণতি পেয়েচে সপ্তম শতকে। অশোক, কুষাণ ও গুপ্ত যুগ অবিশ্যি জুগিয়েচে এর পথের পাথেয়। এ পরিণতি হর্ষবর্দ্ধনে এসে ভেঙ্গে ত্রিধা হ'লো শারদা, নাগর ও কুটিলে। ব্রাহ্মীর এই কুটিল রূপই বাংলা হরফ যা পাল-সেন লিপির মারফতে পৌছেচে হাল আমলে। মাঝখানে হ্যালহেডের ব্যাকরণে এ ছাপাযন্ত্রের ছাপ পেয়েচে [১৭৭৮ খৃঃ]।

বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদ' থেকে প্রাক্-বিশ শতক পর্যন্ত বয়ে চলেচে স্রোতো-বেগে। এর বাঁকের পরিচয় মেলে গীতিকা, পাঁচালী, ধ্রুপদী ও খেয়ালী নামাঙ্কে।

যুগ-বিভাগ

গীতিকা পর্ব [৯৫০—১৭১১ খৃঃ] তন্ময় কবিতার যুগ। এর উপজীব্য হ'লো অধ্যাত্মায়ন, যা কখনো প্রকাশ পেয়েচে বৌদ্ধ সহজিয়া দোহায় কখনো বা বৈষ্ণব পদাবলীতে। মাঝখানে অবিশ্যি পড়ে শিবায়ন। তবে এখানে তন্ময় কাব্যায়নেরই প্রাচুর্য। ভাগবতকে আশ্রয় করে যে বিরাট বৈষ্ণব কাব্যের জোয়ার এলো তার ভগীরথ হ'লেন শ্রীচৈতন্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হ'লেন বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা। সত্যি, "বাঙ্গালীর হিয়া—অমিয় মথিয়া" নিমাই কায়া ধরলেন রাধাকৃষ্ণ, গৌর, ভজন ও রাগাত্মিকার চতুরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালীর ধাঁচও নিরূপিত হ'লো। ফলে কাশীরামের 'মহাভারত' মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' ও ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' রচিত হ'লো আর্য, অনার্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্যোতক হিসেবে। **পাঁচালী পর্ব** [১৭১২—১৮০০] একদিকে যেমন এর উৎকর্ষের পরিচায়ক অন্যদিকে অবক্ষয়ের সূচকও। ভারতচন্দ্র নবাবী সূর্যাস্তচ্ছটার শেষ বিচ্ছুরণ, যা সাহিত্যের গোধূলি আকাশে ছড়িয়ে গেল। এরি ফলে দেখা গেল কবিওয়ালাদের, যাঁরা চিতান-পরচিতান—ফুকা-মেলতা ছন্দবৈচিত্র্যে আসর জমালেন। তাই বিবর্তনে পাঁচালীর প্রান্তে এলো **ধ্রুপদী পর্ব** [১৮০১—১৮৫৭]। এ-যুগে গদ্যের ভিৎ পাকা হ'লো আর কাব্যে নতুন পুরনোর দোটানায় এলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় বাংলা সাহিত্যসেবীর সংখ্যাও বেড়ে গেলো। তন্ময়তায় এগিয়ে এলো **খেয়ালী পর্ব** [১৮৫৮—১৯০০], যার প্রকাশ ফুটে উঠলো নাটকে, কাব্যে ও কথা-সাহিত্যে। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনাই এর লক্ষ্যবস্তু। একে কেন্দ্র ক'রে দানা বেঁধে উঠলো গীতিকার প্লাবন। গীতিকা পর্বের অধ্যাত্মায়নের জায়গায় এলো প্রেমের উচ্ছ্বাস, যা বিশ শতকের তটে এসে ভেঙ্গে পড়লো।

(২) শতাব্দী ও সাহিত্য

সংস্কার অতি দুর্মর। মনে বাসা বাঁধলে একে তাড়ানো কষ্টসাপেক্ষ। এর পরিচয় মেলে সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক প্রতিফলনের রূপে। বাহ্যজগৎ যেমন যোগদৃষ্টিতে মায়া ব'লে প্রতিভাত হয় বাঙ্গালী সাহিত্যরথীদেরও হয়েচে তাই। বাস্তবায়নের চেয়ে আদর্শায়নই তাদের পেয়ে বসেচে। ফলে কালাতিক্রমণই চোখে পড়ে। এর মূলে বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতাই কাজ করে যাচ্চে। তাই সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস ফোটেনি বাংলা সাহিত্যে। এই বিবর্তন দীপক, ধ্রুপদী, সামন্ত, বুর্জোয়া ও প্রোলেটারীয় স্তর-বিন্যাসে লক্ষণীয়। বাংলা ভূমিজ সভ্যতারই দান! কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার চেয়ে অধ্যাত্মায়নই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে, যেমন চর্যাগীতিকায়। ভূমিজ সমাজের চেয়ে ধর্মজ আদর্শই এখানে জয়ী হয়েচে! ফলে দীপক গাথার অনুপস্থিতি পীড়া দেয়।

বস্তুনিষ্ঠার কিছুটা হদিশ মেলে অবিশ্যি পাচালী কাব্যে। তবে রাজবৃত্তের সামন্ততন্ত্রই এর উপজীব্য। বাংলার সমাজবিন্যাস চলেচে ভূমি বর্ণ ও রাষ্ট্রের ত্রিধারায়। ভূমিব্যবস্থা মোঘলবিজয় পর্যন্ত মোটামুটি সামন্ততান্ত্রিক ছিলো। রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণে ভূস্বামীরাই সমাজের কেউকেটায় পরিণত হয়েছিলেন। এর পর মোঘল আমলে কেন্দ্রানুগ শাসনব্যবস্থায় ভূস্বামীরা রাজস্ব-সংগ্রাহকের পর্যায়ে অবনমিত হলেন। ইংরেজ আমলে এদের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'লো। এদিকে বর্ণভিত্তিতেও চিড় ধরতে লাগলো। সেন-পর্বে অনেক জাতির উন্নয়ন-অবনয়নও হয়েচে। তার পর রাষ্ট্রিক তেমন কোন চাপ না থাকাতে ছুৎমার্গই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে।

শতাব্দীর পটে দাগ কেটেছে শ্রেণী-সংগ্রাম। ধর্মজ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে গোষ্ঠী। পাল-আমলের বৌদ্ধ আদর্শ সেনায়নের ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে কেমন পর্যুদস্ত হয়েচে তারি পরিচিতি বহন কচ্চে লৌকিক ছড়া "ধান ভানতে শিবের গীত"। বৌদ্ধ 'মহীপাল' এখানে ব্রাহ্মণ্য 'শিবে' রূপান্তরিত হয়েচে। তবুও বৌদ্ধ ধর্ম-দেবতা টিকে রইল ধর্মমঙ্গলে। ঐস্লামিক প্লাবনের মুখে এলো বৈষ্ণবায়ন। এতে জাতির দুরবস্থাই ফুটেচে বিরহ চিত্রণে। বাংলা দেশে সামন্তরাই আসন দখল করেচে। তাই জনসাধারণ রাষ্ট্রের চেয়ে এদেরকে চিনেচে বেশি। আদর্শের ভাঙাগড়ায় সমাজও ভেঙেচে গড়েচে। তবে এর বাস্তব রূপায়ন খুব কমই আছে সাহিত্যে। তাই সামন্ততান্ত্রিকতাই দেশের আকাশে বাতাসে কালো ছায়া বিস্তার করেচে। কল্পনার ডানা মাঝে মাঝে যখন মাটির ধরায় নেমে এসেচে তখনো সামন্তরাজের কান্না ফুটেচে, যেমন—

নেউগি চৌধুরী নহি না রাখি তালুক।

মোট কথা, জাতির জীবনায়ন শিল্পায়নকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। ভাব-বন্যার ঢেউই গড়িয়ে পড়েচে চোখেমুখে। তাই বন্যতা থেকে সভ্যতার উন্মেষের রূপ নেই

সাহিত্যচর্যায়। ব্রিটিশ শাসনে সামন্ততন্ত্র বুর্জোয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে সত্যি, কিন্তু গড়ে তুলেচে "বাবু সংস্কৃতি"ও। এরি কিছুটা পরিচয় মেলে উনিশ শতকী সাহিত্যে। 'সমাচার দর্পণে' [১৮২১] এর যে সূচনা, তা ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে 'নব বাবু বিলাস' [১৮২৩], 'আলালের ঘরের দুলাল' [১৮৫৭], ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' [১৮৬২]। এই বাবু-শ্রেণীই গড়ে তুলেচে মধ্যবিত্ত, যাদের দান হ'লো এ যুগের সাহিত্য। কাজেই শতাব্দীপরিক্রমায় সমাজের যে রূপ দেখা যায় তা প্রধানত ভূমিবর্ণরাষ্ট্রকেন্দ্রিক। কিন্তু সাহিত্যায়নে সামন্ততন্ত্রেরই বিকাশ লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে অবিশ্যি দীপক গাথা, ধ্রুপদী বস্তুনিষ্ঠা ও বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে। তবে অন্যান্য দেশে যেমন বাস্তব ভিত্তিতে গড়েচে সমাজচিত্রণ, এখানে তার অভাববোধই অনুভূত হয়। এ-দেশে আদর্শই বস্তু থেকে বেশি বাস্তব। প্রাণের লীলাই মনোবিহার অতিক্রম করে। এ উচ্ছ্বাস প্রাণপ্রাচুর্যেরই শ্রেষ্ঠ ফল। তাই বাংলা সাহিত্য বাংলা সমাজের সঙ্গে সমতালে চলেনি। এরি ফলে ধ্রুপদীর চেয়ে খেয়ালী জয়ী হয়েচে, তন্ময়ের চেয়ে মন্ময়, পাঁচালীর চেয়ে গীতিকা। তাইতো কালায়ন সাহিত্যকে সামাজিক পোষাকে তেমন সাজাতে পারেনি।

বাংলায় গোড়ার দিকে রাষ্ট্র ভূমিজ সংস্কৃতিকে তেমন কোন আঘাত করে নি। তাই রাজা বদল হ'লেও প্রজারা পরিবর্ত্তনের আস্বাদ পায়নি। বরাবরই গ্রাম রাষ্ট্র-আওতার বাইরে র'য়ে গেচে। তাই বাংলা সমাজ গ্রামীন—গা বাঁচলেই এ বাঁচে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এ কখনো মিতালি করেনি। এ-সমাজ আঁকড়ে ধরেচে বর্ণের অচলায়তনকে। বিপ্লবের শোন-পাংশুর দল একে আজও ভাঙতে পারেনি। জাত-বিচারের ছুঁয়াছুয়ি চাপিয়ে দিয়েচে জাতির বুকে এক বিরাট জগদ্দল, যার ফলে প্রগতির জয়োল্লাস লুপ্ত হয়েচে। তথা-কথিত অন্ত্যজরা সমাজ-বিন্যাসে অবহেলিত, উপেক্ষিতই র'য়ে গেচে। এখানে ব্যক্তির খেয়ালীপনাই শিল্পায়নের সহায়তা করেচে। তাই তো গীতিকাপর্বে দীপক ও ধ্রুপদীর মূল সুরই ধ্বনিত হয়েচে। ভারতীয় অধ্যাত্মায়ন সনাতন আদর্শ, যাকে নিয়ে বাংলা কাব্য যাত্রা সুরু করেচে। এ এগিয়ে চলেচে পাঁচালী পর্বে, যেখানে মিশেচে সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশও। ধ্রুপদী পর্বে কিন্তু এসেচে বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত, যা খেয়ালী পর্বেও বিস্তার লাভ করেচে। তাই দীপক-ধ্রুপদী আদর্শই রূপায়িত হয়েচে গীতিকায়, সামন্ততন্ত্র পাঁচালীকাব্যে, বুর্জোয়া ধনতন্ত্র মধ্যবিত্তের ধ্রুপদীখেয়ালী সাহিত্যচর্যায়। এভাবে শতাব্দী নিয়ন্ত্রণ করেচে সাহিত্যায়ন। তবে এ-নিয়ন্ত্রণের মাত্রা স্বভাবতই অল্প। রূপ ছেড়ে সাহিত্যিকের সাধনা ছুটেচে অরূপের সন্ধানে। তাই সীমার চেয়ে অসীম, রূপের চেয়ে অরূপই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। এর মূলে আছে বাঙালীর কর্মবিমুখতা, যা মায়াবাদের শ্রেষ্ঠ ফসল। তাই তার কামনা ঝিলিক দিয়ে উঠেচে: "প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।"

মানবসমাজের বিবর্তনে দেখা যায় তিনটী স্তর—বন্য, বর্বর ও সভ্য। সমাজ যেহেতু "মানুষের ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে স্থাপিত," তাই গোড়ায় ছিল সাম্যবাদী সমাজ। এ হ'লো মাতৃ-সত্তাক অর্থাৎ স্ত্রীপ্রধান। ক্রমে ক্রমে এ রূপায়িত হ'লো বর্বর সমাজে, যেখানে জনসত্তারও আবির্ভাব হ'লো। তার পর অবিশ্যি গ'ড়ে উঠ্‌লো পিতৃসত্তা। এরি পরিণতি বহন কচ্চে সভ্য সমাজ, যেখানে হয়েচে সামূহিক স্বার্থের বিলোপ ও ব্যক্তিস্বার্থের আবাহন। এরি ফলে এসেচে তিনটি অবস্থা—দাসতা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ। ভারতের গঙ্গা উপত্যকায় সাক্ষাৎ মেলে দাসতা ও সামন্তবাদের [১৫০০ খৃঃ পূঃ]। বাংলায় দাসতার তেমন চিহ্ন ঐতিহাসিক যুগে চোখে পড়ে না। এখানকার ইতিহাস হ'লো সামন্ততন্ত্রের রূপায়ন। সামন্ততন্ত্রের দুটো রূপ প্রতিভাত হয়েচে রাজতন্ত্রে ও প্রজাতন্ত্রে। পাল-সেন আমলে এর নজির মেলে। প্রজাতন্ত্রও রাজতন্ত্রেরই রকম ফের। শুধু তফাৎ হ'লো এই যে, প্রজাতন্ত্রে আছে জনসাধারণের সম্মতি, যা অনুপস্থিত রাজতন্ত্রে। এর পর তুর্কী-বিজয়ে দেশের অবস্থা বদলালেও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম ছিলো। ব্রিটিশ শাসনে কলকারখানার প্রসারের জন্যে এসেচে পুঁজিবাদের ছিটেফোঁটাও। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে বিবর্তনের গতি স্বভাবতই একটু মন্থর। এর কারণ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভিত্তি হয়েচে স্বীকৃত। সামাজিক বৈষম্য ধর্মায়নের স্তর বিশেষ। তাই শ্রেণী-সংগ্রাম চাপা পড়েচে। ফলে জনসাধারণ পুরনোকে আঁকড়ে ধরেচে, নতুনের জয়-গান গাইতে পারেনি। বাংলার জমি পলিমাটিতে উর্বর। তাই সেখানকার ফলন স্বভাবতই বেশি। এর জন্যে বাঙালী অর্থ সংকটের বীভৎস রূপ দেখতে পারেনি। সত্যিকার বিপ্লব তো অভাববোধে জন্ম নেয়। এখানে যেহেতু এই চেতনার অভাব, তাই সামাজিক বিবর্তন তেমন এগোয়নি। এ কথা যেমন বাঙালী জাতি সম্বন্ধে খাটে, তেমনি তার লিখিয়েদের সম্পর্কেও। শতাব্দীর বিবর্তনের রূপগুলি সাহিত্যের আসরে তেমন স্থান পায়নি। বাঙালীর সাধনায় অরূপরতনই জগদ্দল পাথরের মতো আছে চেপে। ফলে যে-পরিমাণে সমাজ এগিয়েচে, সে-পরিমাণে এগোয়নি সাহিত্য।

(৩) বিশ শতকের স্বরূপ

উনিশ শতকের উপান্তে বিশ শতক এসে ভেঙ্গে পড়লো। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে মনে হ'লো নবজাতক যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনি নিকৃষ্ট; যেমন আলো, তেমনি অন্ধকার; যেমন বিশ্বাস তেমনি অবিশ্বাস। আশা নিরাশার সমবায়ে মনে হ'লো এ-স্বর্গের সিঁড়ি আবার নরকের দ্বারও। এই যে বিরোধবিহার, এতে মিশেচে দুই শহরের রূপ। বস্তুত নবজাতকের চেহারায় ধ্বংসিলতার ছাপই বেশি। উনিশ শতকী বাবু-বিলাস এখানে হয়েচে আত্মসচেতন। মধ্যবিত্তশ্রেণী বুঝেচে

যে, তার পায়ের তলা থেকে খ'সে যাচ্চে ভিত্তির ইট। হিন্দু যুগের ভৌমসভ্যতা মুসলমান আমলে রূপান্তরিত হ'লো কেন্দ্রানুগ শাসন-ব্যবস্থায়। তাহলেও ভৌম কৌলিন্য একেবারে লোপ পায়নি। এর উপর বর্ণের অচলায়তন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আর্থিক দিকটা তেমন প্রকট হয়নি। রাজা শুধু রাজস্বসংগ্রহে দৃষ্টি দিয়েচে আর চেষ্টা করেচে স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষায়। এর পর ব্রিটিশ আমলে বিদিশিয়ানার ঢেউ ভেঙে পড়লো ভৌম আভিজাত্যে। এখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নিজের আত্মরক্ষা করলো। ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের দাবী দাবায়, এতেও চিড় ধরলো। তাই উদ্ভব হ'লো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যা ভৌম আভিজাত্যেরই রকমফের। গোটা উনিশ শতক তাই এগিয়েচে এর কর্মবিস্তারে। কিন্তু শতাব্দীর শেষ পাদে দেখা দিলো ফাটলের রূপ। মধ্যবিত্ত বুঝলো যে, রাষ্ট্র সমাজ-নিরপেক্ষ না হ'য়ে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এসেচে শোষণের শিকড়ে। ফলে গ্রামও এর আওতার ভিতরে এসে গেচে। তাই "বাবু-সংস্কৃতি" প্রথম দেখল রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী রূপ। পূর্বে অবিশ্যি এর প্রতিরোধকল্পে ভৌম সভ্যতা স্থান দিয়েচে ধর্মজ আদর্শকে যেমন দেখা যায় তুর্কী-বিজয়ের পর বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ-চিত্রালি। কিন্তু এখন বোঝা গেল, ধর্মজ সংস্কৃতি রাষ্ট্রকে রুখতে পাচ্চে না। এর জন্যে চাই রাজনীতি, যা অর্থনীতিরই ঘনীভূত রূপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমিজ আভিজাত্য রূপ নিয়েছিলো জমিদার শ্রেণীতে। উনিশ শতকের উপান্তে এদেরকে মনে হ'লো—

দুর্বিষহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্ত্তমানে অর্থ আপনার
শূন্যেতে হারানো অধিকার।

তাই তো মধ্যবিত্তরা রাজনীতির দিকে মনোযোগ দিলো।

(ক) রাষ্ট্র

গোটা বিশ শতকের ইতিহাস তাই রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পটে বিচার্য। এ হ'লো বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জাতি-সমুদ্রের ঢেউ, যা এগিয়ে চলেচে প্রসার ও সংকোচের দু'টো ডানায়। এক এক দশক এক এক ঢেউয়ের আয়ুষ্কাল। সম্প্রসারণ প্রকাশ পেয়েচে বাহ্য ঘটনায় আর সংকোচন আত্মমুখিনতায়। বস্তুত এরা তন্ময় ও মন্ময় রূপ। তাই রাষ্ট্রিক চেতনার মারফতে এই পঞ্চাশ বছরকে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করা যায়। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের অঙ্কগুলি হ'লো 'স্বদেশী পর্ব' [১৯০১-১১], 'আবেদন পর্ব' [১৯১১-১৯], 'অসহযোগ পর্ব' [১৯২০-২৯], 'পূর্ণস্বাধীনতা পর্ব' [১৯৩০-৪১] ও 'ভারতছাড় পর্ব' [১৯৪২-৫০]।

স্বদেশী যুগের আরম্ভ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, যদিও এর সূচনা হয় বুয়র যুদ্ধে

(১৮৯৯-১৯০২), ও রুশ-জাপান সংগ্রামে [১৯০৪-০৫]। এদেশে রবীন্দ্রনাথ মোহভঙ্গের গান গাইলেন—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বদেশিয়ানার বান ডাকলো স্বদেশী, স্বরাজ ও জাতীয় শিক্ষার ত্রৈগুণ্যে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় বঙ্গভঙ্গ রোধ হ'লো, জাতি আবার আত্মস্থ হবার সুযোগ পেলো। শুধু তাই নয়, মর্লো-মিণ্টো—সংস্কারও [১৯০৯] এলো এরি মারফতে। এর পর এলো আবেদন পর্ব, যার মাঝখানে বিশ্বযুদ্ধ ভেঙে পড়লো ইউরোপের বুকে [১৯১৪-১৯]। এরি উপান্তে এলো 'রাউলাট আইন, অমৃতসর হত্যা', ও 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার'। [১৯১৯]। আত্মমুখিতা তাই বহির্মুখী হ'লো, আর এলো 'অসহযোগ' [১৯২০] রাষ্ট্রের সঙ্গে। গান্ধীজি হ'লেন এর পুরোধা। রাষ্ট্রিক দিকটা সত্যাগ্রহ-হরতাল ও স্বরাজের ত্রিবেণীতে মূর্ত্ত হ'লো। আর্থিক সমস্যা প্রকট হ'লো, যার রূপায়ন দেখা যায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের নতুন ধারার সংযোজনায় [১৯২৮]। বর্গও যোগাল বিদ্রোহের খোরাক। এতে অভিজাতরা তেমন কোন সাড়া দিতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের বীণাও নীরব এদিকে। বিত্তমানরা স্বভাবতই একটু বেশি ভয় করে বিপ্লবকে। কারণ এতে হয়ত তাঁদের কায়েমী স্বার্থের বিপর্যয় হ'তে পারে। এই জন্যে অসহযোগের ভগীরথ নজরুল ইসলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নন।

এর পর এলো পূর্ণ স্বাধীনতা পর্ব ১৯৩০এ। আর্থিক বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বসে এলো। সমাজের ভিত্তিতে দেখা দিলো ফাটলের ক্রমবর্দ্ধমান রূপ [১৯৩৫]। ছোঁয়াছুঁয়ির বেড়াজাল সরানোর জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চললো। কিন্তু সত্যিকার বিজয়ের কোন হদিশ মিললো না, যেহেতু সংস্কার অতি দুর্মর। কালায়নে তাই এলো পঞ্চমাঙ্ক 'ভারতছাড় মন্ত্রে' [১৯৪২]। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে গেছে [১৯৩৯]। ভারতকেও এতে যোগদানে বাধ্য করান হয়েছে। তাই রাষ্ট্রিক দিক থেকে সরকারকে বিপদগ্রস্ত করাই উদ্দেশ্য হ'লো। এর এক রূপ ধরা পড়লো গান্ধীজির ভারতছাড় মন্ত্রে, অন্য রূপ প্রকাশ পেল নেতাজীর আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের 'জয় হিন্দ্‌' অভিযানে। আর্থিক সমস্যা প্রতিভাত হ'লো সমাজতান্ত্রিক সাধনায়, যার জ্বালাময় রূপ দেখা দিলো দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় ও পঞ্চাশের [১৯৪৩] মন্বন্তরে। গোটা জাতি যেন ভেঙে পড়লো। তার পর দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশের বুকে যে রক্তগঙ্গা বইল, তাতেই এলো সাতচল্লিশের স্বাধীনতা [১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭]।

এর পরিণতি হ'লো ভারতীয় গঠনতন্ত্রে [২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০], যা দেশবাসীরই দান। ইতিমধ্যে অবিশ্যি চলেছিল পূর্ণস্বাধীনতা পর্বের 'ভারত শাসন আইন' [১৯৩৫], কিন্তু যে আশা নিয়ে এ স্বপ্নসাধনা এগিয়েছিল, তার সাফল্য-মরীচিকা ধরা পড়লো উদ্বাস্তু-সমস্যায়। দেশের অঙ্গচ্ছেদে আর্থিক অবস্থা যে পরিমাণে বানচাল হয়েচে, তাতে মোহভঙ্গ আসতে বাধ্য। এর জন্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও কম দায়ী নয়। বিশ্ব এগোচ্চে এক বিরামহীন আদর্শ-সংঘাতে, জর্জ ওরিয়েলের "উনিশ শ'চুরাশীর" দিকে। একনায়কত্বের মহিমাই মানুষকে নাগপাশে বেঁধেচে, যার ফলে আজ মনে হচ্চে "পানীমে মীন পিয়াসী"। স্বাধীনতাজলে কেলি করেও শান্তি নেই। তাই তো কবিকণ্ঠে উৎসারিয়ে উঠেচে—

পদ্মার বুকে ফুলে ফুলে ওঠে কান্না,
ঘোলাটে গঙ্গা কান্নায় থম থম!

বিশ শতক মধ্যবিত্ত কেলাসভাঙার ইতিহাস। এ ভেঙ্গে রেণুতে রেণুতে ছড়িয়ে গেচে। অথচ নতুন কোন কিছু গড়ে ওঠে নি। এইখানেই শোকান্তিকা এসেচে। মাঝে মাঝে প্রোলেটারীয় স্তরের কথা উঠেচে বটে, তবে এ তেমন কোন পাকা আসন তৈরি কর্তে পারে নি। গণ-আন্দোলনের পথ কাটা হচ্চে। কিন্তু এ এখনো নীহারিকায় ভাসমান। এরি কথার বুদ্বুদে সমাজতন্ত্রের মানস ভিৎ তৈরি হচ্চে। হয় তো পঞ্চাশোত্তর সাধনা এ-পথে মোড় ফেরাবে। আজ সে-আশায় দেশ স্পন্দমান। তখন হয় তো জনগণের আয়ত্তে আসবে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা। বর্ণের ভিৎও টলেচে। কাজেই বর্ণ-বিত্ত রাষ্ট্রের বিবর্তনেই যে গড়ে উঠবে বিশ শতকের শেষার্দ্ধ এ সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাচ্চে।

(খ) সমাজ

বিশ শতকের সমাজ-ভাঙনও উল্লেখযোগ্য। বাংলার সমাজ প্রধানত বর্ণ-বিত্ত-রাষ্ট্র-নির্ভর। এর মধ্যে অবিশ্যি বর্ণ ও বিত্ত প্রধানতর। রাষ্ট্রিক সাধনায় ভারত দুলেচে দোটানায়—একদিকে বিদেশী শাসকের নির্যাতন, অন্যদিকে দেশী প্রজা-সাধারণের মুক্তি-সংগ্রাম! কিন্তু ইতিহাস পুরুষ চলেচে তৃতীয় পথে, যা দুয়েরি সমন্বয়ের রূপ। আজ ভারত দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্রিক বিবর্তনে। তাই "দিল্লীতে ঘোরে অশোকের চাকা, করাচীর ধ্বজা চাঁদ-তারা-আঁকা।" এতে সমাজও ভেঙে গেচে। কিন্তু এ-কাজ তো একদিনে হয় নি। এর পেছনের ইতিহাস তাই স্বভাবতই ভেসে আসে। বর্ণবিবর্তনের রূপ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তনে' [১৯১২] ও 'চণ্ডালিকায়' [১৯৩৭]। জাতির বজ্জাতিই ধরা পড়েচে ছুঁৎমার্গে। তাই নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়েচেন এর প্রতিবাদ: "জাতির নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া, মানুষ নাই আজ আছে শুধু জাত-শিয়ালের হুকাহুয়া।" সাহিত্যিক গণ্ডি পেরিয়ে বর্ণবিরোধী আন্দোলন এলো দেশপ্রেমিকের কর্মক্ষেত্রে। তাই গান্ধীজি সুরু করলেন,

'হরিজন' আন্দোলন। এতে দেশময় একটা সাড়া জাগলো সত্যি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এ তেমন কার্যকরী হয় নি। তাই তো এলো 'পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুসমাজ-পঙ্গুতা বিতাড়ন আইন' [১৯৪৮]। মাদ্রাজেও এ রকম আইন প্রণয়ন হয়েচে। এতে সামাজিক বর্ণ-বৈষম্য বিতাড়নের প্রচেষ্টা আছে।

এর পর আর্থিক দিকটা লক্ষণীয়। বিদেশী শোষক দেশকে শোষণে প্রায় নিঃশেষ করেচে। ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে আজ ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে গেচে, ফেলে গেচে "লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা"। শতাব্দীর শাসনধারা শুকিয়ে গেচে, প্রকাশ পাচ্চে নিষ্ফলতার পঙ্কশয্যা। ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর শাসনযন্ত্র এগিয়েচে রাজা ও প্রজা, শাসক ও শোষিতের সংগ্রামের চেহারায়। এর আর্থিক দিকটা প্রকট হয়েচে এক একটি আইন প্রণয়নে। বস্তুত রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ শুধু ভগ্নাংশেই প্রকাশ করা যায়। এ এমন ভগ্নাংশ, যার 'লব' হ'লো রাজা আর 'হর' প্রজা। এটা ঠিক যে, রাজা চাইচে প্রজার স্বার্থ নিতে, আর প্রজার প্রচেষ্টা এ-রক্ষণে। এরি রূপায়নে ফুটেচে আইনের শৃঙ্খলমালা। তাই তো উনিশ শতকের শেষ পাদে দেখা দিয়েচে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' [১৮৮৫]। বিশ শতকে এর হয়েচে নব নব রূপান্তর। এর পরিচিতি বহন কচ্চে ১৯০৩, ১৯০৭, ১৯১৮, ১৯২৮, ১৯৩০, ১৯৩৮, ১৯৪৫, ১৯৪৭এর রূপান্তরগুলি।

এ-ছাড়া আছে দরিদ্র জনসাধারণের কিছুটা প্রতিকারের চেষ্টা। উত্তর—তিরিশ বছর কালই এর পরিচায়ক। তাই এসেচে 'বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন' [১৯৩৫], যার আওতায় গ্রাম্য চাষীরা কিছুটা প্রতিকার পেয়েচে ঋণের বোঝা থেকে। 'বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল আইন' [১৯৩৭] এবং 'বঙ্গীয় গ্রাম্য দুঃস্থ ও বেকার আছান আইন' [১৯৩৯] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে বোঝা যায়, সমাজের ভাঙন কত মারাত্মক হচ্চে। এর পর 'বিয়াল্লিশোত্তর পর্বে' এলো 'দুর্ভিক্ষ [১৯৪৩] ও বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন' [১৯৪৩], 'বঙ্গীয় অনাথ ও বিধবা আশ্রয় আইন' [১৯৪৪] এবং 'বঙ্গীয় দুঃস্থ আইন' [১৯৪৫]। এতে দুঃস্থদের জন্যে কিছুটা প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আর্থিক সংকট এতো বড়ো যে এতে বিশেষ কাজ হ'লো না। তাই এলো 'বঙ্গীয় চাষী জমি হস্তান্তর আইন' [১৯৪৫] ও 'পশ্চিমবঙ্গ চোরাকারবার আইন' [১৯৪৮]। এতে সমাজ ভাঙনের রূপ চিহ্নিত হয়েচে। এরি সাহিত্যিক রূপায়ন ফুটেচে গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তেরশ' পঞ্চাশে'।

(গ) বিজ্ঞান

রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন যেমন হয়েচে, তেমনি পরিবর্তন এসেচে বিজ্ঞানীর চিন্তাধারায়। প্রাক-বিশশতকী বিজ্ঞান গালিলিও-নিউটনের পথেই এগিয়েচে। এ হ'লো বিজ্ঞানের ধ্রুপদী পর্ব, যেখানে বিজ্ঞানীরা মনে করেচেন তাঁরা বস্তুর সব রহস্য

উদ্‌ঘাটিত করেচেন। ক্রমে ক্রমে এ-আত্মপ্রত্যয়ে চিড় ধরলো। এর মূলে অবিশ্যি কাজ করেচে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি। রণ্টজেনের (১৮৪৫-১৯২৩) রঞ্জন-রশ্মি (১৮৯৫), বেকরেলের (১৮৫২-১৯০৮) তেজস্ক্রিয়া-আবিষ্কার (১৮৯৬), টমসনের ইলেকট্রণ (১৮৯৭), কুরী দম্পতির [পিয়েরে, ১৮৫৯-১৯০৬, মেরী, ১৮৬৭-১৯৩৪] রেডিয়ম্ (১৮৯৮), পুরণো ধারণা দিলো উলট-পালট ক'রে। ফলে গড়ে উঠলো এক নতুন বিজ্ঞান। তিনটি তথ্য তাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এক, প্লাঙ্কের (১৮৫৮) পদার্থ ও বিকীরণের সাম্যস্থিতি [১৯০০], যা কণিকাবাদ নামে খ্যাত; দুই, রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) ও সডির (১৮৭৭) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভাঙবার মূল নিয়ম (১৯০২); তিন, আইনষ্টাইনের (১৮৭৯) কণিকাবাদ ও পরমাণু বিস্ফোরণের যোগসূত্র [১৯১৭]। এর আগে অবিশ্যি আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ মতবাদ (১৯০৫) খাড়া করেন। এ পরে এককক্ষেত্রবাদে রূপান্তরিত হয় (১৯৩২)। এর পর ধরা পড়েচে ইলেকট্রণের তরঙ্গায়িত প্রকৃতি ডিব্রগলির আবিষ্কারে (১৯২৪)। হাইসেনবার্গ (১৯০১-) তাই পরে প্রতিষ্ঠা করলেন অনির্দ্দেশ্যবাদ সূত্র [১৯২৭]। এতে বিজ্ঞানের ধ্রুপদী পর্বের অবসান ঘটলো। তারপর বস্তুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করেচে লরেন্সের সাইক্লোট্রন-আবিষ্কার (১৯৩১), চ্যাডউইকের নিউট্রন (১৯৩২), এণ্ডারসনের পসিট্রন (১৯৩২), হানের ইউরেনিয়াম-বিভাজন (১৯৩৮) প্রভৃতি। মেসন, পাইয়ন প্রভৃতির নব নব আবিষ্কারে বস্তু-কাঠিন্য ধরা পড়েচে গতির লীলায়। বিশ্বের এই আবিষ্কারে ভারতও কিছুটা সহায়তা করেচে। জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) হ্রস্বতরঙ্গের সৃষ্টি করেন, যার মাপ ৫·৫ মিলিমিটার অর্থাৎ হার্ৎসের তরঙ্গের এক হাজার ভাগের এক ভাগ [১৮৯৫-১৮৯৬]। এর পর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৯৩০ এ নোবেল পুরস্কার পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেচেন। এর আণবিক গঠনের আলোচনায় উদ্ভাসিত হয়েচে "রমন এফেক্ট" যা তাঁকে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী করেচে। স্বয়ংশিক্ষিত পদার্থবিৎ মেঘনাদ সাহার [১৮৯৩] আবিষ্কার হ'লো "সাহা আয়নাইজেশন সূত্র" আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর "বোস আইনষ্টাইন পরিসংখ্যান"। এর পর নাম করতে হয় হোমী জে ভাবার (১৯০৯) যিনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে আলোচনায় সুখ্যাতি অর্জন করেচেন। চন্দ্রশেখর [১৯১০] গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও শিশির কুমার মিত্র "মিত্রস্তর" আবিষ্কারে সুনাম পেয়েচেন।

রসায়নশাস্ত্রেও অনেক আবিষ্কার হয়েচে। এর ভিতর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (১৮৬১—১৯৪৪) নাইট্রাইট গবেষণা তাঁকে "নাইট্রাইটের রাজা" উপাধি দিয়েচে। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪) জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (১৮৯৫) প্রভৃতি রসায়নে মনোনিবেশ করেচেন। এরপর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর "ইউরিয়াষ্টিবামাইন" (১৯২২) চিকিৎসাজগতে এনেচে যুগান্তর। ভেষজবিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখিয়েচেন রামনাথ চোপরা। বি, পি, পালের "এন, পি—৪", সয়ারামবসুর "পলিপব্লিন"

ও হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "ওরালিন" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গাণিতিক প্রতিভা হিসেবে উল্লেখযোগ্য শ্রীনিবাসের রামানুজম (১৮৭৪-১৯৩৭)। মনোবিজ্ঞানে যুগান্তর এনেচেন সিগমুণ্ডফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তাঁর শিষ্য হিসেবে কাজ কচ্চেন গিরীন্দ্রশেখর বসু। বেতার প্রতিষ্ঠায় দেশের মধ্যে যোগসূত্র অতি সহজেই স্থাপিত হয়েচে। মার্কনির (১৮৭৪-১৯৩৭) বেতার টেলিগ্রাফি (১৮৯৫) বিশ শতকে জন্ম দিয়েচে বেতার কেন্দ্রের। মাদ্রাজে সর্বপ্রথম এ স্থাপিত হয় ১৯২৪এ, যা পরে ১৯২৭ এ ভারতীয় ধ্বনি বিস্তার কোম্পানিতে রূপ নেয়। এরপর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র, যা এডিসনের শব্দ চলচ্চিত্রের (১৯০৪) কাছে ঋণী। পরে এ সবাক চিত্রে পরিণতি পায় ১৯২৫এ। এ এখন দেশে বেশ চলচে। বাংলায় অবিশ্যি প্রথম চলচ্চিত্র দেখান ফ্লেমিং সাহেব ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আর মদন কোম্পানি প্রথম সবাক চিত্র আমদানি করেন ১৯২৮-২৯ এ।

এই সব আবিষ্কারে মানুষের মননও হয়েচে রূপান্বিত। নিশ্চয়তার জায়গায় এসেচে অনিশ্চয়তা। সে বুঝেচে শূন্যগর্ভ সৃষ্টিপ্রান্তে সে শুধু একা। শুধু তাই নয়। গতিবাদই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েচে চিন্তায়। তাই এসেচে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' শরৎচন্দ্রের ক্ষণিকবাদ ও বনফুলের 'জঙ্গম' দর্শন। এর পরে চলচ্চিত্রের প্রসারে গড়ে উঠেচে চিত্রোপন্যাস। রেডিওর মারফতে এসেচে রেডিওনাট্য। এ-ছাড়া ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের ছড়াছড়িতে দেখা দিয়েচে মনায়ন, যার প্রয়োগ হয়েচে সাহিত্যে। উদাহরণ হিসেবে নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' কি মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' নেয়া যেতে পারে।

(ঘ) শিল্পকলা

শিল্পকলার প্রসারে অনেকেই চেষ্টা করেচেন। তাদের সম্মিলিত দানই জাতির ভাবজগৎ সৃষ্টি করেচে। বিদেশী ধারায় চিত্রকলাসম্প্রসারণের জন্যে রবি বর্মা [১৮৪৮-১৯০৬] স্মরণীয়। এর পর হ্যাভেলের শিল্প-আন্দোলন উল্লেখযোগ্য, যার প্রান্তিকে দেখা গেল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে [১৮৭১—১৯৫১]। এতে মিশেচে নানা ধারার বৈচিত্র্য যা ঐক্যে প্রাণবান হয়েচে। এঁর শিল্পজীবনে চারটি স্তর লক্ষণীয়। প্রথম পর্বের (১৮৯৪-১৯১০) আদর্শ ছিলো রূপসৃষ্টি, যা ফুটে উঠেচে পুরাণ কাব্যের মারফতে। এর পর দ্বিতীয়পর্বে (১৯১১-১৯১৯) এসেচে পরিবেশের রূপায়ন; তৃতীয় পর্বে (১৯২০-২৯) বর্ণিলতার ঔজ্জ্বল্য; আর চতুর্থ পর্বে (১৯৩০-৫১) সম্ভব-অসম্ভব-মেশা কল্পনার জগৎ। এদিকে তিনি একক নন। তাঁর ছাত্র ও অনুজদের নামও স্মরণীয়। নন্দলাল বসু (১৮৮৩) হ'লেন অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র। ইনি শিল্প-জগতে নতুনত্ব এনেচেন আঙ্গিকবিন্যাসে। নন্দলালের ভিতর পারিপার্শ্বিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। এর ছবি গান্ধীজির "দাণ্ডী মার্চ" প্রশংসার্হ। এরপর Orieutal Society এর প্রথম শিক্ষক নন্দলাল আর তাঁর ছাত্ররা হ'লেন প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ও সারদাচরণ উকিল।

এঁদের মারফতে বস্তুবিশ্ব আরো কাছে এগিয়ে এসেচে। বস্তুত বাস্তবের রূপায়নেই তুলির রহস্য উদঘাটিত হয়েচে। এ প্রসঙ্গে যামিনী রায় ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৬৭-১৯৩৮] নাম কর্তে হয়। গগনেন্দ্রনাথের ছিল যেমন কিউবিষ্ট আদর্শ তেমনি বৃত্ত মটিফও। এঁর আরো বৈশিষ্ট্য ফুটেচে ব্যঙ্গচিত্রকলার প্রবর্তনে। এ যেমন অভিজাত, তেমনি যামিনী রায়ের চিত্রকলা হ'লো লোকজ অর্থাৎ লোকশিল্পের সঙ্গে আছে এর নাড়ীর যোগ। প্রয়োজনের তাগিদ লক্ষ্য করা যায় মুকুল দে, ও শৈলজ মুখোপাধ্যায়ে। এখানে আঙ্গিক নিয়ে হয়েচে ব্যাপক প্রয়োগ। পরবর্ত্তী চিত্রকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন প্রদোষ দাশগুপ্ত ও গোপাল ঘোষ। এঁরা নতুনের উদ্দামতায় স্পন্দমান। প্রসিদ্ধি অনুসরণ না ক'রেই এঁরা এগিয়েচেন।

এ-ছাড়া আছে রমেন চক্রবর্ত্তীর "উড-কাট"। এরপর তিনিও ভিন্নপথে বাঁক নিয়েচেন। মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতিও পুরনোর অনুবর্ত্তন ক'রে চলেচেন। নতুনত্বের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, হাল আমলে ভাবালুতার আবেশ কেটে যাচ্চে, জলে-ধোয়ারঙের মোহজাল টুটচে আর এরি জায়গায় দেখা যাচ্চে বস্তুনিষ্ঠ রঙের বিন্যাস। সাঁওতাল জীবনের ছবি যে ভাবে নন্দলালের হাতে রূপ পেয়েচে তাতে এদিকটাই সূচিত হয়েচে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর আঁকা শান্তিনিকেতনের ফ্রেস্কোগুলি উল্লেখযোগ্য। এ-ক'রে চিত্রকলা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। চিত্রকলার পরে সঙ্গীত স্মর্ত্তব্য। সঙ্গীত হ'লো গীতবাদ্য ও নৃত্যের একত্র সমাবেশ। এর পরিচায়ক হ'লো ছায়াচিত্র ও নাটক। নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। তাঁর নাটকে তিনি প্রথম নৃত্য যোজনা করেচেন। ১৯১৯ সালে পিয়ার্সন 'ফাল্গুনীর' মধ্যে নেচেছিলেন আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও কবিশেখরের ভূমিকায় "চলিগো চলিগো"র অভিব্যক্তি নৃত্যমাধুর্যে সার্থক করেছিলেন। এর পর তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মণিপুরী নৃত্য [১৯১৯] ও গড়ব নৃত্য [১৯২০] আবিষ্কার করেন। শুধু তাই নয়, নটরাজের অভিনয়কালে [১৯২৪] দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের প্রভাব। পরে যব দ্বীপ ও বলি দ্বীপ ঘুরে আসার পর হয় নৃত্য-নাট্যের সৃষ্টি, যার পরিচিতি বহন কচ্চে 'চিত্রাঙ্গদা' [১৯৩৬], 'চণ্ডালিকা' [১৯৩৭] ও 'শ্যামা' [১৯৩৯]। এরপর নৃত্যশিল্পী হ'লেন উদয়শঙ্কর, যিনি তাঁর শিল্প জীবন আরম্ভ করেন রুশনর্ত্তকী আনা—পাভলোভার সঙ্গে নৃত্য ক'রে। ইনি দেশ বিদেশে নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করেচেন। এঁর 'কল্পনা' এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ ঘটনা অবিশ্যি ঘটে উত্তর—তিরিশে। নৃত্যের পরে যন্ত্রের উল্লেখের প্রয়োজন আছে। পুরাকালে যন্ত্রগুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা হোত—(১) তত বা তার যন্ত্র; (২) সুষির বা ফুৎকার যন্ত্র; (৩) অবনদ্ধ বা বায়াতবলা, (৪) ঘন বা ধাতু যন্ত্র। এর সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে মিশেচে ইউরোপীয় ক্লেরিওনেট, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি। যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতি ইউরোপীয় দেশের মতো না হ'লেও, দক্ষিণারঞ্জন সেনের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তিনি ১৯১২ সালে, দিশি যন্ত্রের ঐক্যতান রচনা করে

দিলেন পঞ্চম জর্জের সংবর্দ্ধনায়। শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় এসরাজের হয়েছে ব্যাপক প্রয়োগ যার ফলে অর্গেন হারমোনিয়াম বাদ পড়েছে। এখানে সরোদবাদক তিমিরবরণ ও আলাউদ্দিন স্মরণীয়। উদয়শঙ্করের সঙ্গে তিমিরবরণ দেশবিদেশে গিয়েছিলেন আর আলাউদ্দিন সৃষ্টি করেচেন সুবিখ্যাত "মাইহার ব্যাণ্ড"।

এর পর সুরের খেলায় অনেক নতুনত্ব এসেচে। বিশ শতকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অতুলপ্রসাদ সেন স্মরণীয়। স্বদেশীগানে পাশ্চাত্ত্য কোরাস আমদানি ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল নতুনত্বের গোড়াপত্তন করেন। এ-ছাড়াও তাঁর গানে ছায়া পড়েচে ভিয়েনার Walter ও সুরকার ট্রাউসের। এর পর রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা ধ্রুপদীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ সুরে এসেচে "কীর্ত্তনের ভাঁজ আর বাউলের সহজ সরল ছন্দ"। তবে কীর্ত্তনের আখর দেওয়ার রীতি গ্রহণ করা হয়নি। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরিতে লালচাঁদ বড়ালের কীর্ত্তি স্মরণীয়। এতে দেখা দিয়েচে ভাঙ্গা কীর্ত্তন, মালসী রামপ্রসাদী প্রভৃতি। কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনে চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্রমহোদয়ের দান স্মর্ত্তব্য। ১৯২০ এর পর থেকে ধ্রুপদীর জায়গায় আমল নিতে আরম্ভ করলো ঠুংরী ও খেয়াল। লক্ষ্ণৌয়ে ঠুংরীর চর্চা অতুলপ্রসাদকে উদ্বুদ্ধ করেচে নতুন গান রচনায়। তারপর ভাতখণ্ডেকে বাংলায় পরিচিত করার মূলে আছেন দিলীপকুমার রায়। 'রবীন্দ্রনাথ যেমন ধ্রুপদকে আর দ্বিজেন্দ্রলাল খেয়ালকে ভিত্তি করে গান রচনা করেচেন, তেমনি অতুলপ্রসাদ ঠুংরীকে করেচেন ভিত্তি। উত্তর তিরিশ সঙ্গীতচর্চ্চায় বি, এল, দেবী চৌধুরাণীর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। 'গীতশ্রী' ও 'সুরশ্রী' প্রভৃতি উপাধি প্রবর্ত্তনে এদিকে কিছুটা উৎসাহ এসেচে। নতুন রাগরূপের জন্যে দিলীপকুমারের নাম কর্তে হয়। এতে আছে টপ-খেয়াল ঠুংরীর সুরবিস্তার আর কীর্ত্তনের আখর। এ-ভাবে বিশ শতকী সঙ্গীত সাধনা একটা বিন্দুতে এসে পৌছেচে শতাব্দীর মধ্যাহ্নে।

শিল্পকলার বিভিন্ন পরিবেশে এসেচে সাহিত্য, যা পারিপার্শ্বিক থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেচে। সঙ্গীত থেকে নাটকের গান ও নৃত্য, আর কবিতার গীতিকা কায়া ধরেচে। কাজেই বৈচিত্র্যে সাহিত্যায়ন বয়ে চলেচে। বস্তুত কবিতা ও গানের তফাৎ হ'লো একের সুরহীনতা, অন্যের সুরযুক্ততা। এ-ভাবে এগিয়েচে কাব্যধারা যেমন, তেমনি উপন্যাসের গল্পছন্দ। কাজেই বিশশতক দেখা দিয়েচে রাষ্ট্র-সমাজ—বিজ্ঞান-শিল্পকলার চতুরঙ্গে। এরি পটে এসেচে সাহিত্য। তাই চতুরঙ্গের পরিবেশেই বিচার্য ভাবপ্রবাহ, যা সাহিত্যের উপজীব্য।

(৪) ভাব-বিন্যাস

বাইরের ঘটনার আবর্তে যে মানস-রসায়ন হয় তারি পরিচায়ক হ'লো সাহিত্য। শতাব্দীর কাছে এ-ঋণ স্বীকার্য। উনিশ শতকী বিশ্বাসের দুর্গ চুরমার হ'লো বিশ শতকী বাস্তবানুভূতিতে। ভাবালুতার জলো জমি শুকিয়ে গেল বর্তমানের ধূ ধূ মরুতে। কল্পনার গজদন্তমিনার এখানে ভেঙে গেচে, পড়ে আছে শুধু স্মৃতির চূর্ণসুড়কি। মধ্য-বিত্ত মানস তাই এ ভাঙনে এগিয়ে এলো প্রশ্নিলতায়। বিশশতক এক বিরাট জিজ্ঞাসা যার সন্ধানী আলো জীবনের অলিগলিতে পড়েচে। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তাঁরি উপলব্ধি ভাষার যাদুতে ফুটেচে: "যে কালে এসেছি আজ, সে কালটা সিনি-কাল!" এই অসূয়া প্রবৃত্তি ভাবালুতারই রকমফের। এতে আছে বিদ্রোহের ইঙ্গিত। বাবুবিলাসের স্বপ্নিলতা বিশ শতকের চোরাবালিতে বানচাল হয়েচে মোহ-ভঙ্গে। তাই তো এই অস্বস্তির প্রয়াস। এতে জেগেচে প্রশ্ন, এসেচে বিদ্রোহ, দোলা দিয়েচে সংশয়। বিশ্বাস-হারানো যুগে আর তো কিছু কল্পনা করা যায় না। তাই,

> হতাশ হয়ে যে দিকে চাহি
> কোথাও কোনো উপায় নাহি
> মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।

উনিশ শতকী প্রাঙ্গণে ফুটেছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশ, যা চূর্ণ চূর্ণ হয়েচে বিশ শতকী রাষ্ট্রিক অখণ্ডতায়। ফলে বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। এ-অবস্থায় সাহিত্যায়ন একরকম অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে সহায়তা করেচে ফ্রয়েড, মার্কস ও আইনষ্টাইন। বস্তুত এদের চিন্তনের প্রবাহই ধাক্কা দিয়েচে বাঙালী জীবনের অসূয়াকে আর এ এগিয়ে এসেচে সৃষ্টি কর্মশালে। স্বদেশী যুগে তাইতো গড়ে উঠেচে নাটক স্মৃতি-রোমন্থনে, কাব্য অধ্যাত্মায়নে আর কথাসাহিত্য রাজনৈতিক আদর্শপত্তনে। এতে যেমন বেজেচে পরাজয়ের পূরবী, তেমনি আশার দীপকও। মানুষকে এখনো নীতি মুক্ত করা যায় নি। তবে এদিকে অগ্রগতি লক্ষণীয়। এ কিন্তু এসেচে চেতনার দিগ্বাহী স্রোতে। দেশকালের গণ্ডি যে সাহিত্যরূপকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাও ধরা পড়েচে আবেদন পর্বে। আত্মজিজ্ঞাসায় আর একবার দেখা হ'লো মানুষী রাজনীতিকে। বোঝা গেল, এর মধ্যস্থ বিষই বিষিয়ে দিচ্চে মানুষের পরিবেশ। রসিক মানুষের রূপান্তর হ'লো প্রেমিকে। বিংশোত্তর যুগে তাই ফ্রয়েডীয় যৌনবোধ মাথা চাড়া দিলো "কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি" মারফতে। ফ্রয়েডের দুটো রূপ দেখা গেলো। এক, মনের ত্রিধারূপ আছে চেতন-অবচেতন ও অচেতনে। দুই, মানুষী কর্ম যৌন প্রেরণায় চলে। প্রথমটি আঙ্গিক হিসেবে সাহিত্যে আসন দখল করেচে আর দ্বিতীয়টি যুগিয়েচে

উপাদান। এদের পরিচারক হ'লো রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'। এ-সম্বন্ধে তাই ব্যঙ্গ রসিকের কথায় বলা যায় এ সাহিত্য—

নাকানি-চোবানি পূর্ণ, ফ্রয়েডের কিঞ্চিৎ চূর্ণ,
এলিসেরও পরিশিষ্টে, ক্রিমনলজী অতি মিষ্টে,
মনস্তত্ত্ববাদমূলক কাব্যে ছড়াছড়ি যৌন-পুলক।

অসহযোগে তাইতো এলো বিদ্রোহ, যার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েচে কবির ভাষায়: "কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল, কররে লোপাট রক্তজমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।" এও বৈশাখী ঝড়, যা ভেঙ্গে চুরে দিলো জীবনায়নের আত্মপ্রসাদ। এর পর উত্তরতিরিশে এলো সাম্যবাদের ঢেউ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমায়' [১১৩০], বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সর্বহারাদের' গানে [১১৩০] ও রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার' 'চিঠিতে' [১১৩১]। বস্তুত রুশ বিপ্লবে [১১১৭] কম্যুনিষ্টদের হাতে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা আসাতে পৃথিবীময় মার্কসের আদর্শ ছড়িয়ে গেলো। তারি ঢেউ এসে লাগলো এ-বাংলায়। এর গোড়াতে আছে বাঙালী সমাজ-ব্যবস্থার ফাটল, যা আর্থিক সমস্যায় ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। আইনষ্টাইনের চতুরায়তনিক আবিষ্কার ভাবজগতে বিপ্লব এনেচে সত্যি, কিন্তু এ মার্কসবাদের মতো এত ব্যাপক হয়নি। এ পার্থক্যের মূলে আছে দুটো ভাবাদর্শের মৌল স্ব-তন্ত্রতা। মার্কসএর মতবাদ সামাজিক পরিণতির ইঙ্গিত ও রূপান্তর বহন কচ্চে। কাজেই এ জনগণের বেশি প্রিয়। আইনষ্টাইনী আবিষ্কারের এতটা স্থূলতা নেই। তবুও সাহিত্যক্ষেত্র এ দের চাষে ফলন্ত হয়েচে অনুচিন্তনের মূর্তনে। পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবায়' "আইনষ্টাইনের থিওরিটা" ব্যঙ্গে পরিণতি পেয়েচে: "জনার্দ্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায় কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন-পো।"

মানুষ হ'লো পরিবর্ত্তনশীল। এর স্বরূপ ধরা পড়ে এক একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ শতকী সাহিত্য রথীদের কাছে তার পাঁচটি রূপ দেখা গেছে। স্বদেশী আমলে সে নীতিবাগীশ হিসেবে পরিচিত। বঙ্কিমী আদর্শ নীতিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরি উত্তরাধিকার সূত্রে এসেচে 'চোখের বালির' [১১০৩] বিনোদিনী, যে রোহিণীর সগোত্রীয়। এরপর আবেদনপর্বে তাকে দেখা যায় রসিক হিসেবে। প্রাণের দাবীতেই এ এগিয়েচে। তবে প্রাণন এখানে নান্দনিক। রবীন্দ্রনাথ তাই কামনাকে মুক্তি দিয়েচেন রসের অসীমতায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রসিক মানুষের রূপান্তর হয়েচে প্রেমিকে। প্রাণনের লীলা এখানে কামনায় কম্পমান। তাই এতে আছে মাটির স্পর্শ। এ দেখা যায় বিশেষ করে বিংশোত্তর কালে। তারপর তিরিশোত্তর পর্বে এসেচে সমাজতান্ত্রিক মানুষ, যার ভেতর আছে যৌন আবেগ ও চিত্তের অস্বচ্ছলতা। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের উপর করুণা বর্ষিত হয়েচ। ভূমিজ সভ্যতা উনিশ শতকেই "বণিকের মানদণ্ডে" রূপান্তরিত হচ্ছিল আর দেশে গ'ড়ে

উঠছিলো কলকারখানা। ভূমিজ আভিজাত্য ও আস্তে আস্তে মোড় নিলো ধনতন্ত্রে যেখানে "লোষ্ট্রেলৌহে বন্দী কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।" তাই

বণিকের দম্ভে নাই বাধা
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ততার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা।

এ সংগ্রামের চেহারা রূপ পেয়েচে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীতে' [১৯৭৫]। সামন্ততন্ত্র পরিণতি পাবে ধনতন্ত্রে, যা রূপান্তরিত হবে গণতন্ত্রে। বর্তমান আর্থিক অব্যবস্থার ফলেই প্রজা সাধারণ অনাহারে অনটনে কালক্ষেপ কচ্চে। বর্ণব্যবস্থায়ও চিড় ধরেচে। বর্ণকৌলিন্যের জায়গায় উঠেচে অর্থকৌলিন্য। বস্তুত এরি আনুকূল্যে সম্ভব হয়েচে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ। সমাজের ভার সাম্যও নষ্ট হয়েচে। হাল আমলের গণতন্ত্র "রাজতন্ত্রেরই নবরূপ। নূতন রাজাটির নাম টাকা। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে" [বনফুলের 'সপ্তর্ষি' ১৯৪৫]। কাজেই গণতন্ত্রের জিগির থাকলেও, নেই এখানে প্রোলেটারীয় রূপ।

এর পর উত্তরচল্লিশ যুগে আর্থিক মানুষই দেখা যায়। ভূয়ো সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করলে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরও দাঙ্গায়; গ্রামীন সভ্যতার ভিৎ ভেঙে পড়লো। মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো "ম্যয় ভূখা হু" ব'লে। এ মানুষের "ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপ-বিকৃতি"। একে দেখে মনে হয় "মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান; তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।" এই প্রেতায়িত অবস্থায় নারীত্বের মহিমা লাঞ্ছিত হ'লো। সামাজিক সম্বন্ধ আর্থিক চাপে সুস্থ থাকতে পারে না। 'গোত্রান্তরে' সুবোধ ঘোষ স্নেহের পণ্যরূপেই দেখিয়েচেন। মাটি আঁকড়ে থাকা যে আর চলবে না, তাই স্পষ্ট হয়েচে এ পর্বে। সত্যভট্টাচার্য তাঁর 'মরামাটীতে' [১৯৪১] এদিকটা উদ্‌ঘাটিত করেচেন। শঙ্করের কথা তাই প্রণিধান যোগ্য: "গাঁ কেউ বাঁচাতে পারবে না। জমিতে সার নেই—খরা হ'লে জলের ব্যবস্থা নেই, বান এলে জল সরাবার উপায় নেই; অথচ এই জমির উপর ঝুঁকে আছি আমরা সব আর জমি শুকিয়ে যাচ্চে দিনকে দিন।"

এ-যুগের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য হ'লো মনোবিকলন ও মার্ক্সবাদ। আঙ্গিক হিসেবে প্রথমটি লক্ষণীয়, যেমন দ্বিতীয়টি বিষয়বস্তু সংভরণে। এ-ছাড়াও আছে দেশের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক উপাদান। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' [১৯১০], 'চার-অধ্যায়' [১৯৩৪] শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' [৯২২-২৪], ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' [১৯৪৮] রাজনীতিকে করেচে উপন্যাসের উপজীব্য। অর্থের দিকটা ধ'রে দিয়েচে গোপাল হালদারের উপন্যাসত্রয়ী—'পঞ্চাশের পথ' [১৯৪৪], 'উনপঞ্চাশী' [১৯৪৫], 'তেরশ পঞ্চাশ' [১৯৪৫]। এ বাদেও আছে আরো বই। আত্মসচেতন আলোচনায় গদ্যসাহিত্য হয়েচে সমৃদ্ধ। কবিতা এগিয়েচে ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শে। ছোটগল্প ও উৎরেচে অনেক। বস্তুত এ দু'শাখায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সগোত্রীয়। গান ও লেখা হয়েচে প্রচুর। কিন্তু একটা অসুবিধা এসেচে মধ্যবিত্ত

মানসের বুদ্ধি দীপ্ত থেকে শিক্ষা যেহেতু জনসাধারণে চারিয়ে যায়নি, তাই এ সীমায়িত। ফলে সাহিত্যের ভাবধারা পৌছায়নি গণচিত্তে। যারা গণসাহিত্যের ধুয়া তোলেন, তারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাহক। সত্যিকার গণসাহিত্য এখনো আসেনি। এখন যা চলেচে তা মেকী—দূর থেকে অবলোকন। সেই অনাগত কবির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ তাই বাণীদূত পাঠিয়েচেন—

এস কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

সাহিত্যিক দৃষ্টিতে গোটা বিশশতককে খেয়ালী ও ধ্রুপদী কল্পনার লীলায় অভিহিত করা যায়। বস্তুত সম্প্রসারণই হ'লো খেয়ালী কল্পনা আর সংকোচনে ধ্রুপদী। মানুষী আবেগে এরা কাজ করে যায়। অন্যদিক থেকে এরা প্রাণন ও মননের সঙ্গে তুলনীয়। সভ্যতা নির্দয়তার ভিত্তিতে তুলেচে তার জয়তোরণ। সাহিত্যায়ন ও তাই জৈব ভূমি থেকে চৈতন্যের প্রবাহে ছুটেচে। বিবর্তনে তাই আছে মনায়ন। এর পরে আসে অধ্যাত্মায়ন. র. নিশিকান্তের "অলকানন্দায়" লক্ষিতব্য। প্রাণন ও মনন তাই চলেচে বিকল্পে। কখনো একের অভিযান, কখনো বা অন্যটির। তবে সাহিত্যিক ভাবধারাকে একদম বায়ুহীন কক্ষে আটকানো যায় না। তাই দুয়ের সংমিশ্রণ ঘটতে বাধ্য। এ মিশেলে কখন একেকটির প্রাধান্য স্বীকৃত। বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে বিদ্রোহ এসেচে কিন্তু আসেনি বিপ্লব। তাই ভাভাব কাব্যেও প্রাণনের লীলা লক্ষণীয় প্রতিরোধে গোটা হৃদয়াবেগই চঞ্চল হ'য়ে বলে ওঠে—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।

বস্তুত আদর্শায়ন ও বাস্তবায়নেই এগিয়ে চলেচে খেয়ালী ও ধ্রুপদী বিহার।

এর পরে আঙ্গিকের দিকটা উল্লেখযোগ্য। মনোবিকলনে আছে যে "অবাধ অনুষঙ্গ", তারি ব্যাপক প্রয়োগ হচ্চে আধুনিক সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের "ছড়ার ছবি" [১৯৩৭] ও ছড়া [১৯৩৯] এর সুষ্ঠু উদাহরণ। স্মৃতির মারফতে চেতনা ব'য়ে চলেচে এখানে। তাই আপাত-অসংলগ্ন দৃশ্য ও শেষ পর্যন্ত সঙ্গতি পেয়েচে। একদিকে আছে চলচ্চিত্রের ঝলমলানি, অন্যদিকে তারা নিয়ামক। ফলে দৃশ্যগুলি এক স্থির কেন্দ্র থেকে উৎসারিত ব'লে মনে হয়। "মন্টেজ"—প্রক্রিয়ায় সাজানো চিত্রগুলি চেতন-অচেতনের মধ্যে যাওয়া আসা করে। বিদেশে

জয়েস-উল্ফ প্রভৃতি এ-অচেতনের অতলে ডুব দিয়েচেন। এঁদের বৈশিষ্ট্য হ'লো সাহিত্যে চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রয়োগে। এ-কাজ এগিয়েচে কখনো ফাঁক রাখার কৌশলে, কখনো ক্রমিক যোগাযোগে, কখনো বা ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে। রবীন্দ্রনাথের "শ্রাদ্ধ" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দৃশ্যগুলি ভেসে আসচে একে একে।

এরপর আছে কাব্যের অভিযান বিজ্ঞানের এলাকায়। যে কোন জিনিষকেই রূপের অঙ্গ করা হচ্চে। দৃষ্টিবদলের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষেরও মূল্য-বোধ গেচে বদলে। তাই উর্বশীর যাতায়াত হয়েচে শহরের অলিতে গলিতে। কথ্যভাষার প্রাধান্য বড় হ'য়ে দেখা দিয়েচে। অবিশ্যি পথিকৃৎএর সম্মান কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুমপেঁচার নকসা"রই প্রাপ্য। পরবর্ত্তী প্রয়োগ হয়েচে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীতে", ও "ঘরে বাইরেতে"। কিন্তু বীরবল "সবুজ পত্রে" একে পাকা করলেন, যার ফলে হয়েচে এর ব্যাপক প্রয়োগ। তাই প্রমথবিশীর মত গোঁড়া লেখকও এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেচেন তাঁর "চলনবিলে"। কথ্যভাষার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশশতক বিশেষ ক'রে স্মরণীয়। আধুনিক যুগ অতিব্যস্ত। কাজের বৈচিত্র্য ও প্রসার এনেচে সংক্ষিপ্তি কি চলনে, কি বলনে। তাই দ্রুতগতিই লক্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতির মারফতে ভাষাও হয়েচে সমৃদ্ধ নতুন নতুন শব্দচয়নে। শুধু তাই নয় শব্দের তির্যক ভঙ্গি বিশেষ করে চোখে পড়ে। এদিকে উল্লেখযোগ্য রচনা হ'লো রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" ও "ছেলেবেলা।"

তারপর ছন্দবৈচিত্র্য বড়ো কথা। দলবৃত্ত, সমদলবৃত্ত ও অসমদলবৃত্তের ত্রিধারায় এগিয়ে চলেচে বাংলা ছন্দসরস্বতী। এর আগেও ছন্দ ছিলো পুরনো কাব্যে। তবে এখানে এ হয়েচে বেগবতী ও প্রসারশীলা। দিশি-বিদিশী আদর্শে রূপায়িত হয়েচে অনেক কবিতা। এতে কাব্যভূমি হয়েচে বিস্তৃত। এ ছাড়া মুক্তক, গদ্য কবিতা মিশ্রকী প্রভৃতি রূপ কল্পের ও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গীতিকা ও গানের প্রচলন ও উল্লেখযোগ্য। তাই বিশশতকে বাংলা সাহিত্য যৌবনে পা দিয়েচে। উপাদান, উপায়ন দুইই এর জন্যে দায়ী। আশা আছে এ আরও এগিয়ে যাবে নব নব বিজয়-যাত্রায় সহযাত্রীরা পিছিয়ে পড়লেও। কারণ, "তাদের চকিত আশা,

স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয়নি চলা সারা—
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাস

কথাসাহিত্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে বেশি আদৃত ও পরিচিত। এই জনপ্রিয়তার মূলে আছে পাঠকের গল্প-শোনার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। মানুষের ছেলেবেলা রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে। শিশুরা আজগুবি দেশে চ'লে যেতে চায়। এর কারণ অবিশ্যি প্রবৃত্তির বন্ধনহীন গ্রন্থি। সে কিছুতেই শাসন মানতে চায় না, বিশেষ করে যখন সে শাসন আসে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে। সৃষ্টির মূলে যে প্রাণন তা যখন সীমায়িত হয় শিশুর দেহ কাঠামোয়, তখনি বিদ্রোহ জেগে ওঠে। আর এ তখন খোঁজে সব-পেয়েছি'র দেশ। কিন্তু বস্তু বিশ্ব তো নিগড়েরই রকমফের। তাই শিশুমন চলে মর্ত্ত্য পেরিয়ে অমর্ত্ত্যের সন্ধানে তবে এ-অমর্ত্ত্য হ'লো মর্ত্ত্যেরই রূপান্তর। দু'য়ের মধ্যে তফাৎ হ'লো বন্ধনের গ্রন্থিছেদনে, সীমিত গণ্ডির নিরাকরণে। এ কাজ গল্প বেশ জোগাতে পারে যা পারে না অন্যান্য শাখা। তাই শিশুর কাছে কথা সাহিত্যের কদর. কিন্তু বড় হ'লেও মানুষের অন্তঃশীলায় আছে এই শিশুমন। সে আবর্তের মধ্যে ব'য়ে চলেচে নিজস্ব ভূমিতে। বয়স্ক পাঠকের মনের কোণে এই চির শৈশবই তাই চায় আরো গল্প। আর এরি জন্যে গল্প সাহিত্যের এত পরিচিতি।

কথাসাহিত্য একটি মিশ্রশিল্প, যা গড়ে উঠেচে উপন্যাস ও গল্পের মারফতে। মানুষের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে প্রথম এসেচে ছড়া, তারপর গীতিকা, তারপর কবিতা। পরবর্ত্তী ধাপ হ'লো নাটক। এখানে নাচ ও গানের যুগ্মলীলা লক্ষণীয়। এর পর কথকতা, কাহিনীর বিস্তার। তাই কবিতা, গান, নাট্য ও প্রাবন্ধিক আলোচনার সমবেত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েচে কথাসাহিত্য। এর সঙ্গে সঙ্গে গদ্য বিবর্তনও স্মর্তব্য। উনিশ শতকে এর যে সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল, তাতে সম্ভব হয়েচে কথাসাহিত্যের প্রসার। এরি উত্তুঙ্গ চূড়া হ'লেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে কথাসাহিত্যের উপন্যাস শাখাই এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপন্যাসই হ'লো জীবনেরই ছবি, আর্ট, যা জীবনকে লোভ দেখায়। ছোট গল্প অবিশ্যি গল্প এবং ছোটও। রূপকল্পের দিক থেকে তাই একটু তফাৎ আছে এ-দু'য়ের মধ্যে। হাল আমলের কর্মব্যস্ততা জন্ম দিয়েচে গল্পায়নের ছোট জাতকের। এ নব জাতক যেমন বিশশতকেরই শিশু, তেমনি উপন্যাস উনিশশতকের। "রহস্যরূপোলি" পরিবেশের জনক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র হ'লেন স্মরণীয়। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র রাজপথ দিয়ে উপন্যাসপুরুষ ঘোড়ায় চ'লে এলো বাংলা সাহিত্যের কুটিরে আর এ-পথে আজ ছোট গল্পের মোটর গাড়িও চলাফেরা কচ্ছে।

উনিশশতকী আদর্শায়ন ক্রমে ক্রমে বাস্তবায়নে নেমে এলো। এতে যে সব সাহিত্যরথীরা কাজ করেচেন তাঁর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উল্লেখযোগ্য! তবে শেষের দু'জন বিশশতকেই তাঁদের প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েচেন। রহস্যের যাদুতে বঙ্কিমচন্দ্র দৈনন্দিন সুখদুঃখকে যে আদর্শের শিখরে তুলেছিলেন, তা ক্রমে ক্রমে রামধনুর রঙে শতকান্তিক হ'য়ে ভেঙে পড়লো নব্বুই যুগে। উনিশ শতকের শেষ পাদের এ-চেহারা তাই আভাস দেয় পরবর্তী যুগের। মোটকথা উপন্যাসের বিকাশধারার পরিচয়ে ফুটে উঠেচে বাঙালী চিন্তনের বহর। এ আদর্শের গোমুখী থেকে যাত্রা সুরু ক'রে, ক্রমে ক্রমে খুলে দিয়েচে এর রহস্যের ঘোমটাজাল! একে সম্বোধন ক'রে বিশশতক বলেচে—

এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

নব্বুই যুগ

উনিশ শতকের নব্বুই যুগ সাহিত্যিক বাস্তবায়নে স্মরণীয়। এর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সত্তর থেকে কথা সাহিত্যের যে-প্রবাহ চলছিলো তা নব্বুইতে এসে এক স্থিরবিন্দুতে পরিণতি পেলো। এ হ'লো বিশশতকী উপন্যাসের ভূমিকা। বঙ্কিমী রহস্যোপাখ্যান ক্রমে ক্রমে বাস্তবানুগ হ'তে লাগলো। এতে প্রতিক্রিয়ার সুরই ধ্বনিত হয়েচে। খেয়ালী কল্পনা ধ্রুপদী বস্তুনিষ্ঠায় এগিয়ে এলো। এতে মধ্যবিত্ত মানসের আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে। যে শ্রেণী নিজেদেরকে সামন্ততন্ত্রীয় ভূস্বামী মনে করেছিলো, সে বুঝতে পারলো যুগান্তর উপস্থিত, দেশের হাওয়া আলাদা। তাই প্রতিক্রিয়ায় এলো যে আত্মসচেতনতা তার আছে চারটি রূপ—ঐতিহাসিক, গ্রামীন, গার্হস্থ্য ও ব্যঙ্গধারা। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' [১৮৫৭] সূত্রপাত করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনী যা শিরাজী-রোশিনারার প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে। এখানকার খেয়ালী কল্পনা ইতিহাসের ধূলায় ধূসর হয়েচে। উপন্যাসের মর্ত্ত্য-অভিযানই বেশি করে চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' [১৮৮১] ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৩৪-৮৯] 'জাল প্রতাপচাঁদ' [১৮৮১] ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েচেন রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯]। আকবর ও শাজাহানের যুগের চিত্রণ হিসেবে তাঁর 'বঙ্গবিজেতা' [১৮৭৪], ও 'মাধবীকঙ্কণ' [১৮৭৭] উল্লেখযোগ্য। 'জীবনপ্রভাতের' [১৮৭৮] প্রধান বস্তু হ'লো শিবাজী-ঔরংজীবের সংঘর্ষ। তারপর 'জীবনসন্ধ্যায়' [১৮৭৯] জাহাঙ্গীরের আমল আর একবার কায়া ধরেচে। গল্পায়ন এগিয়েচে স্বদেশপ্রেমের বানে ও কথনের সরসতায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস তাই বাস্তবায়নের পথ সুগম করেচে।

গ্রামীণ ধারার পরিচিতি ফুটেচে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "শক্তিকানন" (১৮৮৭) ও "ফুলজানিতে" [১৮৯৪]। এখানে "কোন রকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নাই।" পল্লী প্রকৃতির পরিবেশে যে মানবস্রোত ব'য়ে চলেচে, এখানে তার রূপরূপান্তর ধরা পড়েচে। কাহিনী রহস্যঘন হ'লেও, পল্লীর সুর একে বাস্তবানুগ করেচে। 'পত্র-উপন্যাসের' রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ যোগ্য নটেন্দ্রলাল ঠাকুরের "বসন্ত-কুমারের পত্র" [১৮৮২]। তারপর দামোদর মুখোপাধ্যায়ের [১৮৫৩-১৯০৭] "মা ও মেয়ে" এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। যৌন সম্পর্কের পরিচয়ে এসেচে অধুনিকতার আমেজ। এ-ছাড়া গণসাহিত্যের অগ্রদূত হিসাবে তাঁর চাষাভূষা, খুনী চরিত্রও স্মরণীয়। তৃতীয় স্তরে দেখা যায় গার্হস্থ্য চিত্রণ, যা জন্ম নিলো খেয়ালী রহস্যের প্রতিক্রিয়ায়। এ-প্রসঙ্গে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের [১৮৪৫-৯১] দান স্মর্তব্য। তাঁর "স্বর্ণলতা" (১৮৭২), "হরিষে বিষাদ" ও 'অদৃষ্ট' উল্লেখের দাবী রাখে এ-সব উনিশ-বিশ শতকের মধ্যে সেতু রচনা করেচে। বেহালা-ওয়ালা নীল-কমল, তোৎলা গদাধরচন্দ্র ও ডাক সাইটে শ্যামা এর সাক্ষ্য। ছোটখাট সুখ দুঃখে অগ্রসরশীল দৈনন্দিন জীবনই এখানে প্রতিপাদ্য। এধারার প্রবাহে স্বর্ণ-কুমারী দেবীর [১৮৫৫-১৯৩২] "স্নেহলতা" [১৮৯২], ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "লীলা" [১৮৯২] ও উল্লেখযোগ্য.

এর পর ব্যঙ্গনক্সায় এগিয়েচে রসায়নের ধারা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯১১) কল্পতরু (১৮৭৪) ও ক্ষুদিরাম (১৯০১ , প্রথম সার্থক ব্যঙ্গ উপন্যাস। "কল্পতরু" হুতুমকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে এখানে চিত্রণ আরও প্রাণধর্মী, যদিও রুচিবোধ নিম্নস্তরের। চৌৎপুরচারীদের পরিচয় জীবন্ত হয়েচে। যোগেন্দ্র নাথ বসুর [১৮৫৪-১৯০৫] নব ব্রাহ্মদের নিয়ে যে ব্যঙ্গ তা বেশ উপভোগ্য। তাঁর "মডেল ভগিনী" (১৮৮৬-৮৮), "নেড়া হরিদাস" (১৯০৮], "মহীরাবণের আত্মকথা" (১৯০৬) ও "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" (১৯০২) ব্যক্তিব্যঙ্গ হিসাবে স্মরণীয়। এখানে তিনি ইন্দ্রনাথের সগোত্রীয়। কালাচাদ, রঘুদয়াল, শিয়ালমারা আজও প্রাণবান। তারপর অদ্ভুত রসের অভিযান হ'লো ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কঙ্কাবতী" (১৮৯২), "ভূত ও মানুষ" (১৮৯৫), "ফোকলা দিগম্বর" (১৯০০) "মুক্তামালা" (১৯১৯) ও "ডমরু-চরিতে" (১৯২৩)। এখানে এক নতুন জগতের সন্ধান মেলে, যেখানে ব্যঙ্গ উড়েচে রহস্যের পাখনায়। তবে সাময়িকতার গণ্ডী এর পালক টেনে ধরেচে। তাই এ লোকায়ত। এভাবে নববুই যুগের সাহিত্যায়ন বিশ শতকের দোরগোড়ায় এসে ধাক্কা দিলো।

রবীন্দ্র পর্ব (১৯০১—১৬)

বিশ শতক এক হিসাবে রবীন্দ্রপর্ব, যেহেতু তাঁরি মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্য এক অদ্ভুত মেল বন্ধনে বাঁধা পড়েচে। তবুও এ যুগকে ৩টি পর্বে ভাগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে গড়ে উঠেচে রবীন্দ্রপর্ব, যা জন্ম দিয়েচে বঙ্কিমী নৈতিক মানুষের জায়গায় রসিক মানুষকে। সাহিত্যিক রুচিবোধ এখানে হয়েচে উন্নততর। তার পর এও পরিবর্ত্তিত হয়েচে শরৎপর্বে। এখানে রসিক মানুষ রূপান্তরিত হয়েচে প্রেমিক মানুষে, যা থেকে সম্ভব হয়েচে প্রাণের লীলায় যৌন বিকাশ। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিপুরুষ সাহিত্যায়নের মোড় ফিরিয়ে দিয়েচে সেইজন্যে তাদের নামাঙ্কেই এসব-পর্বের নামকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রে যে আদর্শায়নের রূপ তা মিলেচে বাস্তবায়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথে। আর শরৎচন্দ্রে বাস্তবায়নের ভাবালুতাই আসন দখল করেচে। বাস্তবায়নের ইতিহাসে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ ৩টি বিন্দু। দুই প্রান্তকে আছে আদর্শায়ন ও বাস্তবায়ন আর মাঝখানে আদর্শায়ন ও বাস্তবায়নের যৌথ লীলা। এরপরে আধুনিক পর্ব, যাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে অভিহিত করা যায় না। প্রত্যেক লিখিয়ে এক একটি প্রবাল কীট, যার সম্মিলিত দানই হ'লো আধুনিক উপন্যাস। এদের মারফতে গড়ে উঠেচে প্রবালদ্বীপ। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির ছাপ এখানে বেশি। তা হলেও কয়েকটি বিশেষ ধারার পরিচয়ও মেলে যাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে এক এক গোষ্ঠী ও পরিবার। এবার বিচার্য গোষ্ঠীপতি। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

"রবীন্দ্রনাথ হ'ল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ।" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ সবি তাঁর কাছে ফুটে উঠেচে। তবে এ মধ্যবিত্ত সামন্ত-তন্ত্রেরই রকমফের। উনিশ শতকী ভূমি-আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবেই এ স্মরণীয়। তাই সত্যিকার বুর্জোয়া সভ্যতার রূপ চোখে পড়ে না। তা সত্ত্বেও তাঁরি কলমে বেরিয়েচে য়ুরোপীয় সমন্বয়—সাধনা। তিনি ভারতীয় ভাবকে ইউরোপীয় পোষাকে ধ'রে দিয়েচেন। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমের চেয়েও বেশী ভারতীয়। সাধনা এখানে সিদ্ধিতে পৌঁছেচে। আদর্শ ও বাস্তবের যে মিলন তিনি রূপায়িত করেচেন, তা বিস্ময়ের। তাইতো রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিদাতা ভাব ও ভাষার নতুনত্বে। শুধু তাই নয়, এতে মিলেচে সাহিত্যিকরূপের বিকাশও। মধ্যবিত্ত মানসের বিকাশেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যায়ন। এতে ধরা পড়েচে ৪টি স্তর—ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমস্যাসঙ্কুল ও

গার্হস্থ্য : এতে দেখা যায় ১৩ খানা উপন্যাস। এ-ছাড়া আছে 'করুণা' (প্রথম উপন্যাস) যার কলেবর রক্ষিত হয়েচে "ভারতীর" আশ্বিন—ভাদ্র সংখ্যায় [১৮৭৭-৭৮]।

ঐতিহাসিক

রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকের জীবন সুরু করেচেন রমেশ দত্তীয় ঐতিহাসিকতায় : এই অনুবর্তনের ধারা চলেচে "বৌঠাকুরাণীর হাটে" (১৮৮৩) ও "রাজর্ষিতে" (১৮৮৭)। প্রথমটি প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে; এরি মারফতে লেখক পেয়েচেন জয়মাল্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে : এ বয়সে রবীন্দ্রনাথ "অন্তর্বিষয়ী" ভাবলোক থেকে "বহির্বিষয়ী" কল্পনালোকে কেবল প্রবেশ করেচেন। গন্তভূমি তখনো পাকা হয়নি। তাই "রোমান্টিক ভূমিকায় মানব চরিত্র নিয়ে খেলা" চলেচে! এ উপন্যাস যেন "পুতুলধর্মী আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষি।" সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান নেই এখানে। তাই রূপায়নে চরিত্রগুলি তেমন এগোয় নি। বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক হ'লেও রূপায়নের দিক থেকে কাল্পনিক। স্বদেশীযুগপূর্ব ব'লে প্রতাপাদিত্য "বীরচরিত্র" হ'তে পারেনি। তাঁর হিংস্রতা যত প্রকট, তত নয় তাঁর স্বদেশপ্রেম। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য থাকলেও, তাঁর ক্ষমতা ছিল না। তাইতো আছে একটা দ্বন্দ্ব তাঁর মানসে, যা প্রকাশ পেয়েচে বাইরের ঘটনায়ও একদিকে প্রতাপাদিত্য, অন্য দিকে বসন্ত রায় ও উদয়াদিত্য। হিংস্রতা দাঁড়িয়েচে কোমলতার বিরুদ্ধে প্রায় সর্বত্রই স্থূল রঙাবলেপের চিহ্ন পরিস্ফুট! তাই পরে একে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েচে

'রাজর্ষি' কিন্তু এরি তুলনায় অনেকটা এগিয়েচে। এ হ'লো "স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস" : এতে আছে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ" : শৈল্পিক সুষমার দিক থেকে এর আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া উচিত ছিলো পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। কিন্তু সাময়িক পত্রের অবিবেচনার ফলে তা হয়নি। তাই ঔচিত্যের সুমিতি-মাত্রার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। এ কাহিনীর সূত্রধর হ'লো কৈলাসচন্দ্র সিংহের "ত্রিপুরার ইতিহাস"। অবিশ্যি কল্পনাও জুড়েচে অনেক জায়গা এখানে। চিত্রণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হ'লো রঘুপতির অন্ধ ক্রূরতা, জয় সিংহের প্রেম ও গোবিন্দ মাণিক্যের ভ্রাতৃবাৎসল্য। চরিত্রায়ন এখানে উন্নততর হ'লেও গল্পায়নের ঔচিত্য রক্ষা হয়নি। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসেও কল্পনাচাতক নভোচারী হয়েচে। সে মাটির ধরায় অবতরণ করেচে অল্পই। তবু ঐতিহাসিকতায় তৈরি হ'লো বাস্তবায়নের ভিৎ, যা পরে আশ্রয় দিয়েচে বিরাট চরিত্রশালার ইমারতকে :

মনস্তাত্বিক

মনোবিকলনে গড়ে উঠেচে "চোখের বালি" [১৯০৩], "নৌকাডুবি" [১৯০৬] ও "গোরা" [১৯১০]। "চোখের বালিতে" রবীন্দ্রনাথ প্রথম নেমেচেন "মানব-সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ়ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।" অচৈতন্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশেই হ'লো এর বৈশিষ্ট্য। ঘটনা পরম্পরার বিবরণ এখানে গৌণ, তার বিশ্লেষণই মুখ্য। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, আশা যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেচে, তাতে তাদের বৈশিষ্ট্য যেমন

ফুটেচে, তেমনি ঘটনাধারার রূপান্তরও আবর্তে তারা জড়িয়ে পড়েচে। বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর সগোত্রীয় হ'লেও,' একটু সে আলাদা। নৈতিকতা এখানে রসিকতার পরিণত হয়েচে। মহেন্দ্রের চরিত্র বিকাশ হয়েচে হিংসার মাধ্যমে আর "পশুশালার দরজা" দিয়ে বেরিয়ে পড়েচে ঘটনাপ্রবাহ। মহেন্দ্র বিনোদিনীর আকর্ষণ বিকর্ষণই উপন্যাসের উপজীব্য। মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে এ-সব উল্লেখযোগ্য। নিষিদ্ধ প্রেমের নতুন অধ্যায়ে বিনোদিনী হীরা-রোহিনী এবং কমল-কিরণময়ীর মাঝখানে পড়ে। সমাজবৃত্ত প্রাণবৃত্তের সঙ্গে সমতা রক্ষা কর্তে পারে নি। ফলে দোটানার সৃষ্টি হ'লো বিনোদিনী।

অস্বাভাবিক মনবিকলনে এসেচে "নৌকাডুবি" যেখানে "অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কিন্তু ঔৎসুক্যজনক।" এখানকার প্রশ্ন হচ্চে, স্বামী-সংস্কার একটা ভাব না জীবন্ত বিগ্রহ যা রক্তমাংসের সঙ্গে বাড়ে কমে। মনস্তাত্ত্বিক এ পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয় বঙ্কিমের "কপালকুণ্ডলা", যদিও দু'জনের বক্তব্য আলাদা। কমলা দোলকের মতো দুলেচে রমেশ ও নলিনাক্ষ রূপ দুই বিন্দুর মাঝখানে। উপসংহারে অবিশ্যি স্বামী ভক্তি জয়ী হয়েচে, তবে প্রমাণের উপর ভর না ক'রে স্বতঃসিদ্ধতত্ত্ব হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েচে। হিন্দুনারীর সংস্কারই এখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েচে, যার সুষ্ঠু প্রকাশ শরৎচন্দ্রের "স্বামীতে"। রমেশ কিন্তু হ'য়ে রইল শোকান্তিকার হতভাগ্য নায়ক। "তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয়, যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। নাটকীয়তা এসেচে বিস্ময়ে, ভুল-আবিষ্কারের চমকে।" শেকসপীয়ারের "কমেডি অব এররস্" এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এর পর 'নৌকাডুবির' ভুলের দম লাগানো হয়েচে "গোরার" গোরা চরিত্রে। তার জীবনে অশনিপাত হয়েচে ভুল-ভাঙায়। হিন্দুয়ানীর গর্ব ভেঙে চুরমার হ'লো ইঙ্গ-ভারতীয়তার আবিষ্কারে। প্রচারধর্মী উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমের "আনন্দ মঠের" পর "গোরার" স্থান। এর পর অবিশ্যি আছে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"। বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্"এর হয়েচে এক নতুন পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। দেশমাতৃকা দেখা দিয়েচে "কল্যাণের মূর্ত্তি" হিসেবে। এরি স্পর্শে গোরা জেগে উঠেচে দেশপ্রেমের চেতনায়। এখানে রূপায়িত হয়েচে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, সমাজ ও ধর্মের বিরোধ। স্বদেশী যুগের পটভূমিকায় যে সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এখানে তার নিরাকরণ হয়েচে সমন্বয় সাধনে। গোরা-সুচরিতার মিলনে হিন্দু ও ব্রাহ্ম-ধর্মের মূলীভূত ঐক্য স্থাপিত হয়েচে। পানু ও বরদাসুন্দরী সঙ্কীর্ণতার প্রতীক যেমন কৃষ্ণদয়াল ও হরিমোহিনী। আরো দুটি মাণিক জোড়ের পরিচয় মেলে বিনয় ললিতা ও পরেশ আনন্দময়ীতে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি যে বৃহত্তর ভূমিকায় এক হ'তে পারে, এখানে আছে তার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

ব্যক্তিক সত্তা রাষ্ট্রিক চাপে কি ভাবে বিকাশ লাভ কর্তে পারে তাও দেখান হয়েচে। মোটকথা, "গোরা" সমস্যাবহুলতায় ভাস্বর ও বিশালবপু। এ তাই বিংশশতকী মহাকাব্য, যাতে ভৌম আভিজাত্য রূপান্তরিত হয়েচে সাংস্কৃতিক কৌলিন্যে। এর সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে রোঁমা র'লার "জ্যাক্রীস্তভ্"। দুয়েরি চলাফেরা রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ও জীবনজিজ্ঞাসায়, কিন্তু একটি হসন্তিক', অন্যটি শোকান্তিকা।

সমস্যাবহুলতায় এগিয়েচে "ঘরে বাইরে" [১৯১৬] ও 'চার অধ্যায়" [১৯১৪] এবং "চতুরঙ্গ" [১৯১৬] ও "শেষের কবিতা" [১৯২৯]। প্রথম দু'খানির উপজীব্য হ'লো রাজনীতি ও প্রেমের সংঘর্ষ আর দ্বিতীয় দু'খানির প্রেমের স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ব। এখানে সমস্যা আবর্ত্তিত হয়েচে সমাধানের পথে। বিষয়বস্তু বাদ দিলে এখানকার আঙ্গিকে আছে নতুনত্ব, যা 'মহাকাব্যিক' পদ্ধতি ছেড়ে অনুসরণ করেচে নাটকীয় রীতি। পূর্বে যেখানে গোটা জীবনের পটে আঁকা হয়েচে পাত্র পাত্রীকে, এখানে তাদের জীবনের দু'একটি ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েচে চিত্র-চরিত্র। নাটক ও উপন্যাসের সমবায়ে সাহিত্যের যেরূপ ফুটেচে তাকে 'নাট্যোপন্যাস' বলা চলে। এদিকে 'প্রজাপতির নির্বন্ধই' [১৯০২] পুরনো। নাটকীয়তাই এর বৈশিষ্ট্য। ফলে এর নাট্যরূপ হয়েচে "চিরকুমার সভা"। 'ঘরে বাইরে'র পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয় ফ্রয়েডীয় স্মৃতিরোমন্থন, যার মারফতে ব'য়ে চলেচে গল্পায়ন। এক এক জনের আত্মকথায় আছে জীবনের যে পরিচয়, তাই চলচ্চিত্রে জড় হয়েচে। আর এক অখণ্ড চিত্রপ্রবাহ ধরা পড়ে! আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে এগিয়েচে বর্ত্তমান ও অতীত। চৈতন্যপ্রবাহে এক একটি দ্বীপ জেগে উঠেচে। বিমলা নিখিলেশ ও সন্দীপের দোটানায় দুলেচে। এ কিন্তু সম্ভব হয়েচে রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ে। রাজনীতির আবর্ত্তে যে পঙ্কিলতা ঘুলিয়ে উঠেচে, তারি প্রতীক হ'লো সন্দীপ। তাই সন্দীপের কাছে "বন্দেমাতরম্" এর চেয়ে "বন্দেমোহিনীম্" বেশী সত্য। বিমলার সত্তাও দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেচে ঘরে বাইরের টানে। মোটকথা উপন্যাসের রূপ, বর্ণনভঙ্গি, মনোবিকলন ও চরিত্রচিত্রণে এসেচে এর বৈশিষ্ট্য, যা উদ্ভটবাকে প্রকাশ পেয়েচে।

'নাট্যোপন্যাসে'র চরম পরিণতি হ'লো 'চার অধ্যায়', যা ৪টি অধ্যায়ে বা অঙ্কে ও একটি ভূমিকায় লেখা হয়েচে। এলা-অন্তর প্রেমই উপন্যাসের উপজীব্য। 'ঘরেবাইরেতে' রাজনীতি প্রেমকে গদিচ্যুত করেচে আর 'চার অধ্যায়ে' এ আগমনের পথে বাধা হয়েচে। রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বিপ্লবী যতীনের নীতিজ্ঞান, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও প্রেম এ-তিনই পীড়িত হয়েচে। তাই সে আবিষ্কার করেচে প্রেমের স্বরূপ—"অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম।" গানও উৎসারিয়ে উঠেচে তার কণ্ঠে—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম,
আমার সর্বনাশ।

অন্তর এই উদ্দামতায় আছে প্রেমের দ্বৈতরূপ—সৃষ্টি ও ধ্বংস, আনন্দ ও বিষাদ। অন্যদিকে এলার প্রাণলীলার চঞ্চলতাও তীব্রতায় বিস্ময়কর। সে আভাস দিয়েচে আত্মনিগ্রহিক উল্লাসে: "আমার এ দেহ তোমার। আমাকে মারো। আমার চৈতন্যের শেষমুহূর্ত্ত তুমিও নাও।" এ যেন ব্রাউনিংএর ক্ষণিকার গণ্ডি পেরোনো।

স্বকীয়া-পরকীয়া সাধনার কথা বলা হয়েচে চতুরঙ্গে। এর ৪টি অঙ্গ হ'লো জগমোহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। এ সব গ্রথিত হয়েচে স্রষ্টার আত্মজৈবনিক কথনে। স্রষ্টা এখানে নিজেই একটি চরিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত হয়েচেন। সব প্রেম যে প্রেম নয় এখানে তাই দেখান হয়েচে, কাম ও রসের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তারি পরিচয় দেওয়া হয়েচে। মনোবিকলনে দেখা যায়, রসের উল্টো পিঠই কাম। দামিনীর জীবনে দোলা এসেচে ভংতোষ, লীলানন্দ ও শচীশের মারফতে। শচীশ রসরূপের নিরসন করেচে মুক্তিতে, যেমন শ্রীবিলাসের আশ্রয়ে দামিনী। মন ও প্রাণের লীলাই ফুটেচে এখানে। শোকান্তিকা এসেচে অন্তর্দ্বন্দ্বে, মন ও প্রাণের দ্বৈতভাবে।

এরি অনুবর্ত্তন চলেচে 'শেষের কবিতায়'। বৈষ্ণব পরকীয়া-তত্ত্ব এখানে কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়েচে। অমিত—শোভনলালের দু'টো ডানায় উড়েচে লাবণ্য। একদিকে আছে 'রোমান্সের পরমহংস', অন্যদিকে ঘড়ার জল, একদিকে ডানার মুক্তবিহার, অন্যদিকে শ্যাওলাঘেরা স্থবিরত্ব। এ দুয়েরই টানাপোড়েনে লাবণ্য বুঝেচে স্বকীয়াপরকীয়া তত্ত্বের পার্থক্য, পদ্য ও গদ্যের বিভেদ। শিলং পাহাড়ে লাবণ্য অমিতকে পেয়েছিলো আর তাকে ছেড়ে যেতে হ'লো শোভনলালী সমতলে। লাবণ্যর মত কেতকী না হ'লেও, তারি মারফতে পরকীয়াতত্ত্বের বিত্ত করা হয়েচে। বিবাহান্ত প্রেমের চেয়ে বিবাহপূর্ব প্রেম বেশী প্রসারশীল। তাইতো লাবণ্য বলচে—"হেথা মোর তিলে তিলে দান, করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান।" এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হ'লো তত্ত্ব-প্রকাশনে। গল্পায়নের চেয়ে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হয়েচে। তবে পরিণতি একটু দৈবায়নের আভাস দেয়। লাবণ্যর পক্ষে অমিট্ রেকে ছেড়ে শোভনলালকে গ্রহণ অত সহজ হয়নি। তাই লেখক উপসংহার এনেচেন কবিতার মারফতে। বিষয়বস্তু বাদ দিলে থাকে আঙ্গিক। এর বৈশিষ্ট্যও কম নয়। বিরোধকল্পের তির্য্যক ভঙ্গিও লক্ষণীয় যথা, (১) 'মানুষের ইতিহাস আকস্মিকের মালা-গাঁথা', (২) 'ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবী করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ'। "শেষের কবিতা" কাব্যরসে পাড়ি জমিয়েচে। শুধু তাই নয়, এতে আছে ভাব ও অনুভূতির অভিজ্ঞান যা রসিয়ে দিয়েচে গল্প ও চরিত্রকে। অমিত ও লাবণ্য ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি একটু ফিকে বলে মনে হয়।

তারকনাথের "স্বর্ণলতায়" যে ধারার বিকাশ দেখা যায় তা আরও এগিয়ে এসেচে বিশ শতকে। এই ঘরোয়া ধারাকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ করেচেন নূতনতর ভাব ও রসের বৈচিত্র্যে। ঘরোয়া পরিবেশে প্রেমের যে

গার্হস্থ্য

পরিচয় মেলে তার জন্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো "যোগাযোগ" [১৯২৯], "দুইবোন" [১৯৩৩] ও "মালঞ্চ" [১৯৩৪]। এক হিসেবে সব উপন্যাসই ঘরোয়া, যেহেতু মানুষ স্বভাবতই সাংসারিক। আর এ সংসার চলতে পারে না যদি না থাকে ঘরের আকর্ষণ। তাহ'লেও গার্হস্থ্য ধারার মৌলিকত্ব পাওয়া যায় ছোটখাট সুখদুঃখের হিসেব-নিকেশে। এতেও স্থান পায় মনোবিকলন, সমস্যাজটিলতা ও নাটকীয় সংঘাত।

"যোগাযোগের" নামেই আছে বিষয়বস্তুর পরিচয়। স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব-নিরসন সম্ভব শুধু জাতকের অভ্যাগমে। কুমুদিনীর মানসিক দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েচে স্বামী ও ভাইকে ঘিরে। একদিকে স্বামী-প্রেম, অন্যদিকে ভ্রাতৃপ্রেম। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধেও চিড় ধরেচে। স্বামী মধুসূদন তাই ক্ষুণ্ণ হয়েচে কুমুদিনীর ভ্রাতৃ-প্রেমে। কুমুদিনীর জীবনের শোকান্তিকায় প্রাণন ও সংস্কারের দ্বন্দ্বও লক্ষণীয়। সে একদিকে জৈব তাড়নায় প্রাণনে এগিয়েচে স্বামীর দিকে, অন্যদিকে স্বভাবজ সংস্কারে ভাইয়ের দিকেও ঝুঁকেচে। তার এক কোটি মধুসূদন, অন্য কোটি বিপ্রদাস। নবজাতকের অভ্যাগমে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ আবার স্থাপিত হবে, কিন্তু ভাইয়ের কি রইল! ভ্রাতৃপ্রেম স্বামী-প্রেমের বেদিকায় আত্মাহুতি দিয়েচে। তাই বিপ্রদাসের শোকান্তিকার কোন শেষ নেই। কি নিয়ে সে সংসারে টিকে থাকবে, যখন স্নেহের নীলমণি কুমুকে তার বিসর্জন দিতে হ'লো। যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলার জন্যে অশ্রুপাত করেচেন, তিনি স্বয়ং রচনা করলেন উপন্যাসের উপেক্ষিত। তবে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরার জন্যে মধুকে যে দুঃখ পেতে হয়েচে, তাও কম নয়। শোকান্তিকা ভেঙে পড়েচে যখন কুমুর হাত চেপে মধু ব'লে উঠেচে: "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?" মোটকথা, এখানে যে শোকান্তিকার প্লাবন বইয়েচেন লেখক, তা সত্যি রসোত্তীর্ণ। এজন্যে লেখক 'তিনপুরুষের' জায়গায় এনেচেন 'যোগাযোগ' নাম। কারণ, রূপের চেয়ে রসের, বস্তুর চেয়ে রূপের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচেন লেখক।

"দুই বোনের" উপজীব্য হ'লো নারী জাতির দুই রূপ প্রদর্শন। দেখা যায় মেয়েরা "দুই জাতের—এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।" প্রিয়া ও পত্নীর যে রূপ ফুটেচে "শেষের কবিতায়", এখানে তার এক নতুন ভিয়ান। সেখানে সমস্যার জটিলতা দেখান হয়েচে নারীর দিক থেকে, এখানে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। শশাঙ্ক'র কাছে শর্মিলা মায়ের জাত, আর উর্মিমালা প্রিয়ার। অর্থাৎ শর্মিলা ও উর্মিমালা যেন ধ্রুপদ ও খেয়ালেরই নামান্তর। একটি প্রেমের ত্রিভুজ গড়ে উঠেচে—এ তিন জনকে নিয়ে। এর জট খুলে গেলো যখন শর্মিলা বেঁচে উঠলো আর উর্মিমালা গেল বিলেতে। শর্মিলা কোন ঈর্ষা রাখেনি, তাই তার পরবর্তী মিলন সম্ভব হয়েচে শশাঙ্ক'র সঙ্গে। আর সমাধানও এলো সমস্যার নিরাকরণে। "মালঞ্চ" কিন্তু "দুই বোনেরি" উল্টো পিঠ। এখানে নারীর পক্ষ থেকে সমস্যার জটিলতা দেখান হয়েচে। সরলার প্রতি আদিত্য'র যে আচরণ তা স্ত্রী নীরজাকে পীড়া দিয়েচে। এ তার

কাছে অসহনীয় হয়েচে। তাই নীরজা আদিত্যকে সরলার হাতে সমর্পন কর্তে পারে নি। মৃত্যুশয্যায় নীরজার শিরা-উপশিরায় ভর করেচে ক্রোধের ভয়ালতা। ফলে সে হয়েচে প্রেতায়িত আর বলচে সরলার উদ্দেশ্যে সতেরোশতকী ডানের প্রেমিকের মতো : "জায়গা হবে না রাক্ষসী। পালা পালা পালা, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলবো তোর রক্ত।" এই দানবিক চিত্র বিস্ময়কর, মনস্তাত্ত্বিক তো বটেই। রোগের আক্রমণে চৈতন্য প্রহরী হয় পঙ্গু আর কেবল পশুশালাই দেখা যায় অচৈতন্য প্রান্তরে। এখানে ও হয়েচে তাই।

সমাজ চিত্র

সাহিত্যিক প্রগতি চলেচে উপন্যাসের বাস্তবায়নে আর সামাজিক অগ্রগতি জনসাধারণের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্জনে। তাই সমাজেও উলট পালট স্বাভাবিক নিয়ম। উনিশশতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠলেও সে পায়নি সাহিত্যিক স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রে। তাই সামন্ততন্ত্রীয় জমিদারই আসন দখল করে আছে যেমন "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "সীতারামে।" এ ধারণা ক্রমে ক্রমে বদলালো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সামন্ত আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারেন নি। তাই উপন্যাসের ভিৎ হিসেবে নব্বুই যুগের "বৌঠাকুরানীর হাট" [১৮৮৩] ও "রাজর্ষি" [১৮৮৭] লক্ষণীয়। এখানে সামন্তযুগ যেন শেষবারের মতো জ্ব'লে নিভে গেলো। তারপর যে প্রদক্ষিণ তাতে দেখা যায় মধ্যবিত্ত বাবুশ্রেণীর অভ্যুদয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক আভিজাত্য গ'ড়ে উঠলো, তারি জয় জয়কার এখানে। ভূমিজ আভিজাত্য এখানে নেপথ্যে, স্মৃতি রোমন্থনে। রঙ্গমঞ্চ ভরপুর হ'লো মধ্যবিত্তদের সৌখীন বিলাসে। এই মধ্যবিত্তদের দেখান হ'য়েচে ঘর ও বাইরের চেহারায়। একদিকে আছে ব্যক্তিক চেতনা, অন্যদিকে রাষ্ট্রিক বিপর্যয়। ব্যক্তিকতায় প্রেমই বড়ো হ'য়েচে আর এগিয়েচে বৈষ্ণব স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বে। "ঘরে বাইরের" বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্বেই আছে এ পরিস্থিতির পরিচয়—

> আমার ঘর বলে তুই কোথায় যাবি
> বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি—
> আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব যাক না উড়ে পুড়ে।

তাই "চোখের বালি", "নৌকাডুবি", "চতুরঙ্গ", "শেষের কবিতা", "যোগাযোগ" ও "মালঞ্চ" ব্যক্তিক দিকের পরিচায়ক। বাইরের দিক থেকে অবিশ্যি এসেচে "গোরা" ও "চার অধ্যায়"। এখানে রাজনীতির কথা আছে। "গোরা" সংস্কৃতিবিলাসীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে পরিবেশ পরিবর্ত্তনে যে আদর্শ-সংঘাত দেখা দিয়েচে এখানে আছে তারি পরিচয়। ধর্ম্ম রাষ্ট্র ও বর্ণের যে রূপ-রূপান্তর তা হয়েচে বিধৃত। গোরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক, যা সংস্কৃতির বিলাসে আর একবার শিলং শিখরে ঝলসে উঠেচে "অমিটরে"তে। নারীচরিত্রেও এর পরিচয় মেলে লাবণ্য-কেতকীতে।

মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকটাই ধরে দিয়েচেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নিচের স্তরের কোন সাক্ষাৎ এখানে নেই। মধ্যবিত্তর উপরি তলায় বাসা বেঁধেচে সামন্ততান্ত্রিক ভূত। এই ভূতে-পাওয়া সংস্কৃতিবিলাসীর চিত্রণেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। এর কারণ, তিনি নিজেই এ জগতের বাসিন্দা। এ সম্বন্ধে তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি, যার মারফতে তিনি বলেচেন—

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

বৈশিষ্ট্য

তাই অন্ত্যজদের চিত্রণে তেমন কোন পারদর্শিতা ফোটেনি। বঙ্কিমী আদর্শায়ন থেকে রবীন্দ্রনাথ এসেচেন বাস্তবায়নে। তবে এও রসের ভিয়ানে এক রকমের আদর্শায়ন। বস্তুত দেশকালের গণ্ডি পেরোতে এরও প্রয়োজন আছে। তাই এ এসেচে কল্পনা-বিহারে। বস্তু ও কল্পনার হরিহর মিলনে সম্ভব হয়েচে এ অগ্রগতি। তাই 'চোখের বালি' 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নামান্তর হ'লেও এ রূপান্তরের সগোত্রীয়। রোহিনীর তুলনায় বিনোদিনী প্রগতিশীলা, রবীন্দ্রসাহিত্যে নান্দনিক। এতে তাই ব্যক্তি স্বভাবতই একটু বেশী নৈর্ব্যক্তিক। ভাব ও ভাষারই প্রাধান্য বেশি। যৌন সম্বন্ধের বিকাশ দেখান হয়েচে উন্নততর রুচিবোধে। সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বয়ে চলেচে এ সাহিত্যায়ন। চরিত্রচিত্রণ ও গাল্পিকতা হয়েচে উপভোগ্য। মোট কথা, বাবু-সংস্কৃতি এখানে স্রষ্টা আর সৃষ্টি হ'লো এর বিলাসব্যসন। এর ভুল ত্রুটি, আদর্শ-সংঘাত নিয়েই বয়ে চলেচে এ খেয়াতরী। কালায়নের চেহারাবদলে তাই খেয়াতরীরও হয়েচে রূপ-বদল। উপন্যাসের রূপবিন্যাসে ধরা পড়েচে কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গি।

হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি বদল স্বাভাবিক। তাই উপন্যাসের রূপেরও হয়েচে পরিবর্তন। প্রথমেই আছে 'ঐতিহাসিক' রূপ, যা উপাদান মারফতে গড়ে উঠেচে। তারপর 'মনস্তাত্ত্বিক' রূপ, যার পরিচায়ক হ'লো 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি। 'আত্মজৈবনিক' ধারারও বিকাশ আছে 'ঘরে বাইরে'তে। 'নাট্যোপন্যাস' এসেচে 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' ও 'চার অধ্যায়ে'। এখানে নাটক ও উপন্যাস মিলেচে। 'প্রাবন্ধিক' উপন্যাসে রূপায়িত হয়েচে 'শেষের কবিতা' 'যোগাযোগ' প্রভৃতি। এ সব রূপরূপান্তরে প্রাণ-প্রাচুর্যের চেহারা ফুটেচে। প্রচারধর্মীরও সন্ধান মেলে 'গোরায়'। সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য হ'লো উপন্যাসে জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধান। গোটা জীবনটাই এখানে ডানা মেলেচে। স্রষ্টা সমস্যা তুলে ধরেচেন, কিন্তু সমাধান সর্বত্র দেখান নি। এ হ'তে পারে না। কারণ, জীবন যে এক বিরাট সমস্যার সমুদ্দুর, সেখানে ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নিলতা। কাজেই জিজ্ঞাসার ওঠানামায় কাছে জীবনায়নের পরিচয়। সৃষ্টি আবর্তিত হচ্চে এ নিয়েই। তাই রবীন্দ্রনাথ একে রূপ দিয়েচেন পন্যাসে। কিন্তু জীবন এখানে সীমিত হয়েচে মধ্যবিত্ত কাঠামোয়। তা সত্ত্বেও

এর স্বাদ রসের। রূপ পরিণতি পেয়েচে রসোত্তীর্ণতায়। ফলে সসীম অসীমের পথে ছুটেচে শৈল্পিক সুষমায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আবেদন তাই নৈর্ব্যক্তিক। সমাজচেতন মনে দাগ কেটেচে ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত্ত। কিন্তু এ তাতে কাতর হয় নি। যেহেতু রবীন্দ্রমানসের ভিত্তি হ'লো ঔপনিষদিক, তাই সসীম বিশ্ব ছেড়ে যাওয়ার দিকে এর ঝোঁক বেশি। একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেচেন। তিনি বলেচেন, তিনি সুদূরের পিয়াসী। এর থেকে তাই লৌকিক জ্বালা ক'মে গেচে। অথচ মানুষ চায় তার পরিবেশের চিত্রণ। তার মানস বরাবরই একটু বেশী প্রাণধর্মী, বাস্তবের দিকে তার ঝোঁক। তাৎকালীন ঘটনায় যদিও রবীন্দ্রপ্রতিভা জ্ব'লে উঠেচে, তবুও সেগুলি হয়েচে অসাধারণ। সুচরিতা গিরিবালা সিসিলিসি—কেটি প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে তিনি করেচেন অসাধারণ, জীবনায়নের ঘূর্ণীকে "একটি অবিশেষ জীবন বহতার অঙ্গ হিসেবে রূপ" দিয়েচেন। ফলে এ শ্রেণী সাহিত্য হ'য়েও হ'লোনা। এর মূল কারণ অবিশ্যি তাঁর মৌল বিশ্বাসের প্রকৃতি, যা সত্য-শিব-সুন্দরের অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত। এর বাইরে যা আছে তা স্বভাবতই অনুপস্থিত রবীন্দ্রসাহিত্যে। দুঃখদৈন্যের এখানে প্রবেশাধিকার নেই। এই বিষয় বস্তু তাই পূর্ব থেকে নির্বাচিত। আঙ্গিকে ফুটেছে চিত্রকল্পের বাহার। এদের বিন্যাসে আছে একটা পারম্পর্য। তাই "রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ডকীর্ত্তি হ'লেও তিনি বাংলার ঐতিহ্যে সাগরগামী নদী নন, বিশাল ও মনোরম হ্রদ"। এর কারণ, "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছকের মানুষ একটু কম অবিশেষ, যদিও সেটি বিদেশী সাহিত্যের রক্তমাংসে গড়া, অন্য জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিশেষ ব্যক্তি নয়।"

(২) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

যে বিশিষ্ট সংস্কৃতির পরিচিতি বহন কচ্চে রবীন্দ্র সাহিত্য তা সমসাময়িকরা কেউ ধর্ত্তে পারেন নি। এ প্রতিভাও সময়সাপেক্ষ। তাই রবীন্দ্র কীর্ত্তির বাহকের অভাবই দেখা যায় রবীন্দ্রপর্বে। এখানে দু'টো আদর্শই দোলা এনেচে। একদিকে বঙ্কিমী ঢঙ অন্যদিকে রাবীন্দ্রিক রীতি। লিখিয়েদের পক্ষে প্রথমটির অনুসরণ যত সহজ শেষেরটির ততটা নয়। ফলে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মাঝ পথেই চলেচে এ যুগের সাহিত্যায়ন, যার ঝোঁক পুরনোর দিকেই একটু বেশি। পুরনো প্রসিদ্ধির অনুবর্ত্তনে যাঁরা এগিয়েচেন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেচেন তাঁদের মধ্যে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় অগ্রণী। রবির ছায়ায় তিনি হাস্যরসের আলো ফেলেচেন। এতে রবির ছায়া আলোকিত হয়েচে। কাজেই এও কম কৃতিত্ব নয়। স্বল্পপরিসরে গল্পফাঁদা প্রভাত-কুমারী বৈশিষ্ট্য। বৃহত্তর পটভূমিকায় গল্পায়ন তাঁর পক্ষে একটু কষ্টকর। তাই তাঁর উপন্যাস ছোট গল্পেরই বিলম্বিত সংস্করণ। চরিত্রায়নের চেয়ে গল্পায়নই এখানে বড়ো। ফলে ছোট গল্পে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেচেন, তা উপন্যাসে অনুপস্থিত।

কম আখ্যান বস্তুকে বেশি ক'রে দেখাতে গেলে সে বেলুনের মতো ফেঁপে ওঠে। এখানেও হয়েছে তাই। কাজেই শৈল্পিক সুষমার অভাবই চোখে পড়ে। প্রভাত কুমার রক্ষণশীলতায় বঙ্কিমী আর ভাষায়নে রবীন্দ্রধর্মী। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই হ'লো তাঁর গোঁড়ামির বনিয়াদ। এরি ফলে "নবীন সন্ন্যাসীর" গদাইপাল তেজস্বী চরিত্র হ'য়েও পরাজিত হয়েছে নীতিবাদের কাছে। বলা বাহুল্য, এইনীতি-বাদ একটু বেশি প্রকট হয়েছে অনেক জায়গায়। তাই শিল্পায়নের দৃষ্টিকোণও গেচে বদলে সংস্কার-প্রবণতায়। কলাশিল্প ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এ-দোষের নিরসন হয়েছে কিছুটা হাস্যরসের আমদানীতে। এই হাস্যরসিকতায় আজো ঝল-মল করে প্রভাতকুমারী সাহিত্য। এ না থাকলে, এগুলো হ'তো অপাঠ্য।

চরিত্রধর্মী

এবার আলোচ্য উপন্যাসগুলি, যা দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য। এক, চরিত্র-ধর্মী, দুই, আখ্যানপ্রধান। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে "রমাসুন্দরী" (১৯০৭), "নবীন সন্ন্যাসী" (১৯১২) ও "রত্নদীপ" (১৯১১)। রমাসুন্দরীর চারিত্রিক বিবর্তনে পৌরুষ রূপান্তরিত হয়েছে পত্নীত্বে। বিয়ে হ'লো রসায়নের অনুঘটক যার মারফতে নারীত্বের হয় রূপান্তর। প্রভাতকুমার এ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যদিও নেই মনোবিকলনের আধুনিক প্রয়োগ। বঙ্কিমী রীতিই স্বীকৃতি পেয়েচে। চরিত্রের উপর কাশ্মীর ভ্রমণ ছায়া ফেলেচে। তাই সমাধান লেখকের পক্ষে সহজ হয়েচে। চরিত্র চিত্রণে চক্রান্তী সতীনাথ ও কঠোর কান্তিচন্দ্র উল্লেখের দাবী রাখে। "নবীন সন্ন্যাসীর" গদাইপাল জীবন্তচরিত্র, যা জমিদারী সেরেস্তায় দেখা যায় সচরাচর। জমিদারেরও প্রজার মধ্যে অসন্তোষের কারণ এরা। ভণ্ডদম্ভ, ঠকচাচার বংশধর এই গদাধর। এ ইংরেজি 'ভিলেইন' এর বাংলা সংস্করণ. এক রকমের পাষণ্ড। মামলার জালে অন্যান্য চরিত্র ক্ষীণকায় ও ধূসরিত। মোহিত ও চিনি যেন গদাই জালের ধৃত মাছ। গদাধর তাই ব্যক্তি নয়, জাতিরূপ। "রত্নদীপের" খগেন কৌতুকরসে পাঠকের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখেচে। ফলে গল্পায়ন এগিয়েচে সরলতায়। চরিত্রায়নে বৌরাণী স্মরণীয়। এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"। ভুলভাঙায় বৌরাণী তুলে নিলো তার প্রেম রাখালের কাছ থেকে। এতে জড়িয়ে আছে অবিশ্যি এক দুরূহ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, যা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েচেন "কপালকুণ্ডলায়"। তবে সমস্যার রকমফেরেই আছে যুগের দাবী।

আখ্যান-প্রধান

গাল্পিকতায় বিচার্য "জীবনের মূল্য" (১৯১৬), "সিন্দুরকৌটা" (১৯১৯) ও "মনের মানুষ" (১৯২২)। "জীবনের মূল্য" আকস্মিকের মালা-গাঁথা। গল্পায়নে কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুপস্থিত। তবে চরিত্রচিত্রণে কিছুটা বৈশিষ্ট্য এসেচে। বিয়েপাগলা গিরিশ ও শ্লোকআওড়ানে সতীশ একটু জীবন্ত। তবে এতে মনস্তাত্ত্বিক তেমন কোন সূক্ষ্ম কারিকুরি নেই। "সিন্দুর কৌটায়" ভ্রমণ কাহিনী জায়গা জুড়ে আছে। এরি সঙ্গে মিশেচে বিজয়-সুশীর প্রণয়রস। আখ্যানের দিক থেকে বকুরাণীর কৃচ্ছ্র-সাধন স্মরণীয়, যা আঁকা হয়েছে হিন্দু নারীর

সংস্কারের ভিত্তিতে। পলসাহেব একটু চড়া রঙে আঁকা হয়েচে। "মনের মানুষে" কৌতুক-রসের ভিয়ান। এর তুলনায় যোগেন্দ্র-ইন্দুবালার মিলন-কাহিনী নিষ্প্রভ হয়েচে। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো "আরতি", "সত্যবালা" (১৯২৪), "গরীব স্বামী" ও "সতীর পতি" (১৯২৮)। এখানে নতুনত্বের তেমন কোন পরিচয় মেলে না। গতানুগতিকতায় এগিয়েচে এরা। চরিত্র ও আখ্যান নিয়ে যে দু'টি ভাগ হয়েচে, তা কিছুটা অবৈজ্ঞানিক। উপন্যাসে দু'য়েরি প্রয়োজন আছে। চরিত্র ছাড়া আখ্যান চলতে পারে না, আবার আখ্যান বাদে চরিত্র থাকতে পারে না। কাজেই বিভাজনে পারস্পারিক প্রাধান্যই ধরা পড়ে। চরিত্রায়নের প্রাধান্যে চরিত্র-ধর্মী উপন্যাস আর গল্পায়নের প্রাধান্যে আখ্যান-প্রধান উপন্যাস গড়ে ওঠে। এ দু'ধারায় তাই বয়ে চলেচে প্রভাতকুমারী উপন্যাস।

এখানে যে সমাজ-চিত্র পাওয়া যায় তাতে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষই চোখে পড়ে। গণসাহিত্যের কোন পরিচয় নেই। গার্হস্থ্য চিত্রে উনিশ শতকী ভৌম আভিজাত্যই ফুটেচে। জমিদার, নায়েব গোমস্তাই অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেচে। তবে কচিৎ সাক্ষাৎ মেলে তথাকথিত সাধারণ মানুষেরও। কিন্তু তার চেহারা কেমন যেন ফিকে। সামন্ততন্ত্রের ভূত এখনো তার মাথায় ভর ক'রে আছে। এ দেখা যায়-সংস্কারের দুর্মরতায়। নারীর প্রগতি রুদ্ধ হয়েচে বিবাহ সংস্কারের অচলায়তনে: কেমন যেন ভূতেপাওয়া আবহাওয়া পেয়ে বসেচে সমাজকে। বর্ত্তমান ঘটনা দোরে ঘা' দিচ্চে বটে, কিন্তু মানস তাতে সচেতন হয় নি। এ লেখকও তাৎকালীন যুগ সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্য একদিকে যেমন সমাজের প্রতিফলন, অন্যদিকে শিল্পায়ন। তাই শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়েই প্রভাতকুমার "গল্প রচনায় হাত" দেন আর এর "প্রধান জিনিষ হইতেছে রস।" বলা বাহুল্য, এই প্রধান জিনিষের উপরই তিনি বেশি মনোনিবেশ করেচেন। তাই হাস্যরসের অবতারণা চোখে পড়ে। এরি জন্য সামাজিক চিত্র রসাল হয়েচে হাস্যরসিকতায়। তবে ছোটগল্পে যেমন হাস্যরসের বান ডেকেচে, উপন্যাসে তেমন নয়। তাঁর হাতে খুলেচে পাষণ্ডের চরিত্রায়ন, যেমন গদাই পাল, খগেন, সতীশ দত্ত, পলসাহেব। সাধারণ চরিত্রের চেয়ে অসাধারণের চিত্রণ একটু সহজ। এই সহজ পথেই এগিয়েচেন লেখক। এতে পরিচয় মেলে যেমন শক্তিমত্তার, তেমনি শক্তিহীনতারও। রবীন্দ্র-আওতায় লালিত হ'য়ে প্রভাত কুমার স্বকীয়তার যে ছিটেফোঁটা ছিটিয়েচেন তার জন্যে স্মরণীয়।

(৩) জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯)

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও জলধর সেন নেমেচেন গ্রামীনতায়, অন্ত্যজদের মধ্যে। এতে আছে সমাজের বিবর্ত্তনের ইতিহাস। একদিকে শহুরে চটকতায় এগিয়েচে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার সংস্কৃতি-বিলাস ঝল্‌সে উঠেচে রবির আলোয়, অন্যদিকে,

পল্লী চাষী-শ্রেণীর সুখ দুঃখ নিয়ে অন্য খাতে ব'য়ে চলেচে। শিক্ষিত ও আশিক্ষিত, শহর ও পল্লীর এ দুই রূপ এক হ'তে পারে নি। এতে সমাজের ছিন্নমূলের পরিচয়ই ফুটে উঠেচে। মধ্যবিত্তমান সে পল্লী দাগ কেটেচে বটে, তবে তাতে করুণার দিকটাই উদ্‌ঘাটিত হয়েচে। কাজেই পল্লীধারার বিকাশে স্মরণীয় জলধর সেন। ভ্রমণ কাহিনীতে ওস্তাদ হ'য়ে ইনি পরিচিত হয়েচেন ঔপন্যাসিক হিসেবে। নির্য্যাতিত, অবহেলিত মুসলমান সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েচেন তিনি তাঁর 'করিম সেখে' যেখানে চাষীর জীবনায়ন চিত্রিত হয়েচে। যে পল্লীপ্রীতিতে লেখক এগিয়েচেন এখানে, তাতে করিমের হিংস্রতাই ফুটেচে বেশি ক'রে। দুবমনের ভূমিকায় দেখা দিয়েচে করিম আর সে সেক্সপীয়রের ইয়াগোর মতো বসির ও তার স্ত্রীর মধ্যে এনেচে বিরহ। পাঁষণ্ডামির পরিণতি এসেচে বিষ প্রয়োগে আর এ কাজ করেচে করিম সেখ বসিরকে মেরে তার স্ত্রীকে পাবার জন্যে। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। বসির মরে নি, তার স্ত্রীও করিমকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। করিমের হ'লো রূপান্তর, সে হ'লো পাগল। পরে অবিশ্যি হয়েচে স্বামীস্ত্রীর মিলন আর তারা ভার নিয়েচে করিমের সেবার। এ গ্রামীনতা শহুরে চটকের চেয়ে বেশি প্রাণবান, বেশি দরদশীল। মনুষ্যত্বের দিক থেকে এ স্মরণীয়।

তারপর 'বিশু দাদায়' [১৯১১] প্রকাশ পেয়েচে প্রভুসর্বস্ব মহামতি ভৃত্যের কথা। সাধারণ মানুষের ভিতরে আছে সে-অসাধারণত্ব এখানে হয়েচে তারি বিকাশ। বস্তুত মানুষে-মানুষে যে তফাৎ দেখা যায়, তাতো সমাজেরই কীর্তি। আর এ হয়েচে বর্ণ ও বিত্তের মাধ্যমে। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ রাজা-প্রজা সম্পর্কেরই নামান্তর যা এসেচে বিশু মারফতে। লেখকের সামাজিক চোখে তাই এই অবহেলিত দিকটা ভাস্বর হয়েচে। এর পর আছে অভাগী, যার নামেই ফুটেচে হতভাগ্যের চেহারা। সবি কিন্তু সমাজ-নির্ভর। জলধর সেনের সমাজবৃত্তে তাই কেবল প্রকাশ পেয়েচে সমাজের উপেক্ষিতরা। এতে যে সমাজদর্শনের পরিচয় মেলে, তা বাস্তবায়নের পথ সুগম করেচে। আর এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়েচে ভাষার সাদাসিধে পোষাকে। এতে কবিত্বের স্ফুরণ না থাকলেও, আছে ঘরোয়া লোকভাষারই জয়জয়কার। এই লোকভাষার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এ কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছায়। এর কারণ এ ভাষা লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কাজেই জলধর সেন প্রগতির সাক্ষ্য দিয়েচেন অন্ত্যজ নায়ক নির্বাচনে ও লোকভাষা ব্যবহারে। দু'দিকেই তার সাহিত্য সাধনা চলেচে। ফলে শরৎ সাহিত্যের পথ প্রস্তুত হয়েচে। তাই পথিকৃৎএর সম্মান তাঁরি প্রাপ্য। অন্যদিকে অবিশ্যি তিনি নীতিবাদী। সাহিত্যের রসবোধের চেয়ে সামাজিক নীতিবোধই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েচে। এরি উদাহরণ হ'লো করিম শেখ, যে বিষ প্রয়োগের জন্যে পাগল হয়েচে। তবু জলধর সেন প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে।

(৪) ঐতিহাসিক ধারা

রবীন্দ্রপর্বে যেমন আছে রবির নতুনত্বের ঝলমলানি, তেমনি পুরণো প্রসিদ্ধির অচলায়তনও। উনিশ শতকী কয়েকটি বিশেষ ধারায় বিশশতকও এগিয়ে এসেচে। রূপ বহু হ'লেও তার রসের ধ্বনি এক। এ ধারাগুলি হ'লো ঐতিহাসিক, গোয়েন্দা ও গার্হস্থ্য। এদের জের চলেচে এ-পর্বেও। প্রথমেই ঐতিহাসিক ধারা। এর অনুবর্ত্তন চলেচে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙমহলে'। মোঘল হারেমের ছবি পরিস্ফুট হয়েচে এখানে। সেলিমার প্রেম ও ব্যর্থতা নিয়েই শোকান্তিকা গ'ড়ে উঠেচে। তারপর আছে 'পঞ্চপুষ্প' (১৯০২)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) লিপি-কুশলতায় এগিয়েচেন। ফলে তাঁর লেখা সুখপাঠ্য। ইতিহাস-পুরাণের যে জের চলেচে 'ভারত মহিলা' (১৮৮০), 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮২) ও 'কাঞ্চনমালায়' (১৯১৫) তা শৈল্পিক বিভূতি নিয়ে জেগে উঠেছে "বেণের মেয়ে"তে (১৯১৯)। এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েচে "দশম একাদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম অঞ্চলের আলেখ্য।" বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক এ উপন্যাস, যাতে "ঐতিহাসিক রস"ই মুখ্য হয়েচে। এখানে নেই কোন কল্পনার খেয়াল, কি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তা সত্ত্বেও এ ঘরোয়া কাঠামোয় ব'য়ে চলেচে গাল্পিকতা। গল্পায়নে তাই ভেসে উঠেচে কখনো বিহারীর স্ত্রীকন্যার বমিবমি ভাব, কখনো খেলাধূলা কখনো বা কবির লড়াই। সরহপাদ, বীণাপাদ প্রভৃতি এসে কবিতা পাঠ কচ্চেন সভাস্থলে। লেখক কিন্তু একে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অভিহিত করেন নি। তিনি এর নামকরণ করেচেন "সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই"। মোট কথা এখানে মিশেচে ইতিহাস ও সাহিত্যিক রসবোধ। তাই এ হয়েচে রসোত্তীর্ণ। ভাষা সরল ও সাবলীল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৮৪-১৯৩০] ঐতিহাসিক ব'লেই বেশি পরিচিত। কিন্তু ঔপন্যাসিকও তিনি! তাঁর 'পাষাণের কথা' (১৯১৪) আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেচে, যা স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথাকে'। পাষাণ জড় পদার্থ, কিন্তু সে উন্নীত হয়েচে চেতন স্তরে। তাই প্রাণনে সে কথা ক'য়ে উঠেচে। এ "প্রাচীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা।" 'শশাঙ্ক' (১৯১৪) উপন্যাসে বিচিত্র হয়েচে গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ, যেমন 'ধর্মপালে' (১৯১৫) পালপর্ব্বের গৌরবছবি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনপূর্ব ইতিহাস কথিত হয়েচে 'করুণায়' (১৯১৭)। তারপর আছে 'ময়ূখ' (১৯১৬) ও 'অসীম' (১৯১১), যা রচিত হয়েচে মোঘল যুগের পটভূমিকায়। গুপ্ত পাল যুগের ইতিকথা যেমন জীবন্ত হয়েচে তেমন হয়নি মোঘল আমলের কথা। ইতিহাসের শক্ত উপাদানকে গড়ে পিটে রূপ দিতে যে কালের ব্যবধানের দরকার, এখানে হয়েচে তারি অভাব। এ-ছাড়াও আছে ব্যক্তিক রুচিবোধ, যা কালিক নেশায় এগিয়ে চলে। রাখাল দাসের কৃতিত্ব এই যে তিনি ঐতিহাসিক ভিৎএর উপর খাড়া করেচেন রহস্যের ইমারৎ। ঐতিহাসিকতা এগোয় কখনো চরিত্রায়নে, কখনো পরিবেশচিত্রণে। রাখাল দাসে দুইই আছে।

তবে গোটা যুগচিত্রণের দিকে ঝোঁকটা যেন একটু বেশি। তাই সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত জীবন্ত হয়েছে। এছাড়া আছে স্কন্দগুপ্ত, যশোধবল প্রভৃতি। পুরণোর ভিতর লেখক জীবন সঞ্চার করেছেন। এ প্রচেষ্টার জন্যে তিনি উনিশ শতকী রমেশ দত্তের সঙ্গে তুলনীয়। লেখকের কিন্তু গল্পায়নের চেয়ে ঐতিহাসিকতার উপর নজর বেশি। এ কীর্তি সত্যি সুদুর্লভ।

(৫) গোয়েন্দাবৃত্ত

কল্পনার খেয়ালে চলে সাহিত্যায়ন। কখনো এ হয় বাস্তবানুগ, কখনো বা বাস্তবাতিগ। কৌতুকের চমক শেষেরটিতে লক্ষণীয়। অনেক উদ্ভট জিনিষও এতে স্থান পায়। তাই গড়ে উঠেচে গোয়েন্দা উপন্যাস। এর সুষ্ঠু প্রকাশ হয়েচে মার্কিন দেশে পো'র মারফতে। পরে এ-ধারার বাহক হয়েচেন কনানডয়েল. এডগার ওয়ালেস প্রভৃতি আরো অনেকে। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে আছে একটি সমস্যা, যার সমাধান আসে বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে। কেউ না কেউ এতে নিযুক্ত থাকে। তাই তার কাজের অনুবর্ত্তনে একটা ঔৎসুক্য জাগরূক থাকে বরাবরই। এর আছে ষড়ঙ্গ। প্রথম কাহিনী জট পাকিয়ে ওঠে একটি দুষ্ক্রিয়া নিয়ে; দ্বিতীয়, একজন আসামীর দিকে সাক্ষ্য প্রমান নির্দ্দেশ দেয়; তৃতীয়, আসামী আস্কারায় পুলিশের অসামর্থ্য; চতুর্থ, গোয়েন্দার অসাধারণ কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয়; পঞ্চম, সহ-গোয়েন্দার নিম্নস্তরের প্রতিভা; ষষ্ঠ, বাহ্য বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণের অপ্রাসঙ্গিকতা। মৌল উপাদানের উপায়ন কৌশলে আছে দু'টো ধারা। এক, রোমাঞ্চক, যেখানে শুধু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সমাবেশ থাকে; দুই, মাননিক, যেখানে প্রারম্ভিক ক্রিয়া পরিণতি পায় গোয়েন্দা-গিরিতে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা উপন্যাস এসেচে বটে, তবে এ হলো বিদেশী ধারার বাংলা সংস্করণ। এদিকে পাঁচকড়ি দে কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েচেন। এঁর "মায়াবিনী" (১৯২৮) রোমাঞ্চক ধারার প্রতীক। জুমেলিয়া হ'লো মায়াবিনী। তাকে ধর্ত্তে গলদ ঘর্ম হয়েচে গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়। শেষে কিন্তু জুমেলিয়া নিজেই নিজের বুকে কিরীচ ঢুকিয়ে মারা গেল। এর তিন খণ্ড হলো—(১) নারীনাগরী; (২) শঠেশাঠ্যং সমাচরেৎ; (৩) পিশাচীর প্রেম। এখানে ঘটনা শৈল্পিক সুষমা পায়নি। পাঁচকড়ির উপন্যাস হিন্দী, উর্দু, তেলেগু, তামিল, মারাঠী, গুজরাটী, সিংহলীয় ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়েচে। এতে বোঝা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা। লেখকের দেবেন্দ্র বিজয় Sherlock Holmes এর সঙ্গে তুলনীয়। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে "গোবিন্দরাম", "নীলবসনা সুন্দরী", "মৃত্যু বিভীষিকা", "ভীষণ প্রতিশোধ" উল্লেখযোগ্য। রোমাঞ্চক ধারায় এগিয়েচেন যতীন্দ্রনাথ পাল ও সুরেন্দ্রমোহন

ভট্টাচার্য। এঁরা রক্ষণশীলতায় গার্হস্থ চিত্র যেমন চিত্রিত করেছেন, তেমনি রহস্যসৃষ্টির প্রয়োজনও অনুভব করেছেন। ফলে প্রথমের "মুস্কিল আসান" ও দ্বিতীয়ের "ছিন্নমস্তার" জন্ম সম্ভব হয়েছে। নামেতেই বোঝা যায় যে, প্রথমটিতে আছে মুস্কিলের জট খোলার প্রয়াস আর দ্বিতীয়টিতে চাঞ্চল্যের রহস্য। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, কি আঙ্গিকের নতুনত্বে, এরা তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। তাই পাঁচকড়ির পরে নাম কর্তে হয় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের [১৮৬৯-১৯৪৩]। এঁর সাহিত্যিক কীর্ত্তি সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষত তাঁর "রহস্য লহরী সিরিজ"। রোমাঞ্চক উপন্যাস রচনায় তিনি ওস্তাদ কারিগর। চীনদেশের পটভূমিতে লেখা "চীনের ড্রাগন" খুবই জনপ্রিয়। চীনা হীরক ড্রাগন মাঞ্চুরাজবংশের স্থায়িত্বের প্রতীক। ১৮৯০ খৃঃ এ খোয়া যায় আর স্থানান্তরিত হ'লো সানফ্রানসিস্কোতে, তারপর মেলবোর্ণে। চুরি হয়েছে, চোর আবিষ্কারে রবার্ট ব্লেক ও তার সহায়ক স্মিথ্‌ গোয়েন্দাগিরি করেছে। ক্লাইমাক্সের বিচারে কারাদণ্ড হ'লো। গল্পায়নের প্রবাহ চলেছে, কৌতূহল কিছুতেই আসতে চায় না। এ-ছাড়া আছে "প্রেতপুরী," "রহস্যের খাসমহল", "সোনার পাহাড়" প্রভৃতি। রহস্য কথনেই দীনেন্দ্রকুমারের বৈশিষ্ট্য। তবে গোয়েন্দাগিরির আবিষ্কার তেমন ফোটেনি। বেশিরভাগই পরিকল্পিত হয়েছে বিদেশি গল্পের ভিত্তিতে, যেমন "নদীতটে নরহত্যা"। এ রহস্য লহরী পর্যায়ের বই, যার উপজীব্য হ'লো ট্রেভর-এঞ্জোলোর মিলন। এর সহায়ক যেমন মিঃ প্রীড, তেমনি দুষমন হ'লো সর্দার।

পাঁচকড়িদে'র শিষ্য হিসেবে যিনি এ-কাজে এগিয়েছেন, তিনি হ'লেন হেমেন্দ্র কুমার রায় (১৮৮৮-), যার রোমাঞ্চক কাহিনীও উল্লেখযোগ্য। এঁর "উপন্যাস সংগ্রহে" [১৯০৯] রহস্যের আভাস আছে। তারপর "কালবৈশাখী"র বিনোদ দুষমনের ছাঁচে ঢালা। হেমেন্দ্রকুমার সত্যিকার গোয়েন্দা গল্প লিখতে পারেন নি। যা এসেছে তার জন্যে দায়ী তাঁর কল্পনার খেয়ালীপনা। সাধারণ গল্পে হ'য়েছে রহস্যের রুপোলি আবির্ভাব। এরপরে গোয়েন্দাবৃত্ত বাঁক নিয়েছে উপন্যাস ছেড়ে গল্পেরদিকে। বস্তুত বৃহৎ উপন্যাস যে নেই, তা নয়। তবে এতে উদ্ভট কল্পনার বিকাশই লক্ষণীয়। সত্যিকার গোয়েন্দাগিরি এখানে ফিকে হয়েছে। কিন্তু ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে এ বেশ উৎরেছে। শুধু তাই নয়, এর উপর পড়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোও। মোট কথা, গোয়েন্দাবৃত্ত আধুনিক পরিবেশে বাঁচিয়ে রেখেছে কল্পনার প্রাণরস। তাই নতুন নতুন অভিযানে আনন্দ পেয়েছে যন্ত্রপিষ্ট আধুনিক মানুষ। এর মারফতে এসেছে মুক্তি। তাই এ উল্লেখযোগ্য।'

(৬) গার্হস্থ্য চিত্র

ঐতিহাসিক, গোয়েন্দাধারার পরে উল্লেখযোগ্য হ'লো গার্হস্থ্যচিত্রণ। এ প্রকট হয়েছে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখনে। প্রথমের

"বিনিময়" সুখপাঠ্য। মনে হয় এ পরিকল্পিত হয়েচে তারকনাথের "স্বর্ণলতার" ছাঁচে। তার পর আছে "মিলনমন্দির" ও "স্বর্ণকুটির"। "বাসরে মিলন" আত্মজৈব-নিক পদ্ধতিতে লেখা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখানই এর উদ্দেশ্য। সন্ধ্যাকে প্রেতলোকে পাঠিয়েচেন লেখক, যেহেতু তার অনুরক্তি ছিলো পরপুরুষে। তাই তো দান্তের 'ইনফার্নো' নেমে এসেচে নায়ক-নায়িকার কাছে। নীতিবাদই জয়ী হয়েচে হৃদয়াবেগের চেয়ে। নারায়ণের "মণির বর" বেশ ঝরঝরে লেখা। এতে ফুটেচে সমাজজীবন। "ঘর জামাই", "অভিমান" এবং "দাদা মহাশয়"ও নামকরা বই গার্হস্থ্য চিত্রণে। যতীন্দ্রমোহন সিংহের "উড়িষ্যার চিত্র" (১৯০৩) বেশি পরিচিত আর "ধ্রুবতারা" এক হিসেবে নবযুগের অগ্রদূত। এখানে বিয়ে-এড়ানো প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েচে মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে। রক্ষণশীলতার প্রতীক হিসেবে এর "সন্ধি"ও (১৯৩৪) স্মরণীয়। চিত্রণ খুবই স্বাভাবিক। কিশোর নীহারিকার বিয়েই হ'লো এ উপন্যাসের উপজীব্য। এখানে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায়, তা গোঁড়া-মির রঙে রাঙা। সমাজের অগ্রগতির কোন সাক্ষ্য নেই। কেমন যেন নীতি-বাদের জগদ্দলে চাপা পড়েচে মানুষ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। ফলে গতানুগতিকতার বৃত্তায়ন চলেচে। এতেই রবীন্দ্রপর্ব শেষ হয়েচে।

শরৎপর্ব (১৯১৭-২৯)

ভাবের বিকাশধারাকে সন তারিখের পেরেক ঠুকে আটকান যায় না। কখনো ব্যক্তির নামাঙ্কে দেওয়া হয় এর পরিচয় কখনো বা তারিখের নিশানায়। এতে পাওয়া যায় শুধু ইঙ্গিত, গোটা ভাবের স্বরূপ ফোটে না। তা হ'লেও পরিচায়ক স্তম্ভ হিসেবে নেওয়া হয় ব্যক্তি বা তারিখকে। এ-ভাবে রবীন্দ্রনাথকে ধরা হয়েচে রসিক মানুষের প্রতীক, সেখানে সব কিছুই নান্দনিক। কিন্তু এ-ছাড়া সেখানে আছে অনেক স্তর, আর বিন্যাস ফুটেচে বিভিন্ন লেখনীতে। এতে বঙ্কিমী আদর্শায়ন মিলেচে রাবীন্দ্রিক নন্দনায়নে। ফলে বস্তুর হয়েচে রূপান্তর। শরৎচন্দ্রে বাস্তবায়নের ধারা হয়েচে দুর্মর। বন্যা এসেচে বস্তুর আক্রমণে যা ভেঙে পড়েচে প্রেমিক মানুষের অভ্যুদয়ে। তাই রবীন্দ্রপর্বের আয়ুষ্কাল মোটা-মুটি (১৯০১-১৯১৬)। ১৯১৬তে রবীন্দ্রনাথের বিকাশ এক উত্তুঙ্গ বিন্দুতে উঠেচে। "ঘরে বাইরে" ও "চতুরঙ্গ" এর প্রমাণ। এখানে রসিক মানুষ রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিক সমস্যার প্রান্তিকে ভেসে উঠেচে। এর পর তিনি উপন্যাসও লিখেচেন বটে, তবে সেগুলি এরি রকমফের। শরৎপর্ব এসেচে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে, যখন তাঁর "দেবদাস" ও "চরিত্রহীন" প্রকাশিত হ'লো ১৯১৭ তে। এ-সময়ে "দত্তা" ও "শ্রীকান্ত" এসেচে। এখানে দেখা গেলো সমাজের চেয়ে ব্যক্তির মহিমা বড়ো।

এই পার্থক্যের মূলে আছে অবিমিশ্র মানুষী প্রেম, যা শরীর ও হৃদয়ের যৌথ ডানায় উড়ে চলে। যোগী ও তান্ত্রিকের মধ্যে যে বিভেদ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রেরও তাই। যোগ-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের পথ হয়েচে অবতরণের, যা আদর্শকে মাটির ধরায় নামিয়েচে। এতে বস্তুও হয়েচে রূপান্তরিত। তইতো "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে, পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে"। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের দৃষ্টি তান্ত্রিকের। এখানে বস্তু উন্নীত হয়েচে অনুভূতির স্তরে, যেখানে জীবনায়ন তীব্রতায় বস্তুর জ্বালাই প্রকাশ করেচে। এ পথ আরোহের, উন্নয়নের। এ প্রেমিকের আখ্যান তাই ব'য়ে চলেচে ১৯১৭ থেকে ১৯২৯তে। এর পরেও চলেচে এধারা। তবে এতে আছে শুধু অনুবর্তন। তাই মৌলিকতার অভাববোধই সূচিত হয় এখানে। শরৎপর্বে পুরোনো প্রসিদ্ধির জেরও চলেচে। কাজেই সব মিলে জুলে এর বৈশিষ্ট্য এনেচে।

(১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

পৃথিবীর ইতিহাসে উপন্যাসের পরিক্রমা হয়েচে অবতরণে। উঁচু থেকে নিচের দিকে চলেছে এ অগ্রগতি। আদর্শ তাই বাস্তবে পেয়েচে তার পরিণতির অর্ঘ। বিশ্বগ এই চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আছে নাড়ীর যোগ। তার সাহিত্যায়নে কয়েকটি বিশেষ বাঁকের পরিচয় মেলে বঙ্কিমচন্দ্রে, রবীন্দ্রনাথে ও শরৎচন্দ্রে। এঁরা হ'লেন নৈতিক, রসিক ও প্রেমিক মানুষের স্থিরকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েচেন ঋষির পথ, যা যোগদৃষ্টিতে উপর থেকে নিচে নামে। আর শরৎচন্দ্র পরিচয় দিয়েচেন এর উল্টো পথের। এ হ'লো মুনির পথ; পিপীলিকামার্গ যা উপরে উঠ্‌চে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষীমার্গ থেকে এ তাই স্বভাবতই দূরে। কিন্তু যেভাবে শরৎচন্দ্র এগিয়েচেন বাস্তবায়নে, তাতেও ফুটে উটেচে এক রকম আদর্শায়ন, যা বস্তুচর্য্যার শ্রেষ্ঠফল। তাই রবিচ্ছটার মধ্যাহ্নে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব একটু আকস্মিক। তা হ'লেও এ অস্বাভাবিক নয়। যেখানে রবীন্দ্র-নাথ বস্তুবিশ্ব ছেড়ে উড়েচেন বলাকার ডানায়, সেখানে শরৎচন্দ্র ঢুকেচেন বস্তুর কর্মশালায়। এরি পরিচায়ক হ'লো "শেষের কবিতা" ও "শেষ প্রশ্ন"। প্রথমের লাবণ্য যোগীর ধ্যানলব্ধ সৃষ্টি, যে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্বের সমাধান পেয়েচে অমিতকে ছেড়ে, শোভনলালকে গ্রহণ ক'রে। সমস্যার বাস্তব সমাধান এ'তো সহজ নয়। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের কমল তান্ত্রিক কন্যা, যে এগিয়েচে প্রাণনের গতিতে। কাজেই এ-গতিবাদে সত্য শুধু চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি আর চলে-যাওয়ার ছন্দটুকু। এখানে প্রাণনের elan vital যেন কথা কইচে কমলের মুখে। এও এক রকমের আদর্শবাদ যা ভেঙে দিয়েচে বিবাহসংস্কার আর এনেচে যৌনতার বিকাশ।

কিন্তু লাবণ্যর কাব্যায়নের চেয়ে এ বিদ্রোহী। তাই যেখানে লাবণ্যের সমাধান দৈবায়নেরই নামান্তর, সেখানে কমলের প্রাণন জীবনেরই অঙ্গীকার।

শরৎচন্দ্রের মানসবিবর্তন কিন্তু এগিয়েচে আদর্শ থেকে বাস্তবে। যে জীবন কল্পনার খেয়ালে রহস্যের তুঙ্গশিখরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তা ক্রমে ক্রমে এলো বস্তুর কন্দরেও। এই অবতরণে কাজ করেচে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ এই বাস্তব-সচেতনতাই দিয়েচে তাঁর প্রতিভাকে জয়মাল্য। কাজেই তাঁর উপন্যাসকে চারভাগে ভাগ করা যায়—রহস্যরূপোলি, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমস্যা-প্রধান। এ হ'লো মানসবিকাশের দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস।

প্রথমেই চোখে পড়ে লেখকের খেয়ালী কল্পনার স্বচ্ছ বিহার। এর এক একটি বিমানঘাঁটি হ'লো 'শুভদা' [১৮৯৮], 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'দেবদাস' [১৯১৭], "দত্তা" [১৯১৭] ও 'পথের দাবী' [১৯২২—১৯২৪]। 'শুভদা' এক করুণ রসের ভিয়ান। পাতিব্রত্যের আদর্শই এর উপজীব্য।

রহস্যরূপোলি

হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামিই অনুসৃত হয়েচে এখানে। 'বড়দিদি'র ভিৎ হ'লো সুরেন ও মাধবীর আকর্ষণ, যার মূলে আছে স্নেহ ও প্রেমের দ্বৈতলীলা। স্নেহ কি ক'রে বৈধব্যের বাঁধ ভেঙে প্রেমে পরিণতি পায়, এখানে আছে তারি পরিচয়। এর পরে কারুণ্য উপচে পড়েচে 'দেবদাসে'। পার্বতী দেবদাসের সম্পর্কে ফুটেচে এক বিবর্তনের ইতিহাস। পার্বতী দেবদাসের বাল্যকালের বন্ধু, যে হয়েচে যৌবন কালের মালাও। দুহু দোঁহা কাঁদে দু'য়েরি বিচ্ছেদে। তাই লেখকও বিচলিত হয়েচেন। এ হৃদয়াবেগ শিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে গেচে যখন তিনি প্রার্থনা জানিয়েচেন দেবদাসের উদ্দেশে: "মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে [দেবদাসের মত হতভাগ্য] মরিতে পারে।" নিয়তিবাদ এখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে যা স্মরণ করিয়ে দেয় টমাস হার্ডির "টেস"কে। এ নৈতিকতা শিল্পের দরজায় আঘাত করে। তারপর 'দত্তা' পরিকল্পিত হয়েচে খানিকটা 'Charles Garnice এর Leola Dales' Fortune এর আদর্শে। তাহ'লেও এতে আছে 'স্থানিক রঙে'র ঝলমলানি। প্রেমের পূর্ণতা বিবাহে, যেখানে হৃদয় শারীর হয়। নরেন্দ্র-বিজয়ার সম্পর্কে এ-তত্ত্বই ফুটে উঠেচে। এর পর আদর্শায়ন এলো রাজনীতির ডানায়। 'পথের দাবী' তাই বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র স-গোত্রীয়। এ প্রচারধর্মী, তবে উৎকর্ষের দিক থেকে একটু নীচু স্তরের। এর সব্যসাচীর চরিত্র সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অনুপ্রাণিত করেচে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অধিনায়ক সূর্য্য সেনকে। এতে বোঝা যায় প্রচারের সক্রিয়তা। বিপ্লবের ঢেউ অবিশ্রি ভেঙে পড়েচে অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে। যৌনসম্পর্কেই বিপ্লব দানা বেঁধে উঠতে পারে। এ হ'লো ভিত্তি।

এর পর সামাজিক পর্ব আরম্ভ হয়েচে 'বিরাজ বৌভে' [১৯১৪]। নারী

পীড়নের ইতিহাসে এ এক নবযুগের সূচনা করেচে। সমাজই এর জন্যে দায়ী। তাই শরৎচন্দ্র বলেচেন: "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে"। এখানে আছে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। নারীর দুঃখটাকে ফলাও ক'রে দেখানোতে এসেচে আদর্শায়ন, যা অনুভূতির রসে নিবিড় হয়েচে। মুখ্য পাত্রের মৃত্যুতে কাহিনীর জট খুলেচে আর এসেচে করুণ রসের বান। 'পল্লীসমাজ' [১৯১৬] নিজের রূপে দাঁড়িয়ে আছে। সে হ'লো দলাদলি, হিংসা দ্বেষের মূর্ত্ত প্রতীক। রমা ও রমেশের প্রেমকাহিনী আবর্ত্তিত হয়েচে বিশেশ্বরীকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু সর্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়েচে সমাজ, যার আবর্ত্তে নায়ক-নায়িকার প্রাণনের হয়েচে নতুন নতুন পরিণতি। 'চন্দ্রনাথে' (১৯১৬) সরযূর পুনর্গ্রহণে নতুনত্বের কোন পরিচয় নেই। এখানে গতানুগতিকতাই চোখে পড়ে। মণিশঙ্কর কতকটা অনুঘটকের কাজ করেচে। 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) কৌলিণ্য প্রথাকে কেন্দ্র ক'রে ব'য়ে চলেচে। প্রথার প্রসিদ্ধির অনুসরণে সমাজ ব্যবস্থা খান-খান হতে চলেচে। এ দিকে লেখক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেচেন। এ সব উপন্যাসে সমাজকে তীব্র কশাঘাতে চেতিয়ে তোলার চেষ্টা করেচেন শরৎচন্দ্র, যদিও সমাজ সংস্কারের তীব্রতা তেমন নেই, তবুও একটা অস্বস্তির ভাব মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, যাতে সমাজ-বিদ্রোহ জেগেচে। এ হ'লো করুণ রসের উল্টো পিঠ। ফলে নাট্যকার Galsworthy র সঙ্গে লেখক তুলিত হতে পারেন। তাঁর নাটক Justice আর লেখকের উপন্যাসে একই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েচে, যদিও বিষয় ও পট আলাদা।

সামাজিক

বাহ্য ঘটনার অন্দরমহলে প্রবেশের যে প্রচেষ্টা তা ধরা পড়েচে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ঘটনার আছে অন্তর ও বাহ্য। এখানে কিন্তু মৌন বিশ্লেষণে এগিয়েচেন লেখক মনের গহনে। তাই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেচে চরিত্রচিত্রণ। 'পণ্ডিতমশাই'এ (১৯১৪) কুসুম ও বৃন্দাবনের মানস-সংঘাতই রূপায়িত হয়েচে। ঐতিহ্য ও বিপ্লব নিয়ে সমস্যার অবতারণা হয়েচে। তাই কুসুম সংস্কার বশে বরদাস্ত করতে পারেনি বিধবা-বিবাহ, যেমন বৃন্দাবন মায়ের অপমান। 'দেনা পাওনা'য় (১৯২৩) স্বামীর লাম্পট্য জীবনে পরিবর্ত্তন এসেচে স্ত্রী ভৈরবীর সংস্পর্শে। এখানে ষোড়শী যেন স্পর্শমণির কাজ করেচে। ভৈরবী জীবনের শূন্যতার মধ্যে যে ভোগলিপ্সা লুকিয়ে আছে, তার স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হয়েচে এখানে। একদিকে স্বামীর অত্যাচার, অন্যদিকে স্ত্রীর সহনশীলতা, এ দুয়ের চিত্রণে ফুটেচে দরদী মনের বিহ্বলতা। পরনিগ্রহিক উল্লাস বাধা পেয়েচে আত্মনিগ্রহের বাঁধে। এই দ্বৈতলীলায় তাই ধরা পড়েচে Sadism ও Masochism, যার ভিত্তি হ'লো মানসিক। "নববিধানের" (১৯২৪) নামেই প্রাণনের এক অধ্যায় সূচিত হয়েচে। "বিপ্রদাসে" [১৯৩৪] বন্দনার হৃদয়দোলায় দোল খেয়েচে সুধীর, অশোক, বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস। মনের দিক থেকে

মনস্তাত্ত্বিক

মুখুজ্যে পরিবারের আচার নিষ্ঠাকে সে সমর্থন করে না, কিন্তু প্রাণের দিক থেকে একে আশ্রয় দিয়েচে। শেষকালে কিন্তু দ্বিজদাসই হয়েচে বন্দনা-হৃদয়ের বাসিন্দা। আর দ্বিপ্রদাস রইল নিঃসঙ্গতার প্রান্তরে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তাই বেশি ক'রে ফুটে উঠেচে। এ-ছাড়া সংস্কার এবং নবায়নের সংঘাতও রূপ পেয়েচে মনোরাজ্যে। এ সব উপন্যাস মনস্তাত্ত্বিক। সমাজ জুগিয়েচে এদের উপাদান তাই এরা সামাজিকও বটে। কিন্তু 'সামাজিক' কথাটির একটা মৌল অর্থ আছে শরৎচন্দ্রে। যে সব উপন্যাসের উপজীব্য হ'লো সমাজকে ঘা দেওয়া, তারাই শুধু 'সামাজিক' পদবাচ্য। এখানে সমাজ এক নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েচে। এ জীবন্ত।

সমস্যা-প্রধান

সমাজ ও মানসের সমস্যা রূপায়িত হয়েচে যে সব উপন্যাসে তার নাম 'সমস্যা-প্রধান' দেওয়া যেতে পারে। সামাজিক সংস্কারের পটে ব্যক্তি-মানস যেভাবে আবর্তিত হয়েচে প্রাণের লীলায় তারি পরিচিতি বহন কচ্চে এরা। শরৎচন্দ্রের তান্ত্রিক সাধনায় প্রতিভাত হয়েচে প্রাণনের রূপরূপান্তর, যা এক একটি নারী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েচে। 'শ্রীকান্ত' [১ম খণ্ড, ১৯১৬ ; ২য় খণ্ড—১৯১৮ ; ৩য় খণ্ড—১৯২৭ ; ৪র্থ খণ্ড—১৯৩৩] আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লেখা। এখানে লিখিয়ে নিজেই একটি চরিত্র, যে প্রবক্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। এর ভবঘুরেমিতে করুণার যে আত্মভোলা রূপ ফুটেচে, তাতে স্নেহের অশ্রু-সজলতাই বেশি ক'রে চোখে পড়ে। প্রাণের রূপ প্রকাশ পেয়েচে রাজলক্ষ্মী, অভয়া, অন্নদাদি ও কমললতায়। অন্নদাদি ও রাজলক্ষ্মীর জীবন নারীত্বের দিক থেকে ব্যর্থ হ'য়েচে সমাজের নিষ্ঠুরতায়। এরা কিন্তু এ দণ্ড গ্রহণ করেচে কারুণ্যে, যাতে এসেচে শুচিতা। এখানে জীবনের হয়েচে উদগতি। এরা তাই Masochism বা আত্মনিগ্রহের মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু অভয়া ভিন্ন ধরণের। সে সমাজকে সহ্য কর্তে পারে না—দরকার হ'লে স্বামীকে ত্যাগ কর্তেও কুণ্ঠা নেই তার। তাইতো বিদ্রোহবহ্নি জ্বলেচে তার উক্তিতে : "আমার নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না।" এর পর প্রেমের নতুন প্রবাহ এসেচে বৈষ্ণব পরকীয়াতত্ত্বে আর এ ফুটেচে কমললতার মাধ্যমে। এ-ছাড়া "শ্রীকান্তে" আছে নরনারীর যৌনসম্পর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন। কমললতা করেচে এর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ। সে বলেচে পুরুষকে সম্বোধন ক'রে—"তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা, তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। ভালবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না।" এখানে সন্ধান মেলে জীবনজিজ্ঞাসার। এ-ছাড়া ভয়ানক রসের ভিয়ান হিসেবে স্মরণীয় সাইক্লোন-বর্ণনা ও হাস্যরস পরিবেশক নতুনদা'র কাহিনী।

নিষিদ্ধ প্রেম আর এক ধাপ এগিয়েচে "চরিত্রহীনে" (১৯১৭)। মানুষ দৈব ও সমাজের যুক্তসৃষ্টি, যার এক প্রান্তে ব্যক্তি, অন্যপ্রান্তে সমষ্টি। এর এক কোটিতে প্রাণন, অন্য কোটিতে মনন। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গিরও রকমফের আছে। তাই সমাজের চরিত্রহীন, প্রাণনের চরিত্রহীন নয়। এখানে প্রকাশ্যে আক্রমণ চলেচে সমাজ ব্যবস্থার।

বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেচে 'চরিত্রে'র ধারা। এ বিচারে "মাতৃস্নেহও অসীম নহে"। প্রেম ও রূপের স্বরূপ বিশ্লেষণে কিরণময়ীর বাণী স্মরণীয়। তার মতে "সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার [মানুষের] রূপ যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম"। জৈব নিকষে তাই দেখা যায় যৌবনের আগে ও পরে কোন রূপ নেই। কিরণময়ী বিপ্লবী হয়েচে, পাগল হয়েচে সমাজের চাপে, যৌন ক্ষুধার তাড়নে। তার জীবনে জিজ্ঞাসা তাই ভেঙে পড়েচে কবির ভাষায—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।

আখ্যানের দিক থেকে আছে দু'টো ধারা—উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী ত্রিভুজ ও সতীশ-সাবিত্রীর প্রেমলীলা। ফ্রয়েডীয় উন্নয়নে সাবিত্রী উদ্গতির পথে এগিয়েচে, যেমন কিরণময়ী অচৈতন্যের মরুপ্রান্তরে। মন ও প্রাণের সমস্যার এখানে তাই পরিচয় মেলে। এ যুগান্তকারী।

এ-ধারার তৃতীয় উপন্যাস হ'লো "গৃহদাহ" (১৯২০)। সুরেশ-মহিম-অচলা ত্রিভুজে যে প্রেমচক্র আঁকা আছে, তাতে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্বের টানই বেশি ক'রে চোখে পড়ে। নারী সম্বন্ধে সেক্সপীয়র ও বার্ণাডশ' বলেচেন, তার আছে দু'টো সত্তা, যার জন্য সে চায় রবিবাসরীয় সঙ্গী ও কর্মবাসরীয় স্বামী। এক কথায় তার কাম্য ঘড়ার জল ও সমুদ্র-বারি। এখানে অচলা চলেচে সুরেশ ও মহিমের দিকে। তার একদিকে পরকীয়া, অন্যদিকে স্বকীয়া। বিবাহও প্রেম তাই মূর্ত্ত হয়েচে মহিম ও সুরেশে। এর পর "শেষপ্রশ্নে" (১৯৩১) শরৎচন্দ্র এক প্রশ্নচিহ্ন এঁকেচেন নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে। কমল হ'লো তাঁর ধ্যানোদ্ভবা তান্ত্রিক সৃষ্টি। আরোহের উদ্গতিতে বস্তুবিশ্ব দীর্ণ হ'য়ে জন্ম দিয়েচে প্রাণনের লীলাকে। এ জীবনটাকে শুধু বাজিয়ে যেতে চায়। ক্ষণিকবাদের সমর্থক হিসেবে কমল চিত্রিত হয়েচে। সে প্রাণনের নগ্নলীলা—যে রক্তমাংসের দেহে আবদ্ধ থাকতে চায় না। পথ চলাতেই এর আনন্দ। তাই শিবনাথ, অজিত হ'লো তার চলার সহযাত্রী। এও এক রকমের তান্ত্রিক উপভোগ, যাতে প্রকট হয়েচে প্রেমের লীলা। জীবনজিজ্ঞাসার প্রান্তিকে এসেচে "শেষের পরিচয়" (১৯৩৯)। লেখক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের "রাখাল এ প্রশ্নে নীরবে বাহির হইয়া গেল" পর্যন্ত লিখেচেন আর বাকীটা শেষ করেচেন রাধারাণী দেবী। ঘটনা চলেচে সবিতাকে কেন্দ্র ক'রে। সে ত্যাগ করেচে স্বামী, মেয়ে রেণু, গৃহদেবতা ও কুলবধূর মর্যাদাকে। পরপুরুষ রমণী বাবুর সঙ্গে তেরো বছর ঘর করার পরেও সবিতা পদস্খলনের কোন কারণ খুঁজে পায়নি। জীবনে দেখা দিয়েচে রহস্য-রূপোলি। আণবিক লীলাই দুর্মর এখানে। বস্তুত প্রাণনের স্বরূপই এই—সে সর্ব্বদাই চঞ্চল। সবিতা তাই বলেচে সারদাকে "পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়"। সত্যি প্রাণন অন্ধ, তার

নেই কোন চোখ। সবিতা তাই তুলনীয় Ibsenএর Noraর সঙ্গে। এখানে প্রাণের "অকারণ, অবারণ চলা" চলেচে। প্রাণন তাই এক অজ্ঞেয়তাবাদে পৌঁছুল শরৎচন্দ্রের তান্ত্রিক সাধনার প্রান্তে।

সমাজচিত্র

শরৎসাহিত্যে সমাজের ভাঙনই চোখে পড়ে। মধ্যবিত্ত যে সমাজ-ব্যবস্থায় এগিয়েছিল, এখানে তার ভিৎ খসে পড়েচে। তাই বিবাহের চেয়ে বড়ো যে প্রেম তারি জয়জয়কার হয়েচে। রাষ্ট্র-বর্ণ-বিত্তের কাঠামোয় সত্যিকার চিড় ধরেচে যার ফাঁকে কৌলিন্যপ্রথা ও নারীত্বের নির্যাতনের স্বরূপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তন চাই, তাই প্রকট হয়েচে। সমাজের অসুস্থতাই চোখে পড়ে। বহু আগেই শোপেনহাওয়ার বলেচেন যে, নারী নির্যাতনেই জীবনের ঋণ শোধ করে, কর্ম-আচরণে নয়। এ বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েচে শরৎচন্দ্রে। নিজের জীবন দিয়ে দুঃখের উপলব্ধিতে আছে তীব্রতা, যাতে বিদ্রোহ কান্না ধরে। বিপ্লব তাই অবশ্যম্ভাবী। দ্বান্দ্বিক জড়বাদে তাই বাংলায়, তথা ভারতে এসেচে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা। আজ "রাও সমিতির" যে সুপারিশ হয়েচে বিবাহ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যে, তাও পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণী। এ প্রসঙ্গে তিনি ইংলেণ্ডের ডিকেন্সের ও রাশিয়ার গোর্কীর সগোত্রীয়। শরৎচন্দ্র শহরের চেয়ে পল্লীর চিত্রই বেশি এঁকেচেন। এ চিত্রণে জোলা, পতিতা যেমন স্থান পেয়েচে, তেমনি জমিদার শ্রেণীও। তবে বাস্তবায়নের দিকে তাঁর ঝোঁক স্বভাবতই একটু বেশি। তাই উচ্চমধ্য-বিত্তের চেয়ে নিম্ন মধ্য-বিত্তের চেহারাই বেশি ফুটেচে। এ-ছাড়াও আছে অন্ত্যজদের চিত্রণ। এখানে তিনি 'বাবুসংস্কৃতি'র বাইরে এসে পড়েচেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাই তিনি প্রগতিশীল।

বৈশিষ্ট্য

শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হ'লো বাঙালীয়ানায়, যা দরদের স্পর্শে এগিয়ে এসেচে নারী-বিদ্রোহে। সতীত্ব নারীত্বের সামাজিক রূপ, যেমন চরিত্র ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রিত রূপ। কাজেই নারীত্ব সতীত্বের চেয়ে ব্যাপকতর। তিনি বলেচেন: "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়জ্ঞান করাকেই কুসংস্কার মনে করি।" এখানে বিদ্রোহ এসেচে অনিবার্যভাবে। কিন্তু এ-বিদ্রোহও সমাজ ও সাহসিকতার সঙ্গে বোঝাপড়া। বিদ্রোহের ঝঙ্কার আছে, কিন্তু রূপ নেই। অর্থাৎ এখানে সমাজকে আঘাত করা হয়েচে, অথচ তার ঐতিহ্যকে ব'য়েও নেওয়া হয়েচে। তাই অন্নদাদি ঘর ছাড়লো বটে, তবে মুসলমান সাপুড়ে হ'লেও স্বামীর সঙ্গে। জীবানন্দ চণ্ডীগড়ের ভৈরবীকে ঘরে পুরেচে, কিন্তু এ ভৈরবী তার স্ত্রী। অচলা সুরেশের সঙ্গে বেরিয়ে গেচে কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে। দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ী রেঙ্গুনের জাহাজে উঠেচে আর করেচে অঙ্গভঙ্গি যৌনবিকারে। এ হ'লো পাগলামির মত্ততা। সবিতা স্বামীকে ছেড়েচে, তবে আচমকা, আকস্মিক টানে। তাই সমাজ ও বিদ্রোহ এক

আপোষের দিকে মন দিয়েচে। কিন্তু সমাজসংস্কার থাকলেও, শরৎচন্দ্র সাক্ষাৎ-ভাবে এদিকে এগোন নি। তিনি হ'লেন গল্প-লেখক যার "বইয়ের মধ্যে মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, কিন্তু সমাধান নেই।" তাই চরিত্রগুলি লেখকের দরদের রক্তমাংসে সজীব হয়েচে।

নির্যাতিত নারীত্বের জয়গানে শরৎসাহিত্য মুখর ব'লে দুর্নীতির প্রশ্ন এসেচে সমাজের তরফ থেকে। ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েনে শরৎচন্দ্র দিয়েচেন ব্যক্তিকে অর্ঘ। তাই তো "সমাজের ধিক্কার ধিক্কার নীতি শাসনের"। কিন্তু শিল্পায়নে নীতির প্রাধান্য তো তেমন স্বীকৃতি পায়নি। সমাজের চিত্রকে আনন্দলোকে পৌঁছে দিয়ে তবেই তার খালাস। এখানে শরৎচন্দ্র রুশ সাহিত্যিকের সম পর্যায়ে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় রসতত্ত্ব এ সাহিত্য থেকে বাদ যায় নি। এরি মারফতে শরৎ সাহিত্য হ'য়েচে বাঙ্গালীয়ানায় স্পন্দমান। এর সাক্ষ্য মেলে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে, যা "ডুব দিয়েচে বাঙ্গালীর হৃদয়-রহস্যে।......বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেচে। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।" এই প্রীতির জন্যেই বাঙ্গালী দিয়েচে তার ভালবাসার অর্ঘ। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—

দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

(২) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৩—)

শরৎচন্দ্রের মাতুলবংশীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণীয়। সুরেন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য যোগ" চিন্তনের মাত্রাধিক্যে কিছুটা আধুনিক হ'লেও এ তেমন অগ্রসর নয়। এ সম্মান তাই প্রাপ্য উপেন্দ্রনাথের। সমাজের ছাপ আঁকা হয়েচে তাঁর "রাজপথে"। দেশের অবস্থা এখানে কিছুটা ধরা পড়েচে লিপিকুশলতায়। এ হ'লো অসহযোগের পট-ভূমিকায় আঁকা ছবি। রাজনীতি কেমন করে মনের গহনে এসে মানসিক রূপান্তর আনে, এ তারি পরিচায়ক। সুমিত্রা সুরেশ্বর ও মাধবী-বিমানের জোড়া কাহিনী আবর্তিত হয়েচে ঘটনা-প্রবাহে। নারীপ্রেম ও স্বদেশীয়ানার দ্বৈত লীলায় দ্বিধা খণ্ডিত হয়েচে সুরেশ্বর। বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বের রূপায়ন হিসেবে সুরেশ্বর তাই স্মরণীয়। রাজনীতির দ্বৈতরূপও প্রতিভাত হয়েচে দূরের নৈকট্যায়নে ও নিকটের দূরায়নে। দুইজোড়া ঘটনা নিয়ে গ'ড়ে উঠেচে "শশিনাথ।" একগুচ্ছে শশিনাথ ও লীলা, অন্যগুচ্ছে বরেন ও সরযূ। এদের মধ্যে প্রবৃত্তির যে সংঘর্ষ আছে তাতেই আখ্যানের পরিচয়। তবে আকস্মিকতায় এসেচে অতি নাটকীয়তা, যা ছিঁড়ে দিয়েচে গল্পায়নের

সূত্রটি। "অমূলতরু" মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে এগিয়ে চলেচে। সুবোধ-সুনীতির মনায়নে ক্রুতিত্ব ফুটেচে। উপন্যাসের নামই ইঙ্গিত কচ্ছে যে মিলনসম্ভাবনা যেন অমূলতরু। "অমলার" (১৯৫০) বিজয়নাথ-অমলার মিলনই কীর্ত্তিত হয়েচে। অমলা চরিত্রের দৃঢ়তাই এখানে মুখ্য। "বিদুষী ভার্যার" (১৯৪৪) বিষয়-বস্তু হ'লো এম, এ-পাশিয়ে যূথিকার সঙ্গে ম্যাট্রিক-ফেলিয়ে দিবাকরের বিয়ে। এতে দু'জনেই খাপ খাইয়েচে দাম্পত্যবিলাসে। এরি মহিমা ধরা পড়ে শিবানী-নিশাকরের মিলনে। এখানে যে তথ্যের আমদানি হয়েচে, তার তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। "অন্তরাগ" (১৯৪৫) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এর উপজীব্য হ'লো স্বামী ও ভাইয়ের বিভেদ-হীনতায়। প্রভেদ হ'লো শুধু যৌনসম্পর্কে, স্ত্রী ও পুরুষের চেহারায়। তাই অযৌনসম্পর্ক যে বিভেদ রচনা করে তার জন্যে দায়ী সমাজ-সংস্কার। বিনয় ছিলো কমলার বাগ্‌দত্ত স্বামী। পরে প্রকাশ পেল যে সে কমলার হ'লো ভাই। প্রতিপাদ্যের দিক থেকে সমস্যাটি ভাববার মতো। এ যেন D. H. Lawrence এর Sons and Lovers এর উল্টো পিঠ। ফ্রয়েডীয় আবিষ্কারের মহিমা একে দিয়েচে জয়টীকা। "দিক্‌শূলের" বিষয় বস্তু হ'লো বিত্ত, যা দাম্পত্য জীবনে বিভেদ সৃষ্টি করে। রমাপদ ও সরযূর মধ্যে যে বিচ্ছেদ এসেচে তার জন্যে দায়ী তাদের শিশু পুত্রকে শালিকার কাছে পোষ্য দেওয়ার প্রস্তাবে। এতে একদিকে যেমন রমাপদ'র অভিমান, অন্যদিকে সরযূর বিপরীত মনোবৃত্তি। একই প্রস্তাবে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েচে, তাতেই আছে কালের খণ্ডিত রূপ। এখানে তাই মনস্তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েচে। এ ছাড়া আছে আরো বই। তবে এখানে উপেন্দ্র-সাহিত্যের যে দু'টো ধারা লক্ষণীয়, তারি পরিচয় আছে। যৌনসম্পর্ক নিয়েই এগিয়েচে এক বাহু, আরেক বাহু চলেচে রাজনীতির সমসাময়িকতায়। একটি চিরন্তনী অন্যটি সাম্প্রতিকী। এ দুয়েরি দোলায় দুলেচে গোটা সাহিত্য। এ সম্বন্ধে লেখক নিজেই বলেচেন: "সাময়িক ঘটনা এবং অবস্থার চাপ একটু মাত্রাতিরিক্তভাবে গায়ে এসে লাগ্‌ছে এবং উপন্যাস সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে ইতিহাসের বুলি আওড়াচ্ছে।" তবে এ ইতিহাস সরস ও সহজ। আর এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্যের তুঙ্গ শিখর।

(৩) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৪৪)

প্রেমিক মানুষে আছে হৃদয় ও শরীর। রবীন্দ্র-শরৎ সড়কে হৃদয়ের দিকটা যেমন খুলেচে, তেমন হয়নি শরীর। তাই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এও এলো এগিয়ে আর জল্‌লো নতুনের দেয়ালি। এতে উদ্ভাসিত হ'লো যৌন দিকটা, যা এতকাল নিষিদ্ধ ছিলো। নিষিদ্ধ প্রেমের হ'লো নবরূপান্তর। এ ধারার বহনে

যাঁরা কাজ করেচেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর সাহিত্যায়নে দুটি স্তর ধরা পড়ে। একটি তিলোত্তমাকর, অন্যটি মৌলিক। "আগুনের ফুলকি" "সর্বনাশের নেশা" "অদর্শন" "জোড়বিজোড়" "নোঙরছেঁড়া নৌকা" প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এগুলি তিলোত্তমাকর হ'লেও ভাষ্যকারের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বাঙ্গালী জীবনের বাস্তবায়নে এসেচে কিছুটা স্বকীয়তা। "যমুনাপুলিনে ভিখারিণীতে" ক্ষণিকা বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। "চোর কাঁটায়" সাধু মল্লিকের জীবনায়ন এবং মমতা ও পশুপতির চরিত্রায়ন বেশ সরস ও আবেগবিহ্বল হয়েচে। দিশি-বিদেশী ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেচে অনেক উপন্যাস। তবে রবীন্দ্র-ঋণ স্বীকৃতি পেয়েচে লেখকের "দুইতার" ও 'হেরফের'-এ (১৯১৯)। আখ্যানবিন্যাস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "হেরফেরে" রজত-শিশিরের বন্ধুত্ব বিবর্ত্তিত হয়েচে পারিপার্শ্বিকের চাপে। রজতের গর্ব ও শিশিরের দারিদ্র্যাভিমান সহায়তা করেচে চরিত্রায়নে। শিশিরের জীবন দুলেচে প্রণয়দোলায় বিদ্যুতের অভ্যাগমে। এখানে বাস্তববীণায় রহস্যের সুরই বেজেচে। "দোটানায়" (১৯২০) অন্তর্দ্বন্দ্ব এসেচে হৈমবতীর মনে তরল ও গোবর্দ্ধনের উপস্থিতিতে। হৈমবতীর আত্মহত্যার কারণ হ'লো স্বকীয়া পরকীয়া-অদ্বৈতের অভাবে। এখানে মনন এগিয়েচে মনঃসমীক্ষণে। কাজেই স্বকীয়তা আসতে বাধ্য।

এরপর মৌলিকতার পথ সুগম হ'লো। "স্রোতের ফুল" (১৯১৫) স্বকীয়তায় ভাস্বর। যৌনসম্পর্ক প্রকট হয়েচে এখানে। এ-ছাড়া উদগ্র সচেতনতা নজরে পড়ে। চরিত্রায়নে বিপিন একটু ভাবপ্রবণ। কালীতারা ও মালতী উল্লেখ-যোগ্য। তবে প্রেমানন্দ র'য়ে গেচে উপেক্ষিত। চরিত্র-চিত্রণ তেমন ফোটেনি। "পরগাছায়" (১৯১৬) বাস্তবায়নের আর এক ভিয়ান। এর পর "পংকতিলক" (১৯১৯,ই লেখকের জনপ্রিয়তার জয়-তিলক। এর মারফতে তিনি পেয়েছেন 'বিশ্রী' জয়-মাল্য। প্রেমচক্রের ত্রিভুজ গ'ড়ে উঠেছে আভা-গোবিন্দ-নির্মলের ভালবাসায়। আভা জগন্নাথের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামী মারা যায়। তার পরে চলেচে তার দিগ্বিজয়ের সাধনা। এ তাই শরৎচন্দ্রের কমলেরই পূর্বাভাস। প্রাণ-প্রবাহে আভা এগিয়ে চলেচে। উপন্যাসের মৌলতত্ত্ব তাই ফুটেচে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে—

পতিতা রমণী

মর্ত্তে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি।
তুমি কি জানিবে বার্ত্তা, অন্তর্যামী যিনি,
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী।

মোট কথায়, চারুচন্দ্রের দ্যুতি এখানে পরিস্ফুট। "হাইফেন" মলয়-মৃদুলার প্রেমকাহিনী। মাঝখানে আছে অবিশ্যি বিলোপ, যে হাইফেনের কাজ করেচে

মিলনের সেতু-রচনায়। মনমপ্রীতি ও মৃদুলা-আকর্ষণে প্রথমটিই জয়ী হয়েচে আর বিলোপ বন্ধুত্বের জয় ঘোষণা করেচে। "মন না মতি" উপন্যাসে ব্রততী-পলাশের দাম্পত্য সম্পর্কে উল্কা এনেচে উল্কার সুর। পলাশের আবরণে রূপায়িত হয়েচে মননের লীলা, যেমন স্বকীয়া ; পরকীয়া ব্রততী ও উল্কায়। উপন্যাসের নামেই আছে বক্তব্যের আভাস। স্থিতি ও চাঞ্চল্যের, মনন ও আবেগের বিষয়ই হ'লো উপন্যাসের প্রাণ-কেন্দ্র। নিষিদ্ধ প্রেমের অভিযানে তাই চারুচন্দ্র শরৎপর্বকে আরো এগিয়ে এনেচেন বাস্তবায়নে। এ যে কতবড়ো বিপ্লব তাৎকালীন সাহিত্যে, তার পরিচয় মেলে "বিশ্রী চারুচন্দ্র" সংজ্ঞায়।

(৪) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২—)

বাংলা উপন্যাস আদর্শ থেকে বাস্তবের দিকে নামতে সুরু করেচে অনেক আগে থেকেই। সময়ের অতিক্রমণে এর বেগ তীব্রতর হ'লো। বিশশতকের গোড়াতেই যৌনসম্পর্কে এলো এ-বাস্তবতা আর প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের "নষ্ট-নীড়ে" (১৯০১)। যৌনতাই উপজীব্য হয়েচে দেবর-ভাজের ব্যবহারে। পরে "চোখের বালির" ভিতর দিয়ে এ এগিয়ে চল্‌লো। রাবীন্দ্রিক ধারায় বাস্তবও এক রকমের রূপান্তরিত আদর্শ। তাই তীব্রতার সুর তেমন বাজেনি। এর পর শরৎচন্দ্রের আগমনে এলো বাস্তবের বিদ্রোহ রস, যা সমাজের বুকে উথলে উঠেচে। এঁর "শ্রীকান্ত", "চরিত্রহীন" ও "গৃহদাহ" নিষিদ্ধ প্রেমের প্রকাশ। এখানে সত্যিকার বিপ্লবের চিহ্ন নেই। বাস্তব এখনো অনেকটা পুরণো ধারায় চলেচে। সমাজ-সত্তায় চিড় ধরেচে। তাই ভাঙ্গন-পথে দেখা দিয়েচে উঁচু-নিচুর প্রভেদ। এখানে শরৎচন্দ্রের দরদ আছে বটে, তবে পুরণো প্রসিদ্ধির জয় জয়-কার। তিনি সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত নাড়া দিতে পারেন নি। তাঁর 'স্বামী' এর উদাহরণ। স্বামী একটি ভাব। একে আঁকড়ে থাকাতেই আনন্দ। তাই অভয়া স্বামীর সঙ্গে ঘর কর্তে রাজী ছিলো, কিন্তু হ'য়ে উঠলো না স্বামীর বেত্রাঘাতে। পুরণোকে নতুন হ'তে হ'লে চাই উপযুক্ত স্রষ্টাকে। তাই এগিয়ে এলেন অন্যান্য রথীরা। "ভারতী" গোষ্ঠীর চারুচন্দ্র যৌন-বোধের প্রয়োগ দেখালেন "পঙ্কতিলকে" [১৯১৯]। ঠিক এই সময়ে আর এক জন অবতীর্ণ হ'লেন সাহিত্য ক্ষেত্রে, যিনি যৌনজিজ্ঞাসাকে করেচেন পাংক্তেয়। ইনি হলেন নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। এঁর নায়ক নায়িকারা অপরাধপ্রবণ ও যৌনভিত্তিতে এগিয়ে এলো। পারস্পরিক সম্পর্ক এরি মারফতে গ'ড়ে উঠেচে। তাই এলো 'ঠানদিদি' (১৯১৮)।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে মোটামুটি তিনটি স্তরের সাক্ষাৎ মেলে। প্রথম স্তরে

আছে যৌনবোধের উদগ্রতা যা আঘাত করেচে নীতিবাদকে—এমন কি অনেক জায়গায় ব্যাহত করেচে শিল্পায়নকেও। দ্বিতীয় ধাপে উদ্দেশের চেয়ে শিল্পই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। তৃতীয় স্তরে বাস্তবের হয়েচে উদগতি আদর্শায়নে।

এবার প্রথম স্তরের কথা। এখানে অপরাধপ্রবণতা মাথা চাড়া দিয়েচে যৌন-বোধে। বস্তুত সমাজ চাইচে অচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তে। এখানে এসেচে বিদ্রোহ এ-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। 'শুভা' [১৯২০] নীতিবাদকে কুঠারাঘাত করে প্রবেশ করেচে সাহিত্যে। নায়িকা প্রাণনের লীলায় এগিয়েচে। তাই তার মধ্যে জড় হয়েচে স্বামীত্যাগ, নাট্য-ব্যবসা, কামাতুরতা, সমাজ-সেবা প্রভৃতি। এখানে প্রাণনের রূপরূপান্তরই চোখে পড়ে—এক একটি মূর্ত্তি জীবন্ত। সমাজে এরকম নারীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই অশুভ। তাই যেন নীতিবাগীশের দিকে তাকিয়ে লেখক জানিয়েচেন এ হ'লো শুভা অর্থাৎ মঙ্গলের অগ্রদূত। এক কথায়, লেখকের বক্তব্য হচ্চে এই যে, যখন সমাজে স্বীকৃতি পাবে যৌনভিত্তি, তখনি আসবে সত্যিকার মঙ্গল কি সমষ্টি, কি ব্যষ্টির জীবনে। তাই দুঃসাহসিক অভিযান আরও এগিয়েচে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের অবতারণায়। এরি নিদর্শন মেলে "রক্তের ঋণ," "পাপের ছাপ"(১৯২২), "রাক্ষসী" ও "শাস্তি"তে (১৯২১)।

প্রথম স্তর

এখানে অপরাধবিজ্ঞান এসে হাত মিলিয়েচে যৌনবোধে। উপন্যাসের নামকরণে বিষয়বস্তুর পরিচয় ফুটে উঠেচে। Havelock Ellis ও Freud হাত মিলিয়েচেন এখানে আর যৌন-জিজ্ঞাসার বান ডেকেচে। মানুষী পশুশালার দরজা খুলে দেয়া হয়েচে। তাইতো "পাপের ছাপে" [পূর্ব্বজ নাম 'মেঘনাদ'] মনোরমার যে পাপপ্রবণতা তা এসেচে তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। এখানে নিয়তিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসে উদ্দেশ্যের চেয়ে শিল্পায়নই বেশি ফুটেচে। অবিশ্যি বিজ্ঞানের বনিয়াদের উপরেই উঠেচে এ-ইমারৎ। "লুপ্তশিখার" পতিতা মালতীর দুটো দিক দেখান হয়েচে। পতিতার স্নেহশীলতা প্রবাহিত হয়েচে বালক বটুর দিকে, আর গণিকার অন্যের দিকে। মালতীর মানবতা যেন চাপা প'ড়ে গেচে পতিতাবৃত্তিতে। পারিপার্শ্বিকের চাপে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে মানবিক শিক্ষা। "অভয়ের বিয়ে" ও "তারপরে" (১৯৩১) অভয়-মায়া-সরমার ত্রিভুজ আঁকা হয়েচে। সরমা অভয়কে ছেড়ে শেষে অজয়কে বিয়ে করেচে। এ যৌন-বোধের পরিচয় দেয়। "মিলন পূর্ণিমায়" ও "নিষ্কণ্টকে" প্রণয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। সৌরীন-রেখার প্রণয়-সঞ্চার ও অলক-অঞ্জলির দাম্পত্য কলহ সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত হয়েচে। "সর্বহারায়" (১৯২৯) অসীম ও হরিহরের কাহিনী বর্ণিত হয়েচে। একজনের নাস্তিকতা, অন্যের প্রণয়ের অনিবার্য্য ফল। এখানেও মনায়নের পরিচয় আছে, তবে শিল্পিক সুষমার দিকেই নজরটা বেশি। তাই এ-স্তরে উগ্রতা তেমন এসে আঘাত দেয় না। আঘাতের আঙ্গিক এখানে একটু আলাদা।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে বাস্তবতার রূপান্তর লক্ষণীয়। আদর্শায়নের দিকে ঝোঁকটা দেখা যায়। এ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হ'লো "অগ্নি সংস্কার" (১৯২০) ও "বিপর্যয়"। মনোরমা ও অনীতা চরিত্রে বিবাহ ও বৈরাগ্য যথাক্রমে ফুটে উঠেচে। প্রথমের জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনাকে তুচ্ছ করে যৌবনই জয়ী হয়েচে আর দ্বিতীয়ে দেখা যায় "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"'র জয় জয়কার। সম্ভাবনার দুই সীমা যেন ভেসে উঠেচে। এখানে লেখকের উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েচে নারীর ধর্ম-ইতিহাস-কথনে। এ-ধর্মসাধনাও এক প্রকারের নিষ্কৃতিমার্গ, যাতে ধরা পড়ে পলায়নী ভাবের বিকাশ। যৌবনের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় এসেচে দুর্গতি। বিপত্তির কারণ তাই ফ্রয়েডীয় অবদমন। এরি পরিচয় মেলে "তৃপ্তির" মিনতি চরিত্রে। অগ্নি-সংস্কারের ধাকায় নবজীবন পেয়েচে সত্যেন ও ইলা। দাম্পত্যজীবনে বিরোধের ফাটল কেমন করে গজায় ও ক্রমে ক্রমে বাড়ে, এখানে আছে তার ক্রমিক বিস্তারের পরিচয়। "অন্তরায়"-এ (১৯৩১) শৈবলিনী দোল খেয়েচে সতীনাথ ও অনুপমের মারফতে। সে খানিকটা অচলার মতো। স্ত্রীকে পাবে না বলে স্বামী অনুপম শেষে চলে গেচে। এ ছাড়া আছে "সতী", "প্রহেলিকা" প্রভৃতি, যা নিয়ে লেখকের গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশের উপর। নরেশচন্দ্রের তাই বৈশিষ্ট্য হ'লো যৌন সমস্যার গোয়েন্দা-গিরিতে। এখানে অপরাধের ভিত্তিও এসে পড়েচে। এরি ফলে অনেক জায়গায় শৈল্পিক সুষমা চাপা পড়েচে উদ্দেশ্যের চাপে। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনন হয়েচে, সে পরিমাণে শিল্পায়নের প্রাপন আসে নি। তাই সমস্যাসঙ্কুল প্রবন্ধই ভেসে উঠেচে, যেখানে তথ্যের বালুচরে রসের হয়েচে ভরাডুবি। তবুও নরেশচন্দ্র স্মরণীয় এই জন্যে যে, তিনি যে বাস্তবতার বীজ বপন করেচেন, তাই কাল-ক্রমে আধুনিক মহীরুহে বিস্তার লাভ করেচে।

তৃতীয় স্তর

(৫) মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭—)

একদিকে বাস্তবায়ন ব'য়ে চলেচে, অন্যদিকে বাস্তব-আদর্শের যুক্ত ধারায় এসেচে রহস্যবিলাস। তারুণ্যের এ অভিযানে খেয়ালী কল্পনার বিস্তার হয়েচে। এতে ফুটে উঠেচে সাংস্কৃতিক বিপ্লবও। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যেমন গড়ে উঠলো মধ্যবিত্তের পত্তনে 'বাবুবিলাস', বিশ শতকের তৃতীয় দশকেও এলো 'বৈঠকীবিলাস'। বস্তুতঃ শতাব্দীর ব্যবধানে "বাবুবিলাসে"র পরিণতিই হলো 'বৈঠকী বিলাস'। এখানে ইংরেজি-শিক্ষিত বাবুরা ফ্যাসানেই গা ঢেলে দিয়েচেন। ফলে তাদের সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেচে Havelock, Ellis, Freud, Nietzsche, Schopenhauer প্রভৃতির মারফতে। এরি প্রতিভূ হলেন মণীন্দ্রলাল বসু। এর প্রতিভার উৎসমূলে যারা গোপনে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের বর্ণনা লেখক নিজেই দিয়েচেন: "বেদ হইতে

নীট্‌সে, কালিদাস হইতে শেলী, গতিয়ে, বাৎস্যায়ণ হইতে ফ্রয়েড সবই আমি পড়িয়াছি। কিছু দিন পূর্বেই বার্টনের একাধিক সহস্র রজনী তৃতীয় বার পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।" এই "বৈঠকী-বিলাস" 'বালিগঞ্জ সংস্কৃতি'রই নামান্তর, যেহেতু এর বিকাশ বালিগঞ্জেই বেশি। এ বিলাসের পরিচায়ক হ'লো "রমলা" (১৯২২)। তারুণ্যের রঙিন বেলুনে কাহিনী উড়ে চলেচে। রহস্যের যাদুস্পর্শে এ-দুনিয়া স্বর্ণরাজ্যে রূপান্তরিত হয়েচে। তরুণদের মধ্যে তাই এ জনপ্রিয়তা অর্জন করেচে। আধুনিক য়ুরোপীয় শিক্ষায় সংস্কৃতিবান নায়ক-নায়িকারা বুদ্ধিজীবী হ'লেও তারা কল্পনার রঙীন পাখায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। খেয়ালী হ'লেও এরা একদম অবাস্তব, কাল্পনিক নয়। রক্ত-মাংসের সংস্রব আছে এদের সঙ্গে। এ তরুণ সমাজের মুখপাত্র, যাতে বাজে শুধু রহস্যের সুর। গদ্যজীবনের ক্ষত চিহ্ন এখানে তাই স্বভাবতই অনুপস্থিত।

অন্যান্য বইয়ের মধ্যে "স্বপ্ন", "জীবনায়ন" ও "সহযাত্রিণী" উল্লেখযোগ্য। "জীবনায়ণে" মনস্তত্ত্ব ফুটেচে বর্ণনার লিপিকুশলতায়। বস্তুতঃ সব উপন্যাসই মণীন্দ্র লালী আবেগে ভরপুর। এখানে যে জগতের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বলা চলে "সব পেয়েছি"র দেশ। এ-দুনিয়ায় ফুল ফোটে, রঙের রং রেজিনী চলে, রঙের ক্বিদেয় রঙ তৈরি। "বর্ণানেকান্" ঝলসে ওঠে, যেমন,—"বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙ্গা মুখ ঘিরিয়া কালো কেশের রাশি; তাহার উপর ফিউশিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রংএর এক জামার উপর এষ্টার ফুলের রংএর একখানি শাড়ি। মোজাবিহীন পায়ে ক্যাকটাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতা"। মোটকথা মণীন্দ্রলাল সূক্ষ্ম সংস্কৃতির বাহক। কাজেই বাস্তবপন্থীদের পরিভাষায় তিনি পলায়নতৎপর। সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনে এর রঙ একটু ফিকে। তাহ'লেও, মন্দাক্রান্ত জীবনদোলায়ও চাই একটু বৈচিত্র্য, একটু বিলাস, কিছুটা চিত্তবিনোদন। কালক্রমে বাস্তবায়নের হয়েচে জয়জয়কার। তা সত্ত্বেও লেখকের বাবু সংস্কৃতির রূপায়ন আঁকা রইল ইতিহাসের পটে, যার সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায়,—

"ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়"

(৬) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬০—১৯৪৯]

অনেকে ছোট গল্পে হাস্যরসের আমদানি করেচেন বটে, কিন্তু উপন্যাস এ আওতার বাইরে র'য়ে গেচে। এ-অভাব যিনি দূর করেচেন তিনি হ'লেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুপ্রাসে ও বিরোধাভাসে যে রস উথ্‌লে ওঠে, তিনি তার পূজারী। কথায় মারপ্যাচে যে শ্লেষের অভিব্যক্তি এখানে আছে তাই। তীরন্দাজ ব্যঙ্গের তীর ছুঁড়েই চলেচেন। জীবনের দুটো দিক আছে—মন ও হৃদয়। অনুভূতির দ্রাবক

রসে হৃদয় গলে ঝরে আর শোকাশ্রিকার হয় অভিষেক। কিন্তু মননে জীবনরসিক হয় পরিহাসমুখর। তাই আসে আহ্লাদিকা। এদিকে অগ্রসর হয়েছেন কেদারনাথ। তাঁর তুলিতে ফুটেচে অভাব-অভিযোগের অসঙ্গতি। এতে মনে হয় "এতো ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা।"

তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়ে জীবনের চিন্তনের দিকটা। তাঁর "শেষ খেয়া" [১৯২৫] গাম্ভীর্যব্যঞ্জক হ'লেও বিদ্রূপের শানে শানান। এর উদাহরণ মেলে নিমাই নন্দীর চরিত্রে। তবু করুণ রসই প্রাধান্য পেয়েচে। হাস্যরসের অপ্রতুলতার জন্যে শৈল্পিক সুষমার ব্যাঘাত ঘটেচে। তবে নবীন ও ব্রজবাবুর সমস্যা গভীর ও বিচিত্ররঙা। "ভাদুড়ীমশাই" [১৯৩১] রে হয়েচে ভাঁড়ামির মাত্রাধিক্য। ভাদুড়ীমশাই যেন Dickensএর Pickwickএর ধাচে পরিকল্পিত। তার দেহের মাপজোখ, মন্দির প্রবেশ প্রভৃতি হাস্যবহুলতায় মুখর। তারপর আছে "সপ্তর্ষিমণ্ডলে"র কথা। এরা হাসির নকসা হিসেবে উল্লেখযোগ্য; অক্ষয় গুজরাটিগড়নে ঘনশ্যামবর্ণ; কোরক রায় প্রাচীন কবি; বিমানশশী গল্প লিখিয়ে; অব্যক্তকুমার গবেষক; বেলোয়ারী স্বরলিপিতে সিদ্ধহস্ত; আলেখ্য চিত্র শিল্পী; কিংশুক বৈরাগী। গল্পায়নে দেখা যায় কিংশুক বিয়ে করেচে ইরাকে আর ভাদুড়ীমশাই তাদের আশীর্বাদ করেচেন। এরপর "কোষ্ঠির ফলা ফলে" অনুসৃত হয়েচে আত্মজৈবনিক রীতি। সংলাপ ফুটেচে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দীতে। ঘটনার মাত্রাধিক্যে গাল্পিকতা ব্যাহত হয়েচে। হাস্যরসিকতা এসেচে সংলাপে ও চরিত্র-চিত্রণে। উপভোগ্য হয়েচে খেমোশালিকের ইতিহাসকথন, জীবন্ত পিতার উদ্দেশে পিনু ঠাকুরের পিণ্ডদান ব্যবস্থা ও জয় হরির ঔদরিকতা। পর্যবেক্ষণ রূপায়িত হয়েচে বর্ণনায়, যেমন, "কিউল-ইষ্টেশন হইতে অন্যূন পঞ্চাশ হাঁড়ি [কলস] দধি প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতায় চালান যায় এবং প্রাতে রবি বাবুর ভাষায়—'বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করে।' এখানে হাস্যরসিক প্রয়োগ করেচেন বিশ্ব কবির ভাষা আর দুয়ের অসঙ্গতিতে ফুটেচে পরিহাস। তবে করুণ রসের পরিচয়ও আছে। আজিজ ও মানবের বন্ধুত্বে এ দেখা যায়।

হাস্যরসের ফোয়ারা খুলে গেচে "আইহ্যাজে" [১৯৩৫]। বাংরেজিয়ানায় এগিয়েচে এ রসধারা। এর বাঁকের পরিচয় মেলে কথার মারপ্যাচে। 'আই' ও 'হ্যাজে'র বিরোধেই যেমন আছে অসঙ্গতি, তেমনি শিবুর জীবনেও। সে "বি-এ পর্য্যন্ত পড়লে, কিন্তু বরাবরই লিখলে—'আইহ্যাজ'"। দেশপরিক্রমায় এগিয়েচে শিবুর জীবনপ্রবাহ আর এ রূপ পেয়েচে আত্মকথায়। কাশী, ছাপরা, পাটনা, কিষণগঞ্জ, কলকাতা প্রভৃতি জায়গায় মিলেচে মানুষের সাক্ষাৎ। আলাপনা ব'য়ে চলেচে প্রতুল, অনুকূল, মুকুন্দ'র সঙ্গে। বাঙালী জীবনে একদিকে গড়িয়েচে হাসি, অন্য দিকে অশ্রু। এরি পরিচিতি বহন কচ্চে কেদারনাথের বর্ণনা: "আমাদের আই (I) বলে কিছু নেইরে—সব it—3rd person singular। I টা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের মুখোস।" এতে তীরন্দাজ নিজেই ক্ষত বিক্ষত হয়েচেন। তাই ব্যঙ্গ রূপান্তরিত হয়েচে

আত্মকরুণায়। "পাওনা" [১৯৩৬] উপন্যাসে লেখক এঁকেচেন পল্লীর ছবি। এ "উপন্যাসচ্ছলে—সহস্রতলীর ষাট বৎসর পূর্বের পল্লীসমাজের পরিচয় বা আভাস" দিচে। মামা ও অন্নদাকে কেন্দ্র ক'রে এ গড়ে উঠেচে। অন্নদা বিধবাই র'য়ে গেলো শেষ পর্যন্ত, এদিকে মামার ছোঁয়াছুঁয়ির বাই চলে গেলো। এতে হাস্যরসের দিকটা তেমন খোলে নি।

হাস্যরসের আমদানির জন্যে স্মরণীয় কেদারনাথ। এ এসেচে ভ্রমণ মারফতে। দেশপরিক্রমায় যে সব অসঙ্গতি দেখা গেচে, তিনি করেচেন তারি রূপায়ণ। আঙ্গিকের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হ'লো আত্মজৈবনিক পদ্ধতি। এধরণের উপন্যাসগুলিই বেশি সার্থক হয়েচে। তবে শিল্পিক সুষমা সব জায়গায় ফুটে উঠতে পারেনি। এরজন্যে দায়ী অতি কথনের বৃত্তায়ন। হাসির স্থূল দিকটার দিকেই তাঁর নজর বেশি। তবে এতে মিশেচে অশ্রু। দেশপরিক্রমায় এসেচে খেয়ালী কল্পনার বিহারও। উপন্যাসের ব্যাপক ক্ষেত্রে হাস্যরসের প্রয়োগে লেখক স্মরণীয়। একালের শিল্পী হাসিকান্নার তাজমহল গড়তে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পিরামিডের দিন বুঝি সত্যি চলে গেচে।

(৭) বঙ্কিম-বরণ

শরৎপর্বে উপন্যাসের ধারা বয়ে চলেচে কখনো বঙ্কিমী, কখনো শরৎচন্দ্রীয়, কখনো বা সমাজতন্ত্রীয় পথে। মাঝে মাঝে যৌন ও অপরাধপ্রবণ মানুষের ও সাক্ষাৎ মেলে। তাই এসব বিভিন্নধারার পরিচয় দেওয়া যায় বিভিন্ন নামাঙ্কে। শরৎচন্দ্রের বাল্য-লীলা ভূমিকে কেন্দ্র ক'রে যে দলের অভ্যুদয় হয়েচে, তাকে বলা বলে "ভাগলপুর-গোষ্ঠি।" এঁদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের আত্মীয়স্থানীয়। কাজেই এ দল গঠনে তার ব্যক্তিক প্রভাব ও কম স্মরণীয় নয়।

শরৎচন্দ্রীয় দ্যুতিতে যাঁরা ভাস্বর হয়েচেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট স্মর্তব্য। এঁর "স্বেচ্ছাচারী" (১৯১৭) রহস্যের পাখায় চলেচে। সাময়িকীর প্রভাবই দেখা যায়, কিন্তু নতুনত্বের কোন স্বাদ নেই এখানে। "সহজিয়ার" (১৯২২) গঠনশৈলী একটু আলগা ধরণের। দু'এক ফালি ঘটনার সমাবেশে অবিশ্যি লেখকের বৈশিষ্ট্য ফুটেচে। বাঙালীপণার বাড়াবাড়িতে যে উচ্ছ্বাস উৎসারিয়ে উঠেচে, তাতেই হয়েচে বিভূতিভূষণের সলিল সমাধি। তাঁর অনুজা নিরুপমা দেবী (১৮৮৭-১৯৫১) [ওরফে অনুপমা] ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

নিরুপমা দেবী

এঁর "অন্নপূর্ণার মন্দির" (১৯১৩) শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম'কে স্মরণে আনে। দারিদ্র্য ও তেজস্বিতার পরিচয়ে রসের উৎস খুলে গেচে। এখানে আছে শক্তিমত্তার ভিয়ান। নির্ভীকতা ও প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েচে সতীর চিঠিতে, যা বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে লেখা। অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী, সাবিত্রী—চরিত্রগুলিও বেশ ফুটেচে।

এখানে ভাবাতিশয্য নেই। "উচ্ছৃঙ্খল"এ [১৯২০] কিন্তু কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। শ্রী ইন্দিরা ও অনুবৌদির যৌথপ্রভাবে রূপান্তর এসেচে প্রমোদের মনে। "দিদি" (১৯১৫) নিরুপমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও জনপ্রিয়। দাম্পত্য মনোমালিন্যকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে এর ঘটনা-প্রবাহ। অমর, সুরমা ও চারুর সম্পর্কে এসেচে ঘাত প্রতিঘাতের ঘূর্ণি যা রূপায়িত হয়েচে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। ঘটনার সাধারণত্ব ও চরিত্রের সামান্যতাই সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে। বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ঘটনা ও চরিত্র কেমন ক'রে উপন্যাস হ'য়ে উঠতে পারে এখানে আছে তারি পরিচয়। প্রতিভার স্পর্শ আছে এ-লেখায়। "বিধিলিপি" (১৯১৯) জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক। অন্ধ-বিশ্বাসেই এসেচে শোকান্তিকা। মহেন্দ্র ও কাত্যায়নী বিশিষ্ট চরিত্র। প্রকৃতির পটে বাস্তবের হয়েচে রূপায়ণ, যেমন জ্যোতিষের ভূমিকায় পারিবারিক রহস্য। শিল্পায়নের কৌশলই এখানে জয়ী হয়েচে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কামাখ্যানাথের ব্যক্তিপুরুষ উল্লেখ যোগ্য। এরপর আদর্শ-বাস্তবের ফাটল দেখা দিয়েচে "শ্যামলীতে" [১৯১৯]। রেবা-অনিলের ব্যবহারে ভাবাতিশয্যই দেখা দিয়েচে। শ্যামলী চরিত্রের স্ফুরণেই আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মোট কথা, নিরুপমার মার্জিত রুচি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সংযমই এনেচে শৈল্পিক সুষমা কথাসাহিত্যে, যা মহিলা লিখিয়ের পক্ষে প্রশংসার্হ।

অনুরূপা দেবী

এরপর অনুরূপাদেবী (১৮৮২—) উল্লেখযোগ্য। ইনি মজঃফরপুরে শরৎ-চন্দ্রের সাহচর্যে এসেছিলেন। কাজেই ইনি "ভাগলপুর গোষ্ঠীর" অন্তর্ভুক্ত। নীতিবাদের কাছে শিল্পায়ন মাথা নিচু করেচে। এ-পরাজয়ে অনুরূপার উপন্যাস সাহিত্যিক উৎকর্ষ লাভ কর্তে পারেনি, যেমন পেরেচেন নিরুপমাদেবী। ফলে নীতির দিক থেকে ইনি প্রশংসা পেলেও, কথাশিল্প এতেৎ ব্যাহত হয়েচে। এঁর তুলনায় নিরুপমার ঝরঝরে ভাষার লিপিকুশলতা অধিক চিত্তাকর্ষক। অনুরূপার উপন্যাসে আছে কয়েকটি বিশেষ স্তর। ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নামাঙ্ক এ-স্তরবিন্যাসে লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক রসের আমদানী করেচে তাঁর "রামগড়" (১৯০৩), যা বৌদ্ধযুগের স্মারক। এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি ইংরেজী বচনের পরিপূরক। এখানে বঙ্কিমী পন্থাই অনুসৃত হয়েচে। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবও একে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য দিতে পারেনি। "ত্রিবেণী" (১৯২৮) তে মহীপালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েচে দিব্যোক ও ভীম প্রজাশক্তির দ্যোতক হিসেবে। এরি ঘূর্ণাবর্তে চলেচে ঘটনার নাটকীয়তা, যা বিরোধের রূপায়ণ। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে 'সামাজিক' উপন্যাস। "পোষ্যপুত্রে" (১৯০৮) বিনোদের অভিমানই জুগিয়েচে প্রেরণা। আকস্মিকতার জন্যে বিশ্লেষণের কোন স্পর্শ ফুটে ওঠেনি। "জ্যোতিঃহারা"য় (১৯০৮) অণিমা দাঁড়িয়ে আছে ধর্মের বাগ্‌বিতণ্ডাকে ভিত্তি ক'রে। "গরীবের মেয়ে" [১৯২৬] সুশীল-নীলিমা-সুলেখার ত্রিভুজে দীপ্তিমান। নীলিমা গরীবের মেয়ে, সে পেলো শুধু সিঁথির সিন্দুর আর সুলেখা পেল বিয়ের ভোগৈশ্বর্য সুশীলের কাছে। সুরটা কারুণ্যের। এরপর "বাগ্‌দত্তা"র (১৯১৪) কৃত্রিমতা এসেচে ঘটনাবিন্যাসের জটিলতায়।

শচীকান্ত-কমলা-মণীশের ত্রিভুজ গড়ে উঠেচে। শচীকান্তের মৃত্যু হ'লো, কিন্তু স্ত্রী কমলা স্বামীর বন্ধু মণীশের সঙ্গে ঘর করে নি।

এরপর আছে অন্যধরণের কাহিনী যার জনপ্রিয়তা একটু বেশি। "মন্ত্রশক্তি" তে (১৯১৫) বাণীরই হয়েচে বিজয়ঘোষণা। মনস্তাত্ত্বিকতায় এগিয়েচে কাহিনী। পতিভক্তির আদর্শ যে ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েচে স্বামীবিদ্বেষে, তারও পরিচয় আছে এখানে। "মহানিশা"র সঙ্গে তুলনীয় যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চির "অন্ধ বধূ"। যীরা ইরাবতীতে ডুবে মরেচে যেহেতু সে অন্ধ। জীবনই এক মহানিশা যার অন্ধকারে নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেচে। বড় করুণ এ কাহিনী। "মা" (১৯২০) অনুরূপার জনপ্রিয় উপন্যাস, যেমন নিরুপমার "দিদি"। কাহিনীর পরিসমাপ্তি এসেচে, যখন মনোরমার ছেলে অজিত বিমাতা ব্রজরাণীকে মা ব'লে সম্বোধন করেচে। এখানেও ত্রিভুজ আছে এক স্বামী ও দুই স্ত্রীর পরিকল্পনায়। "জোঁয়ারভাটা" গড়ে উঠেচে সিভিলিয়ান স্বামীর সঙ্গে হিন্দুস্ত্রীর সংঘর্ষে। "উত্তরায়ণে" আছে সলিল-স্বর্ণলতা-আরতির ত্রিভুজ। বিরোধের কাহিনী বয়ে চলেচে কখনো জ্বালায় কখনো মিলনের শান্তিতে। "পথের সাথী" রুবি ও মলয়ার বৈষম্যে আরম্ভ হ'য়ে জন্ম দিয়েচে বসন্তবাবুর পারিবারিক জটিলতা। এরপর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে স্মরণীয় "হারানো খাতা", যেখানে আত্মগোপনের রহস্য মায়াজাল বিস্তার করেচে। পরে অবিশ্বি এর নিরসন হয়েচে নিরঞ্জনের ডায়েরী-প্রাপ্তিতে। রাজনৈতিক ধারায় উল্লেখযোগ্য হ'লো "চক্র", যাতে আছে তরুণ-কৃষ্ণা-বিনয়ের ত্রিভুজ। ঘটনাবর্ত্তে বিনয়কে বরণ কর্ত্তে হয়েচে বন্দীর জীবন। এর জন্য দায়ী অবিশ্বি তার প্রেম। গার্হস্থ্য জীবনে এনেচে এ দোলা। রাজনীতির কাছে প্রেম বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে "পথহারায়"। ত্রিভুজ এসেচে বিমলেন্দু, অসমঞ্জ ও উৎপলাকে নিয়ে। এ হ'লো রবীন্দ্রনাথের "গোরা","ঘরে-বাইরে" ও "চার-অধ্যায়ের"সগোত্রীয়। উপন্যাসের বহুলতায় এগোলেও অনুরূপা দেবী সত্যিকার কোন মৌল দৃষ্টির পরিচয় দেননি। পুরণোপন্থী হিসেবেই তিনি অনুসরণ করেচেন গতানুগতিকতা। অনেক জায়গায় কাহিনী আবার মন্তব্যের জগদ্দলে ভারাক্রান্ত হয়েচে। শৈল্পিক সুষমার অভাব-বোধই পীড়া দেয়।

"ভাগলপুর গোষ্ঠী"র বাদে আরো অনেকে এগিয়েচেন বঙ্কিম ধারায়। এতে নীতিবাদই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। উল্লেখযোগ্য হ'লেন শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও ফনীন্দ্র নাথ পাল। এ-ছাড়া স্মরণে আসেন কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। নীতিবাগীশের ধ্বজা উড়িয়ে এরা ব্যক্তির পায়ে কুঠারাঘাত করেচেন। ভাষাও এঁদের পুরণো—অনেকটা "শব পোড়া মড়া দাহে"র সধর্মী। ভাব ও ভাষার মিলন না হওয়ায় এসেচে কৃত্রিমতা। সংস্কার ঐতিহ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াসই ধরা পড়েচে। এ-প্রসঙ্গে হেমেন্দ্র প্রসাদের "প্রিয়া", শচীশচন্দ্রের "কুঞ্জের ঝঙ্কার" ও ফনীন্দ্রনাথের "স্বামীর ভিটা" ও "সইমা" স্মরণীয়। উপন্যাসের

নামেই আছে বিষয়বস্তুর পরিচয়। লেখন মোটামুটি ধরণের—জায়গায় জায়গায় ভাষার স্বচ্ছতা লক্ষণীয়। এ-ধারার পরিপূরক হলেন সত্যেন্দ্রকুমার বসু, সরোজ নাথ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বসু ও মাণিক ভট্টাচার্য্য। শেষের "বেদে" উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-ইতিহাসের পাদপূরণের জন্যে এরা স্মর্তব্য। নতুনত্বের কোনো আভাস নেই। শুধু পুরণো প্রবাহই চলেচে ভাবের ভাসাগড়ার ভিতর দিয়ে।

(৮) 'ভারতী'-বিহার

'ভারতী'কে কেন্দ্র ক'রে এ-যুগে গড়ে উঠেচে যে-সাহিত্যায়ন, তাতে ধরা পড়ে যে বিশিষ্ট বিন্দু, তার পরিচিতির প্রয়োজন আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০—), যিনি গল্পায়নের বিশিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েচেন। একদিকে যেমন গাল্পিকতার সরস প্রবাহ অন্যদিকে তেমনি রহস্যের সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশেলি। হাস্যপরিহাসে গল্পায়ন উর্মিমুখর হয়েচে। তাই প্রেমাঙ্কুরের কাছে হাস্যই শুধু একমাত্র কথা নয়। এখানে নেমে এসেচে দুঃখের রাজ্যও, যা বিস্তার লাভ করেচে পাত্রপাত্রীর সংলাপে ও কর্মে। ছোট ছোট দুঃখ নায়ক নায়িকার মনে যে আলোড়ন এনেচে, তারি তুলিকর তিনি। ফলে "মনোজ ভাব তরঙ্গে"ই এগিয়েচে তাঁর উপন্যাস। "ঝড়ের পাখী" (১৯২৩), "দুইরাত্রি" (১৯২৭), "অচলপথের যাত্রী" "অরুণা" ও "প্রবাসী" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে একটা নবযুগের পূর্বাভাস। যে বিরাট বিপ্লবের ঝড় বইচে, তারি রূপায়ণ। "ঝড়ের পাখী" তাই সার্থক নামকরণে। এখানকার ব্রাহ্মপরিবার-চিত্রণও স্মরণীয়। উপন্যাসের বাস্তবায়ন ধরা পড়েচে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকারে। লেখক এরও পরিচয় দিয়েচেন তাঁর "চাষার মেয়ে"তে। এ হ'লো গণসাহিত্যের অগ্রদূত। চিত্রজগতে বহুদিন অবলুপ্তির পর তিনি আবার সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেচেন তাঁর "মহা-স্থবির জাতকে" [১ম পর্ব—১৯৪৪; ২য় পর্ব—১৯৪৭]। Rip Van Winkle এর মতো তিনি এখন মহাস্থবির, যিনি কথা কইচেন স্মৃতি রোমন্থনে। এ হ'লো শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তের" স-গোত্রীয়। আত্মজৈবনিক হ'য়েও গল্পায়নের ধারা এ অক্ষুন্ন রেখেচে। কথ্যভাষায় ফুটে উঠেচে ভবঘুরের জীবন-কাহিনী, জন্ম যাযাবরের প্রাণ-লীলা। ব্যঙ্গের সঙ্গে ভ্রমণের রহস্য মিলে একে করেচে অপরূপ। মাঝে মাঝে দুঃখিনী গোষ্ঠদিদি স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদিকে। ফলে করুণ রসই উদ্বেল হ'তে চাইচে, কিন্তু পারেনি ব্যঙ্গতটভূমির জন্য। লেখকে বাউলের চেহারা রূপায়িত হয়েচে মহাস্থবিরের চিত্রণে: "আমার ভিতরকার সেই লোকটি, সে আমায় কখনো কোথাও ঘর বাঁধতে দিলেনা, সেই চির-উদাসী আবার একদিন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো।" বস্তুত এই হ'লো গোটা উপন্যাসের প্রাণরস। ভয়ানক ও হাস্যরসের মিশ্রণ হয়েচে

দ্বিতীয় পর্বের বিমানবিহারীচন্দ্র ও শ্বশুর মশাইয়ের চিত্রণে। উপমায় এসেচে দক্ষযজ্ঞ-নাশের উল্লাস ও শিবের "সতীদে সতীদের" চীৎকার। দশাশ্বমেধ ঘাট, তরঙ্গিনী, ব্রাহ্মউৎসব, গড়ের মাঠের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য হয়েচে। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীর ছায়া এসেচে "দিদিমণি ভিখারিনী"তে। এক কথায় বলা চলে, প্রেমাঙ্কুরের লিপি কুশলতা আছে, যা ব্যঙ্গে ও করুণায় গল্প জমাতে পারে। এর সঙ্গে আছে গণসাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি, যা বাজীকর, চাষার মেয়ে প্রভৃতিকে সাহিত্যের ভোজে নিমন্ত্রণ জানাতেও কুণ্ঠিত হয় না। আর এখানেই তার বৈশিষ্ট্য।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-) 'ভারতীর' একজন প্রবীন লিখিয়ে। রবীন্দ্রপর্বে প্রভাত কুমারের যে স্থান, এ পর্বে সৌরীন্দ্রমোহনের স্থানও কতকটা সে-রকমের। অবিশ্যি প্রভাতকুমারের মত অতটা পারঙ্গম ইনি নন। ঘরোয়া পরিবেশের লঘু চিত্রণে স্মরণীয় সৌরীন্দ্রমোহন। ইনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকর ও গান-রচয়িতা। বহু-প্রস্থর সম্মান এর প্রাপ্য। শতাধিক উপন্যাসের খ্যাতি আছে এঁর। সাধারণ সুখদুঃখের চিত্রণেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। জটিলতার চিহ্ন নেই কি চরিত্র-চিত্রণে, কি আখ্যান-বিন্যাসে। "কাজরী" একখানা দাম্পত্য প্রণয়ের চিত্র। এখানে আছে বিবাহিত নরনারীর মান-অভিমান। এ-ছাড়া আছে "আঁধি", "লজ্জাবতী", "সাহসিকা", "নারী ও রোমান্স", যা তাঁর শক্তির পরিচায়ক। হাল আমলের কথ্যভাষায় লেখা "রাঙামাটির পথে" [১৯৪০] লেখক একটু জটিলতার দিকে ঝুঁকেচেন। কাহিনী-প্রবাহে এনেচেন তিনি দু'টি প্রেমের ত্রিভুজ—এক আভা-প্রতিভা-সন্তোষ; দুই, বিমল-অলকা-বিভাবরী। অলকার মধ্যে আছে দ্বৈতলীলা—প্রেম ও চলচ্চিত্র। বিমল এরি উল্টোপিঠ। তার আছে অলকাশক্তি ও সিনেমা-প্রীতি। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দোলায় ফুটেচে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ঘটনার তাই পরিণতি পেয়েচে শোকান্তিকায়। তবে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে গল্পায়নে।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এর পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় [১৮৮৮—] ওরফে প্রসাদ দাস রায়। শেষেরটি পিতৃদত্ত নাম আর প্রথমটি বি-নাম বা ছদ্মনাম। খেয়ালী কল্পনায় এবং গোয়েন্দা গল্পে দক্ষতা দেখালেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে উপন্যাসেও। এখানে আছে যেমন তাঁর গল্পায়ন, তেমনি তাঁর বাগ্‌সংযম। আখ্যান- পরিকল্পনায় ও আছে নতুনত্বের ছাপ। "আলেয়ার আলো", (১৯১৮), "পায়ের ধুলো" (১৯২১) ও "ঝড়ের যাত্রী" (১৯২৩) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮—)

দ্বিতীয় বইয়ে সংস্কার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সমাজ-ত্যক্ত নারীর স্থান নিয়ে যে-সমস্যা ঘুলিয়ে উঠেচে, এখানে আছে তারি রূপায়ণ। এরি উদগ্রতা প্রকাশ করেচে "ঝড়ের যাত্রী'। এ রকম উদার দৃষ্টি তাৎকালীন সাহিত্যে সত্যি বিস্ময়-কর। নির্য্যাতিত নারীত্বের প্রতি দরদ-প্রদর্শনে গণসাহিত্যের পথ হয়েচে সুগম। তবে এতে শরৎচন্দ্রীয় দ্যুতির ঝলমলানি চোখে পড়ে। পুরণো ধারার

পাশে পাশেই বয়ে চলেচে নতুনের ভাগীরথী। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তর-সূরীরা পেয়েচেন চিন্তনের জলপানি। কিন্তু নতুনত্বের খাল কেটে যে বান বইয়েচেন তাঁরা তা বিস্ময়ের। এই খনন কাজে অনেকেই সহায়তা করেচেন। তাঁদের অনেকের নামই আজ বিলুপ্তির ঝড়ে মুচে গেচে, যদিও পরোক্ষ ভাবে তাঁদের দান কিছুটা র'য়ে গেচে। কিন্তু জীবনের স্বাক্ষর নিয়ে সে-নাম আজ আর বেঁচে নেই। বিস্মৃতির আগার থেকে তাঁদের দু'একজনকে টেনে বের করা যায়। এদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি 'ভারতী'র বৈঠকে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। তাঁর ব্যক্তিকজীবনের স্ব-তন্ত্র স্পৃহা সাহিত্য-জীবনকেও রূপায়িত করেচে। এ কিন্তু এসেচে বিদিশি ভাবের সঙ্গে। তাঁর "জাপান" প্রতিভার পরিচায়ক। এখানে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাতে মিলেচে "চক্ষু, হৃদয় ও বুদ্ধি।" এ তিনের সমন্বয়ে এসেচে ঐক্য। সত্য পিপাসা অনুভূতির রসে সঞ্জীবিত হয়েচে। "চিত্রবহা" তাঁর লেখনীর চিত্রালি। এ-ছাড়া আছে "হানাফী", "বনস্পতির অভিযান", "নামিকো" ও "আলুপোড়া" প্রভৃতি। এতে ফুটেচে যুগের দাবী। প্রগতির পথে তাই সুরেশচন্দ্র।

(৯) মহিলামহল

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের ভেতর এসেচে নবজাগরণ, যাতে তাঁরা সজাগ হয়েচেন নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে। যে সমাজ-ব্যবস্থার চাপে নারীর ভাগ্য নিরূপিত হচ্চে, তারি দ্যোতক হিসেবে দু'টো ধারার পরিচয় মেলে। এক, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ; দুই, গতানুগতিকতার অনুসরণ। প্রথমটির জন্যে শরৎচন্দ্র যে ভাবে দায়ী, অন্য কেউ ঠিক সেইভাবে নন। মহিলাদের বেশির ভাগই পুরাতন-পন্থী। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন ভৃগুসংহিতা বা মনুর অনুশাসনের উপর। পুরাতনের জের টেনে চলেচেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, কুসুমকুমারী দেবী প্রভৃতি। কুসুম কুমারীর "শুভবিবাহ" এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এর পর কিছুটা নতুনত্বের দাবী কর্তে পারেন শৈলবালা ঘোষজায়া, যিনি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী গঠনে সহায়তা করেচেন। তাঁর "শেখ আন্দু" (১৯১৭) ও "মিষ্টি সরবৎ" [১৯২০] মুসলমানদের জীবন নিয়ে লেখা। শেখ আন্দু মুসলমান ড্রাইভার, যে হয়েচে উপন্যাসের নায়ক। অবহেলিত সমাজের চিত্রণে এসেচে গণসাহিত্যের আমেজ। আন্দু চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে প্রেমের ছায়ায় দুলেচে। তাই সে পুলিশের চাকরী নিলো। এতেও শান্তি না আসাতে সে জাহাজে ক'রে গেল বিদেশে। সমুদ্র ও জাহাজের বর্ণনা চমৎকার। মানসিক দ্বন্দ্বও রূপায়িত হয়েচে। এরপর আছে "নমিতা" (১৯১৮) "জন্ম অপরাধী" (১৯২০) ও "অরু" (১৯৩৯)। শেষেরটিতে স্ত্রী অরুন্ধতীর কৃচ্ছ্রসাধনাই ফুটেচে স্বামীর অত্যাচারের পটে। "বিভ্রাটে" সিদ্ধবাবার সাহচর্যে মঙ্গলা হয়েচে সন্তান-সম্ভবা। বর্ণনা ও সংলাপ বেশ ভালো। তারপর "তেজস্বতীতে" সার্থকতা এসেচে তৃপ্তির সঙ্গে

শঙ্করের বিয়েতে। স্ত্রীমানার উগ্রতা এখানে তেমন ফোটেনি। তবে সত্যিকার নতুনত্ব এসেচে কালেজি শিক্ষিত মহিলা লিখিয়েদের আবির্ভাবে। এ প্রসঙ্গে শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর নাম কর্ত্তে হয়। কাজেই এ দু'ধারায় গ'ড়ে উঠেচে বিরাট কথাসাহিত্য।

পুরণো প্রসিদ্ধির অনুসরণ আছে ইন্দিরা দেবার [ওরফে সুরূপা ১৮৭৯-১৯২২] রচনায়। ইনি অনেক গল্পও লিখেচেন। উপন্যাসের মধ্যে "স্পর্শমণি" (১৯১৭) স্মর্ত্তব্য দাম্পত্য মনোমালিন্যের চিত্র হিসেবে। কল্যাণীকে ভালবাসা সত্ত্বেও সতীনাথ বিয়ে করলো উমাকে। এখানে পত্তন হ'লো শোকান্তিকার এবং প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডে কল্যাণী ও সতীনাথের পৃথক জীবনযাত্রার কাহিনী আছে। তৃতীয় খণ্ডে ভুল ভাঙলো নাটকীয়ভাবে। সতীনাথ জানতে পারলো কল্যাণীর বিয়ে হয়নি।

কল্যাণীর মৃত্যু দেখা সম্ভব হয় নি সতীনাথের। পরে প্রথমা স্ত্রী মনে ক'রে সতীনাথ কল্যাণীর মৃতদেহে আলতা-সিঁদুর পরিয়ে দিলো। এখানে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। গল্পায়ণও বেশ ব'য়ে চলেচে। এরপর প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ইনি বহুপ্রসূ।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তবে বহুলতার তুলনায় সত্যিকার প্রতিভার স্পর্শ খুব কমই আছে। বইয়ের মধ্যে নাম করা যায় "অন্ধ" [১৯২৫], "আয়ুষ্মতী", "বিজিতা", "হৃদয়ের চাঁপে", [১৯২৪], "দানের মর্যাদা" (১৯২৫),"জাগরণ" (১৯২৬), "মুক্তি আহ্বান" [১৯২৬] প্রভৃতি। "সংসার পথের যাত্রীতে" (১৯২৫) কল্যাণী-রবীনের গার্হস্থ্য চিত্র ফুটেচে। "স্বামীস্ত্রী"তে পুরণো সংস্কারের প্রবহমানতাই ধরা পড়ে প্রিয়ব্রত ও করুণার কাহিনীতে। স্বামী অত্যাচারী, কিন্তু স্ত্রী সহনশীলা। একদিকে পরনিগ্রহ, অন্যদিকে আত্মনিগ্রহ। "নিশীথের চাঁদ"-এ জয়ন্ত এসেচে জগন্নাথ মিত্র ও সুরপতি দত্তের বিরোধের মাঝখানে। এই জয়ন্ত হ'লো জগন্নাথের শ্যালক-পুত্র। তাই প্রণাম গ্রহণ না করেই চ'লে গেলো সুরপতি। কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই এখানে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেচেন সীতা দেবী। ইনি 'প্রবাসী'-প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ

সীতা দেবী (১৮৯৫—)

চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। "হিন্দুস্থানী উপকথা" নিয়ে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ ক'রে এগিয়েচেন বৃহত্তর জীবন-জিজ্ঞাসায়। তার "পথিকবন্ধু" [১৯২০] প্রকৃতির পটে আঁকা ছবি, সেখানে ফুটে উঠেচে দেবপ্রিয় ও অনিন্দিতার প্রেম-কাহিনী। পথের বন্ধু পদাতিকের চালে চলেচে বন্য প্রকৃতির সমাবেশে। তাই কখনো সাঁওতাল পরগণার উষরতা, কখনো বা পুরীর সমুদ্রতীরের তীর্থলতা এসে দোলা দিয়েচে। নায়ক নায়িকার পথ সুগম হয়েচে কাহিনীর জটিলতা না থাকায়। "রজনীগন্ধায়" (১৯২১) ক্ষণিকা চেয়েচে অনাদিনাথকে, কিন্তু পেয়েচে চিন্ময়কে। এদিকে অনাদিনাথ মনোজাকে পেয়েও হারিয়েচে। মনস্তাত্ত্বিকতায় এগিয়েচে গাল্পিকতা আর ভাষা ও সংযমে সরস হয়েচে। বিদ্রোহের সুর চাপা আছে এখানে। "বন্যায়" নারীপ্রগতি এক দুর্বার স্রোতে ভেসে চলেচে। তাই তো সুবর্ণা চলেচে স্বামী শ্রীবিলাসকে ছেড়ে সুদর্শনের দিকে। সুবর্ণা মোহমুক্ত জীব, শ্রীবিলাসও দানবিক চরিত্র।

"পরভৃতিকায়" (১৯২০) পুত্র কন্যার বিনিময়ে গড়ে উঠেচে প্রেমের লীলা। ভানুমতীর হ'লো পুত্র, কিন্তু পেলো কন্যা। পরে কন্যা কৃষ্ণা প্রেম করেচে সুধীরের সঙ্গে, সে হ'লো ভানুমতীরই পুত্র। এদের মিলনে ঘটেচে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। আকস্মিকতায় এসেচে একটু অবাস্তবতা। এ-ছাড়া আছে "মাতৃঋণ" ও "জন্মস্বত্ব" উপন্যাস। প্রেমের দিকটাই দেখিয়েচেন লেখিকা যৌনসম্পর্কের ভিত্তিতে। তবে ভাষার সরসতা বেশ উপভোগ্য।

শান্তা দেবী (১৮৯৪ –)

এরপর এলেন শান্তা দেবী, যিনি প্রথম প্রবন্ধ লিখে নাম করেচেন। তা সত্ত্বেও উপন্যাসের খ্যাতিও কম নয়। সহোদরা সীতা দেবীর সঙ্গে সহযোগিতায় ইনি লিখেচেন "উদ্যানলতা," যা স্মরণ করিয়ে দেয় গার্হস্থ্য গণ্ডি। শিবেশ্বর ও মুক্তির চরিত্র তেমন স্পষ্ট না হ'লেও রচনাশৈলী অনবদ্য। এদিক থেকে তিনি সীতা দেবীর চেয়েও বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। "অলখঝোরায়" আছে সাধুভাষার প্রয়োগ। সুধার জীবনে এসেচে যে অশ্রুর অলখঝোরা, এখানে আছে তারি পরিচয়। তপনের মন দোটানায় টানা হয়েচে সুধা ও হৈমন্তীকে ঘিরে। এদিকে কিন্তু সুধার সঙ্গিনী মিলির মিলন হয়েচে সুরেশের সঙ্গে। তপন সুধাকে গ্রহণ করবে কিনা এই চিন্তায় আকুল হয়ে "নয়ান জোড়ে" ফিরে এলো সুধা আর তার গণ্ড বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। "স্মৃতির সৌরভে" সবই ভরপুর। জীবন-দোলায় গৌরীর জীবনেতিহাসই বর্ণিত হয়েচে। সমস্যাই ব্যক্তির উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গৌরীর চরিত্র বেশ ফুটেচে। একে সমস্যামূলক উপন্যাস বলাই সমীচীন। 'চিরন্তনীতে" করুণাও সুপ্রকাশের প্রণয়লীলা আবর্তিত হয়েচে। সুপ্রকাশের ভ্রমণ ও করুণার নিশ্চেষ্টতা মনোবিকলনে প্রকাশ পেয়েচে। মনায়নের স্তরগুলি রূপায়িত হয়েচে ভাষার সংযমে ও প্রকৃতির শ্যামলিমায়। লেখিকা এখানে উজাড় করে দিয়েচেন তাঁর কল্পনা ও দরদ। করুণার জীবন শতদল বিকাশে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় আছে। এ সব মিলে শান্তা দেবী পরিচয় দিয়েচেন সরস ভাষার ও মনস্তত্ত্বের। কাজেই শৈল্পিক সুষমায় সীতা দেবীর চেয়ে শান্তাদেবী বেশি এগিয়েচেন। ঝরঝরে ভাষার বিকাশে মহিলা-উপন্যাসও তাই অগ্রগতির সাক্ষ্য দেয়।

এ-ছাড়াও অনেকে লিখেচেন। তাঁদের মধ্যে রাধারাণী দেবী [ওরফে অপরাজিতা] স্মরণীয়। এঁর কবিতা উপন্যাসের চেয়ে বেশি সার্থক হয়েচে। শরৎচন্দ্রের "শেষের পরিচয়ের" সমাপ্তিটা তাঁরি লেখা। পূর্ণশশী দেবীর "পথে বিপথে" ও পুষ্পলতা দেবীর "মরুতৃষা" এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে এখানে কোন মৌলিকতার পরিচয় মেলে না। নারীজাগৃতির সাড়া হিসেবে এঁরা স্মরণীয়। বেশির ভাগ জায়গায়ই দেখা যায় পুরণো প্রসিদ্ধির অনুবর্তন। এখানকার পরিবেশ ও ফুটেচে গার্হস্থ্যচিত্রণে। এরমধ্যে Jane Austen বা Virginia Woolfe এর মতো লিখিয়ের আবির্ভাব নেই। তবে নবযুগের পূর্বাভাসই আঁকা রইল এখানে।

আধুনিক পর্ব (১৯৩০-৫২)

রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রের পর কথা সাহিত্যের যে প্রবাহ চলেচে তার বাঁকের পরিচয় মেলে 'আধুনিক' সংজ্ঞায়। ব্যক্তি ছেড়ে এ মনের অন্দরে প্রবেশ করেচে। রসিক প্রেমিক মানুষের তাই নব নব রূপান্তর। যৌন, সমাজতান্ত্রিক, মাননিক ও প্রোলেটারীয় মানুষের আবাহন হয়েচে এখানে। পাশে পাশেই বিভিন্ন ধারা ব'য়ে চলেচে। সমাজের ভাঙনধারায় এগিয়ে এসেচে এরা। মধ্যবিত্ত কেলাস খান খান হ'য়েচে ভেঙে। রাষ্ট্রিক দিক থেকে যেমন আছে নৈরাশ্য, তেমনি জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বিত্তহীনতায়। এরপর মিলেচে মানস রাজ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। সমাজ যেমন ভাঙচে, তেমনি পরমাণু ও। তাইতো ইলেকট্রন, প্রোট্রন, ফোটন ও মহাকর্ষের জায়গায় এলো নিউট্রন ১৯৩১ এর আবিষ্কারে। শুধু তাই নয় পজিট্রন, মেসন, এবং পাইয়নও। বস্তু বিশ্ব যে ভাবে ভেঙে যাচ্চে তারি ঢেউ এসে লাগলো সমাজ, রাষ্ট্র ও ভৌম আভিজাত্যে। তাই আধুনিক পর্ব হ'লো এই ভাঙনেরই ইতিহাস। এরমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ও এসে গেচে আণবিক শক্তির দানবিক লীলায়। এরি মারফতে পৃথিবী এগিয়ে চলেচে অরওয়েলের "উনিশ শো চুরাশীর" দিকে, ওয়েণ্ডেল উইল্কির "এক দুনিয়ায়", তবে দুই বিভিন্ন শিবিরে। একনায়কত্বের কর্তৃত্বই হ'লো এই ঐক্যের ভিত্তি। ফলে বিশ্বের চিন্তাধারাও এসে দোলা দিয়েচে বাংলা দেশে ও সাহিত্যে।

"কল্লোল" ই এই কল্লোলের অগ্রদূত, যা এলো দীনেশ রঞ্জন দাসের সম্পাদনায় ১৯২৩ এ। ভোগসর্বস্ব দেহবাদ যা উদগ্র যৌনতারই নামান্তর, তাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাইতো "কল্লোল' বলতে বুঝায়, "উদ্ধত যৌবনের ফেণিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।" এ আবার ভেঙে ত্রিধা হ'লো, যার আরদুটো রূপ হ'লো "কালিকলম" [১৯২৬] ও "প্রগতি" [১৯২৭] প্রথমের সম্পাদনা করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর দ্বিতীয়ের বুদ্ধদেব বসু। আর 'কল্লোলে'র পুরোভাগে রইলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক "সংহতির" [১৯২৩] ও জন্ম হ'লো মুরলীধর বসুর সম্পাদনায়। এ হ'লো "শিলীভূত শক্তি", যা শ্রমজীবিদের প্রথম মুখপত্র, "গণজয়যাত্রার প্রথম মশালদার।" এদিকে "মোসলেম ভারতের" মারফতে অবহেলিত মোসলেম সমাজেরও হ'লো অভ্যুত্থান। আর নজরুল ইসলাম গাইলেন ধূমকেতুর জয় গান, ডাকলেন অর্দ্ধচেতন সমাজকে—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিখরে,
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।

জাগিয়ে দেরে চমক দিয়ে,
আছে যারা অর্দ্ধচেতন ॥

কাজেই এখানে যে আলোড়ন এলো, তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে, এমন কি ভঙ্গি ও আঙ্গিকের প্রবেশ দ্বারেও। রচনাশৈলীর দিক থেকে, এতে এসেচে বিচিত্রিতা, যা বানানসংস্কারেও ভর করেচে।

এই যে সর্বভাঙ্গার ঢেউ, এর উৎসমূলে আছে বিদিশি ভাবধারাও। ফ্রয়েড, এলিস, প্রুস্ত, হাক্সলি, মার্কস, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বৈদেশিকীরা জুগিয়েচেন এর প্রাণ-প্রেরণা। এ সম্বন্ধে একজন আধুনিক ব্যঙ্গ রসিক তাই বলেচেন—

এলিয়ট, প্রুস্ত, হাক্সলিরা
দইমেখে যেন খায় চিড়াঁ!
লরেন্স, শ্রীগলস্ ও যাদি ও
বলে, ছুঁআজলা মুড়ি দিও ॥

নবযুগবন্দনায় তাই কল্লোলের ঢেউ এগিয়ে চল্‌লো। বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে তার বেশি বেগ পেতে হয়নি। এর আঘাতে সনাতনপন্থীরা ক্ষেপে গেলেন আর তরুণেরা বন্দনা গাইলেন! কিন্তু মজা এই, জীবন শুধু মননসর্বস্ব নয়, সেখানে দেহের নৈরাজ্যও চলে না। তাই কল্লোলীয় দেহবাদে ফুটে উঠলো এক রকমের আদর্শায়ন, যার নেই টিকে থাকবার বস্তুনিষ্ঠা। কাজেই অবাস্তবের ফাঁপা বেলুনে এ অস্বাভাবিক ভাবে ফেঁপে উঠলো। এর পরে তাই এলো মানসভাঙন যা খেয়ালী কল্পনার উল্টো পিঠ। ব্যক্তিত্ব বিধ্বস্ত হ'য়ে যাওয়ায়, ফ্রয়েডীয় চেতন-অবচেতন—অচেতনার হ'লো বিস্তার। মাননিক চিন্তাধারারও বান বইলো। অন্যদিকে সমাজভাঙনে এলো মার্কসায়ন, যা গণ-সাহিত্যের পথে এগিয়ে চল্‌লো। তবে সত্যিকার প্রোলেটারীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি, যদিও এর বনিয়াদ তৈরি হ'লো।

এই যে বিচিত্র ধারায় কথা সাহিত্য ব'য়ে চলেচে, এর প্রত্যেকের পরিচয়ের আছে প্রয়োজন। প্রথমত, যৌনবোধের যে পরিচয় দিয়েচেন চারুচন্দ্র, নরেশচন্দ্র তা আরও এগিয়ে এসেচে অচিন্ত্যকুমার ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে। বাঁদিকের চিত্রণে আছে মাণিকের কৃতিত্ব। ফ্রয়েডের অন্য ধারায়, এসেচে মননশীলতা, যার পরিচায়ক হ'লেন অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপ কুমার রায়, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদের রূপায়ণে ফুটেচে সমাজতান্ত্রিকতা। তবে এতে ভাব ও বস্তুর বিভেদই সূচিত হয় বেশি। এখানে মার্কসায়ন যেন বিদেশ থেকে ঢুকেচে বুনো হাওয়ার মতো। সত্যিকার প্রাণের স্পর্শ বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে মিতালি কর্ত্তে পারেনি। গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি দেখিয়েচেন এ-দিকটা। তৃতীয়ত, গণসাহিত্যের বিকাশ-পথ সুগম হয়েচে প্রগতির অভিযানে। গ্রাম্য চাষাভূষা, কাহার, বাগদী,

সাঁওতালদের চিত্রণে এসেচে এ-বান। তাই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এঁকেচেন এই 'আঞ্চলিক' ছবি। চতুর্থত, আঙ্গিকের দিক থেকে নতুনত্ব এসেচে জেম্‌স্ জয়েস-প্রুস্ত-ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মারফতে। এরি পরিচিতি বহন কচ্চেন নরেন্দু ঘোষ, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। পঞ্চমত, রাজনীতির রূপায়নও চোখে পড়ে। এর কৃতী লোক হ'লেন সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও আরো অনেকে। ষষ্ঠত পল্লীপ্রীতি ও ফুটেচে প্রকৃতির চিত্রণে। এ ধারার সুষ্ঠু বিকাশ আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও মনোজ বসুতে। সপ্তমত, হাস্যরসের বানও এসেচে। তবে উদ্বেলতার চেয়ে নিয়ন্ত্রণই বেশি চোখে পড়ে। রবীন্দ্র মৈত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এ ধারাকে ব'য়ে নিয়ে চলেচেন। এ-ছাড়া ছোটখাট আরো অনেক উপধারারও পরিচয় আছে, যা দেখা যাবে বিস্তারিত বিবরণে। এ-ভাবে আধুনিক উপন্যাস দাঁড়িয়েচে বর্তমানে। এর আয়ুষ্কাল কেবল কালই নির্ণয় কর্তে পারে। ভবিষ্যতে এর রস ফিকে হ'য়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাহ'লেও যুগের চিত্র হিসেবে, এ স্মরণীয় নিশ্চয়ই।

(ক) উত্তরত্রিংশ অনুপর্ব (১৯৩০—১৯৪১)

বিশ শতকের প্রথম তিন দশক নামাঙ্কিত হয়েচে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে। এর পর ১৯৩০ এ চট্টগ্রামের রক্তযজ্ঞ এলো আর দেশময় ব্যক্তিত্বভাঙার ইতিহাসই প্রকট হ'য়ে দেখা দিলো। এ মহানাটকের শিল্পী হচ্চে কাল আর ব্যক্তিরা নটনটী। তাই কালায়নে ফুটে উঠেছে এ যুগের স্বরূপ। এর পটে যে আভিনয়িক নৈপুণ্য আঁকা হয়েছে, তার চিত্রশিল্পী দলীয় লিখিয়েরা। এখানে যে আধুনিক পর্ব এসেচে, তাকে দু'টি অনুপর্বে ভাগ করা যায়। এক, উত্তর ত্রিংশ অনুপর্ব (১৯৩০-৪১); দুই; বিয়াল্লিশোত্তর অনুপর্ব (১৯৪২—৫২)। প্রথমটি অসহযোগে দেখা দিলো, যা 'কল্লোল' বিদ্রোহেরই নামান্তর। চার দিকে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'লো, এখানে যেন তারি রূপরূপান্তর ধরা পড়লো। শরৎচন্দ্রীয় প্রেমিক মানুষ কামুকে পরিণতি পেয়েচে আর এসেচে যৌনবোধের উদগ্রতা। এরপর আর্থিক শোচনীয়তার দেখা দিলো সর্বহারাদের ক্রন্দন। এ অবিশ্যি মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে এসেচে। তাহ'লেও এখানে আছে নবযুগের আভাস। সমাজতান্ত্রিক সাধনা তাই অনিবার্যভাবে হাজির হয়েচে। বাবুসংস্কৃতি ও শেষবারের মতো ধক্ করে জ্বলে উঠেচে ইঙ্গ-ভারতীয় বিলাসে। মনন এসে মাথা চাড়া দিয়েচে বাস্তবের পটভূমিকায়। ছোটখাটো হাসিঠাট্টায় কিছুটা বৈচিত্র্য এলেও, অন্ত্যজরা তাতে সুখী হয়নি। তাই তাদের উপস্থিতির পথ তৈরি হ'তে চলেচে। এরমধ্যে অবিশ্যি এসে গেলো ১৯৩৫এর 'ভারত শাসনতন্ত্র' ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। বিয়াল্লিশোত্তর অনুপর্বে আছে পরবর্তী প্রগতির সাক্ষ্য।

আঙ্গিকতাই সেখানে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। উত্তর তিরিশ অনুপর্বেও আছে বিভিন্ন ধারার পরিচয়। একে একে তাদের চিত্রণে ফুটে উঠবে এ অনুপর্বের চেহারা।

(১) যৌনস্তর

"কল্লোল" বিংশোত্তর যুগে যে আলোড়ন তুলেছিল, তা প্রধানত এগিয়েছিল যৌনবোধ ও সমাজতন্ত্রের দু'টো ডানায়। প্রত্যেক দিকেই একটা উদগ্রতার পরিচয় মেলে, যদিও সত্যিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দ্যোতনা নেই। সমাজ-ভাঙনে এ কল্লোলেই সুগম হয়েচে পরবর্ত্তী সাহিত্য পরিক্রমা। তাই এই 'কল্লোল'-দল উত্তরতিরিশে গ'ড়ে তুললো একটা ইমারতের কাঠামো. যা স্মরণীয় হ'য়ে রইলো বাংলা সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে। এখানে তাই বিচার্য এই নির্মিতির নির্মাতাদের।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—) প্রথমেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কথা। ইনি "নীহারিকা" ছদ্মনামে কাব্যচর্চ্চায় এগিয়ে, বাঁক নিলেন কথাসাহিত্যে। কাব্যায়নের প্রতিভা রূপায়িত হ'লো গদ্যভঙ্গিতে। তাই তাঁর উপন্যাস প্রধানত কাব্য-ধর্মী আর বিষয়বস্তু যৌন। এ দুয়েরি সমন্বয়ে গড়ে উঠেচে তাঁর বৈশিষ্ট্য। অচিন্ত্য কুমারের সাহিত্যায়নে বিদিশিয়ানার দু'টো ধারা আছে। প্রথম পর্বে নরওয়ের ন্যুটহামসুন ও দ্বিতীয় পর্বে রুশসাহিত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেচে। এর পরিচায়ক হ'লো অনুবাদে। তাঁর "প্যান" ও "আধুনিক সোভিয়েট গল্প" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একদিকে আছে ভবঘুরেমির উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যদিকে গণ-আন্দোলনের আমেজ। বন্ধন-ভাঙার ইতিহাসে প্রথমটি স্মরণীয়, যেমন দ্বিতীয়টি গণসাহিত্যের প্রসারে। যাযাবরের পক্ষেই সম্ভব যৌনতার প্রাণলীলা দেখান। তাই দুই প্রান্তিকে দুলেচে, যৌনজ ও গণজ দুই বিন্দু। এরি মাঝখানে আছে আরো দুটি ধারা, যাদের পরিচিতি বহন কচ্ছে সমস্যা ও মনস্তত্ত্ব। কাজেই অচিন্ত্যকুমারী উপন্যাসে ধরা পরে চারটি স্তর। এদের ক্রমবিকাশেই রূপায়িত হয়েচে তার স্বরূপ।

যৌনস্তর প্রথমেই এসেচে যৌনজবান, যার প্রকাশ ফুটে উঠেচে "বেদেতে"। এতে মিশেচে গণজ ধারাও। ফলে তাৎকালীন যুগে এ রীতিমত কল্লোল তুলেছিল, যার ঢেউ গিয়ে ছিটকে পড়লো রবীন্দ্রনাথের গায়েও। কাজেই রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হ'লো এর প্রশস্তি ও নিন্দা। এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যে মিলেচে জোলার সমাজ চিত্র, খ্যাণ্ডরের কৃচ্ছ্রসাধন ও টুর্গেনিভের স্বচ্ছবোধন। কিন্তু এ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেচে লেখকের কাব্যপ্রবণতা। অন্ত্যজদের প্রতীক হলো পাঁচা ওরফে কাঁচা ওরফে কাঞ্চন বেদে, যার প্রাণনের ইতিহাসে ফুটেচে যৌনতাবিস্তার। এ-যৌন ইতিহাসে পর্ব রচনা করেচে এক একটি স্ত্রীলোক—আহলাদি, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ী। এ বড়জে এগিয়েচে প্রেমের প্রবাহ, যা ক্রমে ক্রমে দূর থেকে নিকটে এসেচে।

কালেজি শিক্ষায় বেদে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়চে আর প্রেম কচ্ছে। আঙ্গিকের দিক থেকে শব্দচয়নের ও সাজানোর নৈপুণ্য ধরা পড়ে। এ-প্রসঙ্গে 'বাতাসী' দৃশ্যের 'রঙ্গিনী' তটের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য: "এপারে মাঠ, ওই বহুদূরের আকাশ ছুঁতে দৌড়ে ছুটেচে যেন। বিস্তীর্ণ বিশাল!" "বেদে" যাযাবরত্বে যেমন শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তের" স-গোত্র, তেমনি প্রাণনের দিক থেকে 'শেষ প্রশ্নের" স-ধর্মী। আবার গণায়নে এ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র সঙ্গে তুলনীয়। এ ধারা এগিয়েচে "আকস্মিকে" (১৯৩০), যার উপজীব্য হ'লো গণিকা জীবন। এখানে জীবনই যেন আকস্মিকের মালা গাঁথা। বিদ্রোহ এসেচে সমাজ ভাঙায়, যাতে স্থবিরতার স্থান নেই। দামিনীর হত্যা ও নিকুঞ্জের দাহন যেন এরি দ্যোতক। সমাজকে উৎখাত কচ্ছে শশী ও তাড়িখোর মাতালেরা। পঞ্চুকে পেয়ে নিকুঞ্জ পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষায় মনোযোগী হয়েচে। এখানে জীবনের ঘূর্ণিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েচে, যার উৎস যৌনবোধে। "তৃতীয় নয়নে" (১৯৩০) মিহিরের অন্ধতা বর্ণনা কাব্যধর্মী। একে কেন্দ্র ক'রে সুরু হয়েচে সীতেশ ও নৃপতির আনাগোনা। কিন্তু এ হ'লো উপলক্ষ্য, আর লক্ষ্য মিনতি-সাহচর্য। যৌন আকর্ষণই তাই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। 'নেপথ্যে' আছে অনাদির পূর্ব ও পরবর্ত্তী স্ত্রীর—চপলা ও তরলার—কথা। চপলা ম'রে গেলে ও স্মৃতিতে সে হয়েচে সজীব ও সক্রিয় আর কণ্ঠরোধ করেচে তরলার। মনোরাজ্যে জীবিত ও মৃত যেন সমান ক্রিয়াশাল। 'ছিনিমিনি' (১৯৪১) কারুণ্যমুখর। সুধা কাশীতে পালিয়ে গেচে বীরেনের সঙ্গে। পরে সে পরেশের কবলগত হয়েচে আর বীরেন খুঁজেচে সুধাকে রাস্তায় রাস্তায়, প্রাণনের ভবঘুরেমিই এখানে লক্ষণীয়। এরপর এসেচে "জননী জন্মভূমিশ্চ" (দ্বিঃ সং, ১৯৪৪)। পুত্র রঙ্গলাল আভার জন্যে জননী রাজলক্ষ্মী ও জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করেচে। যৌনজ ভিত্তিতে এগিয়েচে গল্পায়ন এখানে।

দ্বিতীয় স্তরে ধরা পড়েচে সমস্যাসংকুলতা। এখানে প্রেম ও বিবাহ এবং নারী ও মা আলোচনার ঊর্মিতে এগিয়েচে। এ হ'লো সমস্যারই বাহ্য রূপ, আর বিকাশ হয়েচে সামাজিক ঘটনায়। বাস্তবায়নে এ এগোলেও আন্তর চেহারা ততটা ফুটে ওঠেনি। তাই অবতারণা হ'লো 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'র [১৯৩১]। বিবাহের চেয়ে বড়ো যে প্রেম, এখানে তারি বিকাশ। অশ্রু ও প্রভাতের বিয়ে হয়নি বটে, তবে তাদের প্রেম বড়ো। এরি পাশাপাশি চলেচে ইন্দিরা ও নির্মলের চেহারা। জলপাইগুড়ির শিক্ষয়িত্রী অশ্রু ঝ'রে পড়েচে কলকাতার কেরাণী প্রভাতের গায়ে। বাবুবিলাসের ইতিহাসে স্মরণীয় এই মধ্যবিত্ত প্রেম, যা ইউরোপীয় সাহিত্যের আমেজে মশগুল। Donne, জয়েসের Ulysses প্রভৃতি এসেচে অনিবার্যভাবেই। এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপর যেসব মন্তব্য আছে তাও উল্লেখযোগ্য। এর পর সত্যিকার বিদ্রোহ এসেচে নারীর মাতৃরূপে, যা বর্ণিত হয়েচে "প্রাচীর ও প্রান্তরে" (১৯৩২)। দিলীপ হ'লো সীতার ঠাকুর-পে

সমস্যা স্তর

এর ছেলে হ'য়ে মারা যায়। তাই সন্তানের ডাকে এলো পুরন্দর। এখানকার সমস্যা আবর্তিত হয়েচে নারী ও মাতার দু'টো বিন্দুতে। নারী যতক্ষণ পুরুষের, ততক্ষণ সে হ'লো কারাকক্ষের প্রাচীর। কিন্তু যখন সে সন্তানের, তখন সে প্রান্তহীন প্রান্তর। একদিকে বন্ধন, অন্যদিকে বন্ধন-মোচন। পুরুষের কাছে নারীর শেষ আছে, কিন্তু সন্তানের কাছে সে নিঃশেষ, নিরন্তর। শরৎচন্দ্রের পর এ রকম নারী বিদ্রোহ বিস্ময়কর।

মনস্তাত্ত্বিক স্তর

তৃতীয় স্তরে এসেচে মনস্তত্ত্ব বিস্তার। বাহ্য ঘটনা এখানে অন্তর্মুখিনতার সমস্যার কারণ খুঁজেচে। "উর্ণনাভে" (১৯৩৩) কুবের পদ্য থেকে গদ্যে অবতরণ করেচে। জীবনে কাব্যায়ন এক রকম পাগলামি, যেহেতু "জীবনে যে কাব্য লেখে জীবন তারে দিল ফাঁকি"। প্রেমের উৎসই হ'লো নারী সাহচর্য। তাই কুবেরের জীবনে দেখা যায় বেবিকে, যার জন্যে সে "শিরা-স্নায়ুতে কবিতার কান্না শুনতে পেলো"। কিন্তু প্রেমের কবিতার চেয়ে প্রেমের উপলব্ধি আরও আনন্দের। তাই কুবের নেমে এলো কাব্য-ভূমি থেকে নারীসংস্পর্শের বাস্তবতায় এবং শেষে অভিভাবকতায়। "আসমুদ্রে" [১৯৩৪] চেতন-অচেতনার গহ্বরে প্রবেশ করেচেন লেখক। সৌম্য-শিপ্রা-বনানীর ত্রিভুজে তৈরি হয়েচে প্রেমের ঈর্ষা, স্বপ্নব্যাকুলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। শিপ্রার ঈর্ষা পরে রূপান্তরিত হয়েচে মাতৃত্বের উদারতায়। বনানী যেন অচৈতন্যের অরণ্য, যা আদিম মানুষের লীলাভূমি। "প্রচ্ছদপটে" [১৯৩৩] ফুটেচে শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ ও বিয়ে। অপত্যস্নেহ ও দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে আছে যে সংঘাত, তা আদিত্য'র মারফতে জন্ম দিয়েচে ফাটলের। ফলে প্রচ্ছদপটের মনানৈক্যই বড়ো হ'য়ে দেখা দিলো। এখানে বিশ্লেষণী-বুদ্ধি কাব্যায়নে চাপা পড়েচে। "কাকজ্যোৎস্নায়" এসেচে বিদ্রোহের জোয়ার। প্রদীপ-অজয়-নমিতা ত্রিভুজে পড়েচে উত্তেজনার ধোঁয়াটে আলো। তাই প্রদীপ ও অজয়ের উৎসাহ ও উত্তেজনা সত্ত্বেও বিধবা নমিতা ত্যাগ কর্তে পারেনি সংস্কারের কৃচ্ছ্রসাধন। কথন ও করণের তারতম্য এখানে অনিবার্যভাবেই এসে প'ড়েচে। মনায়নের দিকটা এ স্তরে দেখান হয়েচে।

গণজ স্তর

৪র্থ স্তরে এসেচে গণজ ঢেউ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে যে ভাঙন এলো তাতেই সম্ভব হয়েচে গণপ্রগতি। বিধ্বস্ত সমাজের চিত্রণে তাই স্মরণীয় লেখকের "যায় যদি যাক" (১৯৪৮)। ১৯৪১-৪৩ সালে যুদ্ধের হিড়িকে যে বোমা-আতঙ্ক এলো তাতে লোকাপসরণ চললো। বোমা, বান ও দুর্ভিক্ষে এলো ভাঙন, যাতে গোটা সমাজই ভেঙে যাচ্ছে। এ রূপায়িত হয়েচে সেবা ও সুজনের দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। রচনাশৈলী চমৎকার। এ-ধ্বংসের চেহারা ফুটেচে Yeats এর 'the centre cannot hold' এর পটে। এ রূপের পরিচয় লেখক দিয়েচেন অনবদ্য ভাষায়: "সবাই পালাচ্ছে, উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।...সব চলেচে কোন-না-কোন ষ্টেশনের দিকে, উত্তরে দক্ষিণে, পশ্চিমে পূর্বে।...চলেছে

এলোপাথাড়ি, উঠি-কি-পড়ি, মরি-কি-বাঁচি হ'য়ে"। এতো জীবনেরই রূপ। তাই এলো গণ-সাহিত্যের আমেজ "একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী" [১৯৪১]তে। গ্রামীণ সভ্যতার রূপ উদ্ঘাটিত হয়েচে প্রেমবিলাসে। হোরাঙের স্ত্রী কুড়ানি ভালবেসেচে কেশবকে। মন্দিরের কাছে তাদের হ'লো কাপড় বিনিময়। কিন্তু বাকিটা সম্ভব হ'লো না চৌকিদারের হাঁকে। কুড়ানি তাই স্বামীর ঘরে এসে তারি বিছানায় শুয়ে পড়েচে। পরদিন অবিশ্যি চ'লে গেচে তারা দু'জনেই কাজের ডাকে। কাপড়-বিনিময় একটু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। তবু বইটি স্মরণীয় গ্রাম্য উপভাষার জন্যে, যেমন "গোপ্ত অঙে রস বেশি"। এরপর "পাখনায়" বর্ণিত হয়েচে গ্রাম্য মুচি মেয়ের কাহিনী। এর উপজীব্য নারীর মাতৃত্ব, যার স্থান ধর্ম-অর্থ-কামের উপরে। নারীর জীবনের বড়ো কথা হ'লো সন্তান-প্রাপ্তি, যা দেখান হয়েচে তুফানির মাধ্যমে। এর পূর্বাভাস পাওয়া যায় "প্রাচীর ও প্রান্তরে"। নারী তার বক্ষপুটে ঢেকে রাখতে চায় নবনীত কোমল একটি দেহকে। এখানে আছে শিল্পসৃষ্টি, যা বিধাতার সৃষ্টিকে লোভ দেখায়।

অচিন্ত্য কুমারের সাহিত্যায়ন যে বিপ্লব এনেছিল তৎকালে, তা স্মরণীয় নিশ্চয়ই। এর যৌন ধারার বিদ্রোহে সমাজে যে চিড় এসেছিল, তারি রূপায়নও ফুটেচে আধুনিক ব্যঙ্গরসিকের তুলিতে—

বৈশিষ্ট্য

> অচিন্ত্যেরই চিন্তাজ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে
> ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপ নারায়ণে?

এ প্রশ্নিলতায় যুগদৃষ্টির ঝলকই লক্ষণীয়। বস্তুতঃ অচিন্ত্যকুমারের চিন্তন থাকলেও তা অনেক সময় চাপা পড়ে গেচে কাব্যায়নে। ফলে অনিবার্যভাবে এসেচে বৃত্তায়ন। একই পণ্য নিয়ে এগিয়েচে তার খেয়াতরী। বিষয়বস্তু হ'লো প্রেম যা যৌনজ। বৈচিত্র্যের অভাবই বেশি করে চোখে পড়ে। উপন্যাসের একই রূপ এনেচে এক রকমের এক-ঘেয়েমি। প্রেমই জুগিয়েচে লেখকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তাই এতে খেয়ালীপনার ঢেউ যেমন ভেঙে পড়েচে নরনারীর জীবনে তেমন হয়নি গণসাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যদিও গণবিলাস লক্ষণীয়। সমস্ত উপন্যাসের সুর ধ্বনিত হয়েচে তাঁরি কথায়ঃ "কামনার কূপে বন্দী মাগিছে সুন্দর-অনুরাগ"। যা কিছু সৌন্দর্য বা সংস্কৃতি তার ভিত্তিক কাঠামো তাই যৌনজ। কাব্য শিখর থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণে কুবেরের মতো অচিন্ত্যকুমারেরও হয়েচে রূপান্তর। এ গন্তভূমির বাসিন্দারা তথাকথিত অন্ত্যজরাও। কাজেই সমাজ-প্রগতির চিহ্ন এখানে পরিস্ফুট। লেখকের কবিত্ব মিশেচে গল্পায়নে। তাই গাল্পিকতা নিজের পায়ে দাঁড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে ভাবোন্মাদনা জয়ী হয়েচে মননের চেয়ে অনেক জায়গায়। তা হ'লেও স্মরণীয় হ'য়ে রইল লেখকের প্রগতিশীলতা আর কাব্যিক গল্পায়ন।

কাব্যের খেয়ালে যিনি গল্পায়নে হাত দিয়েছেন তিনি হ'লেন বুদ্ধদেব বসু। অচিন্ত্যকুমারও কাব্যজ গল্পলিখিয়ে। তবে শেষপর্যন্ত তাঁর প্রতিভায় একটা দ্বীপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা গদ্যের কঠিন ভূমিতে

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—)

খাঁড়া হ'য়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের তা হয়নি। গল্পায়নের চেয়ে কাব্যায়নই তাঁর কাছে জয়মাল্য পেয়েছে। তাই অচিন্ত্যকুমারে যেখানে রূপ ফুটে উঠেছে, বুদ্ধদেবের সেখানে সুর বেজেছে। অবিশ্যি রূপহীন সুর ও সুর-ছাড়া রূপের কল্পনা একটু কষ্টসাধ্য। তা হ'লেও স্থূলায়ন ও সূক্ষ্মায়নের হিসেবে রূপ ও সুর উল্লেখযোগ্য। এই সুরের বিকাশ তাই কাব্যে, যার শরীর হ'লো রহস্য। 'কল্লোলে' বুদ্ধদেবের 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাই আন্‌লো এই সুরের কল্লোল, যেমন আন্‌লো তাঁর গল্প, 'রজনী হ'লো উতলা'। এরপর এই সুরের স্বরূপই চেনা গেল— এ হ'লো 'প্রগতি' [১৯২৭] যার মধ্যে 'কল্লোলে'র বীজ কাজ করেছে। তাই "জাগ্‌লো সাড়া [১৯৩০] বিশ্বময়, এ-বাঙালী নিঃস্ব নয়"। এ এলো অবিশ্যি প্রেমের ডানায়, যার ভিত্তি কামজ। রহস্যের রঙিন কাচে নায়ককে দেখা গেলো: "মন উড়ু-উড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু, ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক"। প্রাণের গোটা লীলা শ্লীলতার গণ্ডিতে প্রকাশ পেতে পারে না। তাই তাকে খুঁজতে হয় রহস্যের অসীম অকাশ। কাজেই এলো 'বর্ত্তমান সময়ের রোমান্স', 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' [১৯৩২] যা বাজেয়াপ্ত হ'লো অশ্লীলতার জন্যে। সত্যি সমাজ অতটা খেয়াল বরদাস্ত কর্তে পারে না। বিদিশি সাহিত্যের থেকে যে প্রেরণা এলো তার মাধ্যম হ'লো A Huxley, D. H. Lawrence ও James Joyce। এ সব ভাবের ঢেউ ভেঙে পড়েছে 'অকর্ম্মণ্য' [১৯৩২], 'মন-দেয়া-নেয়া' [১৯৩২], 'যবনিকা-পতন' [১৯৩১] ও 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছে' [১৯৩২]। আক্ষরিক অনুবাদে জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায় কুণ্ঠিলকতার পরিচয়ও। বোঝা যায়, লেখক রহস্যপরিক্রমায় বিশ্বকে করেছেন সঙ্গী। এরপর এলো 'সানন্দা' [১৯৩২], যা আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে গ'ড়ে উঠেছে। বাস্তবের ছাপ কিছুটা মেলে সাহিত্যিক ভক্তের ব্যঙ্গে। বীরেন পাকড়াশীর ভক্তি-উদ্বেলতাই এ-ব্যঙ্গের লক্ষ্য। এখানে অবিশ্যি এসেছে "একটা ঢঙ, একটা attitude—আজ কালকার দিনে যেটার বাজার খুব চল্‌তি"। এ স্মরণ করিয়ে দেয় Byronic pose বা বায়রনায়নকে। এ পর্বের শেষ হয়েছে 'আমার বন্ধুতে' [১৯৩৩]। এখানে গদ্য ও বাস্তবায়ন এসে ধাক্কা দিচ্ছে রহস্যের দ্বারে।

কিন্তু রহস্য তো একেবারে অনাবৃত করা যায় না। তাই এ আশ্রয় নিলো যৌবনের জোয়ারে, যা কামনার ওঠা-পড়ায় এগিয়ে চলে। "যেদিন ফুটলো কমল" [১৯৩৩] এই যৌবন ফোটার ইতিহাস। বর্ষার উপলব্ধিতে এসেছে অনুভূতির স্পন্দন। গোটা আবেষ্টনী এখানে কাব্য হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে বর্ষার ঝর্ঝরে, যৌবনের উদ্বেলতায়। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমের কামজ প্রেম রহস্যের খেয়ালে বাস্তবতার দরজায় এসে পড়েছে। এখানে স্বামী শুধু শাশ্বত নর ও চিরন্তন নারী এবং এদের যৌন সম্পর্ক। এ একদিকে যেমন লেখকের প্রতিভার স্ফুরণ অন্যদিকে

তেমনি যৌনজ প্রেমের ফুটে-ওঠা। এরি দ্যোতনায় এসেচে "হে বিজয়ী বীর" [১৯৩৩]। এরপর সাংকেতিকতায় এগিয়েচে "ধূসর গোধূলি" [১৯৩৩]। এখানে প্রেমের বিজয়যাত্রা একটু থমকে দাঁড়িয়েচে আর গল্পায়নের গতিও স্থাবর হয়েচে। এ একখানা ত্রাঙ্ক নাটক য'র পর্বগুলি গড়ে উঠেচে অর্চনাদি, মায়া ও কল্যাণকুমার নিয়ে। এখানে কাব্যের সোনালি পাড়ে গাঁথা হয়েচে চরিত্রের ফুলঝুরি। মায়াকে ভালবাসলেও, তাকে বিয়ে করবার সৎসাহস নেই নীলকণ্ঠের। শুধু অনুভূতিই ঝরে পড়চে এখানে "আমার আর মায়ার ভালোবাসা—তাতে এতই সূক্ষ্ম আলো-ছায়ার টানা পোড়েন, যে ভাষার জালে তাকে আটক করতে আশা করতে পারিনি।" বিরহেই যৌবন এখানে স্মৃতি-ধূসর ও স্থবির। "অনেক রকম" [১৯৩৩] একখানি নাট্যোপন্যাস, যা আঙ্গিকের দিক থেকে স্মরণীয়। এখানেও রহস্য ও বাস্তবের বোঝা পড়া চলেচে; কিন্তু কোনো সমন্বয়ে পৌঁছুতে পারেনি। মনস্তাত্ত্বিকতা তাই অনিবার্যভাবেই এসে গেচে "অসূর্যম্পশ্যায়" [১৯৩৩]। প্রকৃতি ও মানুষের সহযোগিতায় প্রেমের উপস্থিতি সত্যি চমৎকার। দার্জ্জিলিঙের কুয়াশা-ঘেরা পরিবেশে প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েচে সরমার কাছে। রহস্য-রূপোলি এ-আবির্ভাব। বাস্তবের রুক্ষভূমিতে এ এখনো অবতরণ কর্তে পারেনি। কল্পনায় এখনো প্রতিভার পরিক্রমা চলেচে। তাই স্মৃতিরোমন্থনে এসেচে "একদা তুমি প্রিয়ে" [১৯৩৩], যা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রূপায়িত। প্রেমের পূর্বস্মৃতি দুর্ম'র। এ ভর করেচে রেবা ও পলাশকে। স্মৃতির রকমফেরে দু'টো রূপই ধরা পড়ে। পূর্বস্মৃতির সূত্র ধ'রে রেবা 'পেতে চাইচে নতুন প্রেমের আস্বাদ আর পলাশ এ থেকে পালাতে চাইচে। পলাশের কাছে এ হলো বিভীষিকা: "জেগে-উঠচে অন্তরের চিরন্তন নিঃসঙ্গতা, চিরন্তন বিরহ, যখন আমরা উন্মোচিত, উদ্ঘাটিত উন্মথিত।" "সূর্যমুখী" [১৯৩৪] তে তাই সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। প্রেম যখন সূর্যমুখী, তখন মিহির পূর্ব স্ত্রী মৃণালকে ভুলে নতুন নারী তাপসীকে নিয়ে ঘর কর্তে পারবে কিনা, এই হ'লো এখানকার সমস্যা। সবি কবিত্বময় বর্ষার "বৃষ্টি-ঝরিয়ে দেয়া, রোদ-ছড়িয়ে দেয়া, সন্ধ্যার দিগন্তে রঙে রঙে জ্বলে ওঠা" রূপের বিন্যাসে। "পরস্পরে" [১৯১৪] ভাইবোনের প্রেমানুভূতিই বর্ণিত হয়েচে। অশান্ত চাইচে বানীকে, যেমন তার বোন মালতী চাইচে বিমলকে। পারস্পরিক যৌন আকর্ষণই উপন্যাসের বনিয়াদ। মাঝে মাঝে কল্পনা-পাখী উড়চে রহস্যের আকাশে, যেমন "রূপালি পাখী"তে [১৯৩৪]। তার পর এ "নীলমেঘ" [১৯৩৪] পেরিয়ে "বাড়িবদল" [১৯৩৫] ক'রে পেয়েচে "বাসর ঘর" [১৯৩৫]। এরপর "পরিক্রমা"-র [১৯৩৮] স্বরূপ ফুটেচে "পারিপারিক" [১৯৩৫] পটে। এখানকার লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'লো প্রেমবর্ণনা, যার নব নব রূপান্তর ধরা পড়েচে। বাস্তবের পথে এ এগিয়েচে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠা এখনো পাকা হ'য়ে উঠেনি। তাই অপেক্ষা কর্তে হয়েচে উত্তর-চল্লিশ কালের জন্যে।

তৃতীয় পর্বে বাস্তবায়ন আরো এগিয়েচে। জীবন এসে মিতালি করেচে রহস্যের সঙ্গে। সুর রূপ ধরেচে এখানে। তাই তো "কালো হাওয়ার" [১৯৪২] আবির্ভাব। গন্ধভূমি তো আর রূপালি নয়। এই বস্তুনিষ্ঠার জন্যেই "কালো হাওয়ার" নাট্যরূপ সম্ভব হয়েচে "মায়ামালঞ্চে" (১৯৪৪)। মহামায়ার স্পর্শে অরিন্দমের সংসারটা কেমন ক'রে ভেঙ্গে গেলো, এখানে আছে তারি পরিচয়। অরিন্দম স্ত্রী হৈমন্তীর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল, বৌমা উজ্জ্বলা হারাল তার ছেলেকে, বুলি চ'লে গেল নিরঞ্জনকে বিয়ে ক'রে। রইল শুধু হৈমন্তী, মিনি ও অরুণ, যাদেরকে ঘিরে আবর্তিত হ'লো মহামায়ার খেলা। গল্পায়ন এখানে কতকটা সাবলীল। পিস্তলের গুলি আকস্মিক হ'লেও অস্বাভাবিক নয়। এর জন্যে আছে পূর্ব প্রস্তুতি। শেষের দিকে অরুণ ও মহামায়ার সম্পর্ক যৌনজ হয়েচে। গ্রীকনাট্যের অভিশাপের মতো মহামায়ার কালো হাওয়া কাজ করেচে অরিন্দমের সংসার-ভাঙায়। এরপর "জীবনের মূল্য" [১৯৪২] পেয়েচে স্বীকৃতি। "অদর্শনার" [১৯৪৪] পরে বস্তুনিষ্ঠা এসেচে "বিশাখায়" [১৯৪৫]। অশরীরী এখানে শরীরী হয়েচে। এ বাস্তবায়নের পরিণতি এসেচে "তিথি ডোরে" [১৯৪৯] যা ৩টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম পর্ব হ'লো "প্রথম শাড়ি : প্রথম শ্রাবণ" ; দ্বিতীয়, "করুণ রঙিন পথ" তৃতীয়, "যবনিকা কম্পমান"। পিতা রাজেনবাবুর প্রথম কন্যা শ্বেতার বিয়ে হ'য়েচে। তার পর রাজেনবাবুর স্ত্রী শিশিরকণার গর্ভে এলো স্বাতী, যা'কে নিয়ে গড়ে উঠেচে এ-উপন্যাস। ৩টি খণ্ডে স্বাতীর জীবনের বিয়ে-পূর্ব ৩টি পর্ব উন্মোচিত হয়েচে। গল্পের পরিসমাপ্তি এসেচে সত্যেনের সঙ্গে স্বাতীর বিবাহে। বাসর-ঘরই এ পরিণতি। এখানে কাব্য থেকে বুদ্ধদেব নেমেচেন বাস্তবের গন্ধভূমিতে। ভাষাও পূর্বজ বর্ণিলতা হ'তে অনেকটা দূরে এসেচে। তাই বাস্তবায়নে সন্ধ্যার সিঁদুর রং হ'লো ইঁদুররং, আকাশটা যেন বিধবার কপাল। আর বাসর ঘরে দেখা গেল "টান, ছুটো প্রাণ, জীব, হৃৎপিণ্ড ; দূরে, পারে, পর পারে , হ'য়ে-যাওয়া, না-হওয়া, হ'তে থাকা, চিরকালের ; আকাশ ভরা স্তব্ধতারা তাকিয়ে থাকলো।" এখানে ভাষা-ভঙ্গি জয়েসের 'ইউলিসিসে'র মতো। একটানা প্রবাহ চলেচে এলোমেলো শব্দের আমদানিতে। শব্দ কিন্তু এলোমেলো হ'লেও ব্যঞ্জনাজ্ঞাপক।

বৈশিষ্ট্য

বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিষয়বস্তু হ'লো কামজ প্রেম ও রূপজ মোহ। আঙ্গিকের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হ'লো আত্মজৈবনিক "সানন্দা" নাট্যোপন্যাস "অনেক রকম" ও মনস্তাত্ত্বিক "একদা তুমি প্রিয়ে"। ফ্রয়েড-এলিসের হীরার হাড় জুগিয়েচে এর উপাদান। তবে এতেও আছে বাবুসংস্কৃতির স্বকীয়তা যার মারফতে এসেচে লেখকের নিজস্বতা। সমাজ চিত্র হিসেবে এখানে বাবু-বিলাসই চোখে পড়ে। অন্ত্যজদের চেহারা তেমন ফোটেনি, বুদ্ধদেব একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক। কিন্তু কবিতার চেয়ে তিনি গল্প-উপন্যাসকে একটু নীচের আসন দেন। এর ফলে গল্পায়ন ও চরিত্রায়ণ তেমন খোলেনি। লেখক নিজেই

বলেচেন "খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই। আমার উদ্ভাবনীশক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে। এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাবেশ মুখে বলে দেয়া যায় না। এমন গল্প লিখেচি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না। পাত্র পাত্রীর আলাপে আলোচনায় মনের অব্যক্ত চিন্তাধারায় অনেক পাতা ভরিয়েছি"। কাজেই কাব্যধর্ম্মী উপন্যাসই হ'লো বুদ্ধদেবের বিশিষ্টকীর্ত্তি, যেখানে অনুভূতির উপলব্ধিই তীব্র। যার ভাষায় আছে নতুনত্ব, যা টলমলো, ঝলমলো। দৃশ্যবর্ণনায় এ ভাষা বিশেষ উপযোগী। তাই যৌনবোধ উদ্দীপনে ও কাব্যিক ভাষায়নে লেখকের কৃতিত্ব অসামান্য।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭—)

বুদ্ধদেবের কাব্যায়ন গাল্পিকতায় রূপ ধরেচে অচিন্ত্যকুমারে। আর প্রবোধকুমার সান্যালে এ ব্যাপ্ত হয়েচে অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে। ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে জীবনায়নই এনেচে এ চিত্রশালা, যেখানে জড় হয়েচে "সুন্দর অসুন্দর—মানুষের প্রেমের পুলক, আরণ্যিক লালসার উন্মাদনা, জরাজীর্ণ জীবনের বীভৎস ফাটল, বুভুক্ষিত মানুষের নারকীয় রূপ"। এর পেছনে আছে যে বস্তুনিষ্ঠা তা তাঁকে নিয়ে গেচে "ষ্টীমারঘাটে, চটকলের ধারে, রেল ষ্টেশনে, বিদেশের ধর্ম্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায়"। এর ফলে সাহিত্যের কথা-বস্তুর হয়েচে প্রসার, যেখানে ভিড় করেচে মজুর, জেলে রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে' প্রভৃতিরা। জীবনের অবহেলিত দিকটাই এখানে উদ্ঘাটিত হয়ে সমাজ-প্রগতির সাক্ষ্য দিচ্চে। এতে সম্ভব হয়েচে সাহিত্যের প্রগতিও। কিন্তু এ সমাজের ভিত্তি তো কামজ প্রেম, যা নর-নারীকে বেধেচে প্রাণ-প্রবাহে। তাই প্রবোধকুমার চালিত করেচেন অসুন্দরকে সুন্দরের পথে, জীবনকে ভাবনার দিকে আর বুদ্ধিকে আবেগের দোলনে। কাজেই জীবন আবেগে দুলে উঠেচে। ফলে বস্তুকাঠিন্য যেমন গ'লে পড়েচে প্রাণনে, তেমনি 'বুদ্ধ-অচিন্ত্য'র ভাবোচ্ছ্বাস ও নিয়ন্ত্রিত হয়েচে। কিন্তু ছন্নছাড়া বাউলের উদাস সুরে জীবনের একতারা বাজলেও আসেনি শোকান্তিকা। "বিচ্ছেদ আছে প্রবোধের কাছে, কিন্তু বিয়োগ নেই" যেহেতু "রমতা সাধু আর বহতা জল কখনো মলিন হয় না"।

অচিন্ত্যকুমারের যেমন প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস "বেদে" ও বুদ্ধদেবের "সাড়া" (১৯৩০), তেমনি প্রবোধকুমারের হ'লো "যাযাবর" [১৯২৮]। কবিত্বময় বর্ণনায় এঁরা তিনজনই সমধর্মী। এখানে কথন ভঙ্গি আত্মজৈবনিক, যা "বেদে"ও "সাড়া" থেকে একটু আলাদা ধরণের। এ সে যুগে যে কল্লোল তুলেছিল, তা স্মরণীয় হয়েচে "শনিবারের চিঠির" রসিকতায়: "একজন বলছেঃ বে দে, আর অমনি আরেকজন বলে উঠছে যা, যা বর"। যৌনজ যোগসূত্র যে দুয়ের পরিচায়ক এখানে তাই ফুটে উঠেচে। যাযাবর এগিয়েচে সভ্য সমাজের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে; কিন্তু তবু

যাযাবরত্ব ঘোচেনি। এ "শ্রীকান্তে"রই রকমফের। একটানা একঘেয়েমিতে বয়ে চলেচে জীবনপ্রবাহ। তবে মাঝে মাঝে ঊর্মিলতা এসেচে আবেগের ডানায়। এর পর "কলরবে" সত্যিকার যে কলরব তুলেছিল, তার পরিচিতি বহন কচ্চে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা: "তার রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা কর্তে হ'লো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনোটাকেই মনে হয় না বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট ক'রে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।" এ মধ্যবিত্ত ভাঙন ধারায় এগিয়েচে। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় উঠেচে কত না সুখদুঃখের ছোট খাট ঢেউ। সমাজভাঙনে মধ্যবিত্তদের অবস্থা শোচনীয় হয়েচে। আত্মসম্মানকে "বজায় রাখিয়া চলা তাহাদের জীবনের কঠিনতম সমস্যা।" কাজেই "কলরব" সমাজচেতন ও যুগধর্মী। এখানে তাই শ্রেণীসংঘাত ফুটে উঠেচে: "এ জানালাটি তাকাইয়া থাকে ও জানালাটির দিকে। এ করিয়াছে সুন্দর জীবনের তপস্যা, ও করিয়াছে আত্মহত্যার দিন-গণনা।" বেদনার দ্রাবকরসে সঞ্জীবিত হয়েচে দামিনী, বীনা শঙ্কর প্রভৃতি পাত্রপাত্রী।

মধ্যবিত্ত ভেঙে যাচ্চে ঠিকই আর তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্চে শ্রেণীর রূপ। তা হ'লেও জৈবলীলাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। এ আছেই এবং চলেচে, প্রাণনের পাখায়। এরি আবহাওয়ায় দেখা দিয়েচে 'নবীন যুবক,' 'তরুণী সঙ্ঘ,' 'অবিকল', প্রভৃতি। ভাঙনের প্রান্তিকে জেগেচে 'দুই আর দু'য়ে চার'। দিল্লীর ভিতর যে সভ্যতার শ্মশান লুকিয়ে আছে এখানে তাকে টেনে বের করা হয়েচে। এ ছবিতে দেখা যায়—"মহানগরী দিল্লী ..শ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমরত্বের বিদ্রূপের মত কুতব-মিনার...জরাজীর্ণ কঙকালখানির ওপর চলেচে প্রলেপ, আধুনিক সংস্কার।" এখানে প্রাকৃতিকতার সঙ্গে সঙ্গেই চলেচে পলায়ন। রমাপতি স্ত্রীপুত্র থাকা সত্ত্বেও সবিতার সঙ্গে প্রেমে পড়েচে ও শেষে স'রে গেচে। রমাপতির দুঃখ এলো যখন সে দেখলো তার পুত্র টুটু গণিকালয়ে যাচ্চে। এখানে শোকান্তিকার পৌরুষ নেই, আছে এক রকমের মীইয়ে-পড়া কারুণ্য। প্রাণন মাথা খাড়া করেচে এখানে সমাজ-ভাঙনে। যৌনতত্ত্ব নিয়ে লেখা হয়েচে প্রিয় বান্ধবী', যেখানে বন্ধুত্বের ইন্দ্রজালে আঁকা হয়েচে নরনারীর সংসর্গ। ভবঘুরে জহরের সঙ্গে স্বামী-তাড়ান সুখলতা ওরফে শ্রীমতীর যে সম্বন্ধ তা নিছক বন্ধুত্বের। কামজ লালসা এখানে অনুপস্থিত। দু'জনের ছাড়াছাড়ি হ'লো উদ্গতির পথে। শ্রীমতী হ'লো ব্রহ্মচারিণী আর জহর বাউল। শুধু বুদ্ধিই এর উপজীব্য নয়; এতে মিশেচে প্রাণনের আবেদনও। ভবঘুরেমির এ আরেক পর্যায়। সংলাপ বেশ ফুটেচে ঝাঁঝাল ভাষায়। এর উদাহরণ—(১) "সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ বর্বরতার মধ্যে," (২) "যাহারা ধার্মিক নয়, তাহারা ধর্মভীরু"। 'অগ্রগামীতে' ও [১৯৩৬] পরীক্ষা চলেচে প্রাণন ও মননের। মায়ালতা-সুরপতির ঘরছাড়া প্রেমে মিলেচে অমরেশের মাতান কবিত্ব আর সুরেশেবাবুর যৌন ব্যাকুলতা। চিন্তনের শক্ত মাটিতে এরা কেউই শিকড়

গাড়তে পারেনি। অসংলগ্ন দৃশ্যের সংযোজনায় এসেচে চিত্রলতার ঐক্য। যাযাবরত্বেরই হয়েচে জয় জয়কার। সবটা জড়িয়ে যে নীড় রচনা চল্‌তে পারে, এখানে নেই তার কোন ইঙ্গিত। 'আঁকাবাঁকায়' [১৯৩৮] যৌনবোধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েচে। কাজেই এ অগ্রগতির সাক্ষ্য এ-ধারায়। এখানে নরনারীর সম্পর্ক রক্তমাংস ছেড়ে প্রাণের প্রাণনে পৌঁছেচে। কঙ্করকুমার ও মীনাক্ষী হ'লো এই শাশ্বত নর ও শাশ্বতী নারী। ভবঘুরেমির উলঙ্গ বিহার এসেচে দেহ-দুনিয়ায় ও মনোজগতে। বন্য আদিমতার অভিযানে লোপ পেয়েচে লজ্জা সরম, উড়ে গেচে সংস্কারের শাড়ি। এ বিদ্রোহের ঝড় এলো

বাঙালী গৃহ-বধূর আঙিনায়।
আর তার সঙ্গে আমাদের ছাদের পাঁচিল থেকে
উড়ে গেলো কাপড়গুলি।
তরুণীর পরিচ্ছন্নকৌমার্যের প্রাঙ্গণে
সহসা এসে পড়লো শেষ বসন্তের একটি ঝরাপাতা।

প্রাণনের গতিই যে আঁকাবাঁকা, এখানে তাই দেখান হয়েচে। এরি পরিচয় দেওয়া হয়েচে "জল আর আগুনে," যেখানে বীরু ও রাণুর প্রেম গড়ে উঠেচে। এ হ'লো খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোনের যৌন সম্পর্ক। বংশানুক্রমে চলেচে এ-ধারা। রূপকের চমকে ঝলসে উঠেচে এ দীপ্তি।

যৌনজ প্রাণন মাথা খাড়া করলেও, তাকে আদর্শায়িত করেচেন লেখক আদর্শায়নে। তাই তিনি "চাঁদের আলোর চশম," ছেড়ে ব্যবহার করেচেন "প্রখর দিনের আলো"। তার সাহিত্যে কলাকৈবল্যের স্থান নেই, আছে কেবল জীবনানুগ কলাবৈভব। কাজেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবোধকুমার এগিয়েচেন সাহিত্যচর্চায়। এর স্বরূপ তাঁর কথায় প্রকাশ করা যায়: "আমি কোনো প্রণয়-কাহিনী ভাবতেই পারতুম না। আমার ভাল লাগতো ভাই, বোন, বন্ধু, আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগী—ওতেইআমি আনন্দ পেতুম। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে, তবে গল্প লিখে লাভ কি?" এ সত্ত্বেও বলা যায় তাঁর রচনা উদ্দেশ্য-সর্বস্ব হয়নি। প্রণয়কে তিনি নিয়ে গেচেন প্রাণভূমিতে আর তা নিয়ে তান্ত্রিক সাধনা করেচেন। ছন্নছাড়া ভাবে রূপায়ণ এসেচে এ প্রাণলীলায়। যৌনতা থাকলেও, তার নেই উদগ্রতা। বাস্তবকে আবেগের দোলায় আনন্দ পরিবেশন করেচেন তিনি। মাঝে মাঝে চিন্তনের অনুপ্রাস থাকলেও, আবেগের কবিত্বই বেশী। ফলে অনেক জায়গায় সংহতির অভাব-বোধই চোখে পড়ে। ভাঙা ভাঙা শব্দ যোজনায় আছে অবচেতনার পরিচয়। এর মূলে যেমন আছে মধ্যবিত্তদের যাযাবরত্ব, তেমনি ফ্রয়েডীয় মনো-বিকলনও। চেতনার পটে অচৈতন্য যে দাগ কেটেচে তারি রূপায়ন আছে শব্দায়নে। কাজেই শব্দ শিল্পও অনুপেক্ষণীয়। একদিকে চলেচে ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্যদিকে ফুটেচে প্রকাশের প্রয়োগ-শিল্প। এ দুয়ের সমন্বয় দিয়েচে লেখককে প্রতিভার জয়তিলক।

ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে যৌন সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় [ওরফে প্রবোধ কুমার বন্দ্যো]। তাঁর প্রথম গল্প "অতসী মামী" "বিচিত্রায়" বেরোয়। চরিত্র আঁকবার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। এতে ফুটেচে "মানসিক অভিজ্ঞতা"। জানবার কৌতূহল তার কাছে দুর্মর। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেচেন—"বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দান না থাক—যতক্ষণ সেটিকে তুলো ধুনো না করে ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পরিণত করার মত পরিণত করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই।" তাই মাণিকের রচনায় মিশেচে একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, অন্যদিকে সাহিত্যিক রস-বোধ। এ দুই-ই এ-যুগের প্রচলিত যুগধর্ম। মাননিক অবলোকনে ধরা পড়েচে "চাষী, মাঝি, জেলে তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ।" মধ্যবিত্ত ও চাষা ভূষো যে ভাষা চাইচে লেখক তা জুগিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রবিশ্যি এ-উপলব্ধিকে পাঠককেও পাইয়ে-দেয়া। এই প্রেরণায় তিনি কলম ধরেচেন আর বাস্তব রূপায়িত হয়েচে মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণে। অচৈতন্যের প্রতিক্রিয়ায় মানসে ফুটেচে আজগুবি, উদ্ভট চরিত্র যার অঙ্কনে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কৌশলও ধরা পড়েচে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯০৮—)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে আছে স্তর বিন্যাস। প্রথম স্তরে রূপক; দ্বিতীয় স্তরে সমস্যা; তৃতীয় স্তরে গণসাহিত্যের আভাস। রূপকে প্রকাশ পেয়েচে "দিবারাত্রির কাব্য" [১৯২৯], 'পুতুল নাচের ইতিকথা" [১৯৩৬], "চতুষ্কোন" ও "প্রতিবিম্ব" [১৯৪৩]। বাস্তব ও আদর্শের বোঝাপড়াই রূপকে রূপ ধরেচে। "দিবারাত্রির কাব্য" "মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ" নিয়ে গ'ড়ে উঠেচে। চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের কেউ নয়। এ উপন্যাসের ৩টি পর্ব আছে। "দিনের কবিতায়" হেরম্ব সুপ্রিয়ার টানে এসেচে তার কাছে। হেরম্বর স্ত্রী এর আগে খুন হয়েচে। তাই তো এখানে "স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়, গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে।" "রাতের কবিতায়" "মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে প্রেম তার মহামুক্তি।" শোকের মধ্যেই প্রেম চিরন্তন হয়। তাই মালতীর মেয়ে আনন্দের সঙ্গে হেরম্ব প্রেম কচ্চে। এখানে নেই প্রেমের উপলব্ধি। "দিবারাত্রির কাব্যে" হেরম্ব দুলেচে সুপ্রিয়া ও আনন্দের দোলায়। তাই তো কাব্য উৎসারিয়ে উঠেচে: "নদী স্রোতে চলেছি ভাসিয়া মোর সব ভবিষ্যৎ-ভরা ব্যর্থতার পরপারে।" সুপ্রিয়া স্থূল আর আনন্দ সূক্ষ্ম। আনন্দ'র চন্দ্রকলা নৃত্য প্রেমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই নামান্তর। পরিপূর্ণ প্রেমের দাবী মিটাবার শক্তি আছে যৌবনের আর তাও একবার। রূপকের সহায়তায় মনস্তাত্ত্বিকতা প্রকাশ পেয়েচে। "পুতুলনাচের ইতি কথায়" অপ্রাকৃতের সন্ধান মেলে মনোবিকলনে। তাই কাহিনীর প্রারম্ভ সূচিত হয়েছে লেখকের লেখায়: "শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুক্ত অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" তাই সবি নিয়ন্ত্রিত হচ্চে অচৈতন্যের লীলায়। প্রেমের আকর্ষণই পুতুল নাচের কারণ। কাজেই পুতুলগুলি

হ'লো কুসুম-শশী. বিন্দুর দাম্পত্য জীবন ও কুমুদ-মতির পূর্ব-রাগ। সব সমস্যার কেন্দ্রই হ'লো যৌন আর এ-কেন্দ্রক ঘিরে চলেচে বৃত্তায়ন। তাই তো প্রাণের স্পন্দনে মতি ও কুমুদের যে যাযাবর জীবন এসেচে তা "পুতুল নাচের ইতি কথায়" "প্রক্ষিপ্ত".। "চতুষ্কোণে" "লিবিডো"র ৪টি কোণই উদ্ভাসিত হয়েচে। এরা ক্রিয়াশীল হ'য়েচে রিনি, মালতী, সরসী ও কালীর মাধ্যমে। প্রত্যেকেই রাজকুমারকে চাইচে। আর রাজকুমার শুধু জাতিরূপের দ্যোতক নয়। তার "মধ্যে অনেক রূপ দেখার চেষ্টা" করা হয়েছে। "প্রতিবিম্বে" বিম্বিত হয়েছে মনোজিনী-সীতানাথের যৌন সম্পর্ক। অবিশ্যি এর পটভূমিকা হ'লো কংগ্রেসের ভ্রান্তি দেখানো। রাজনীতির প্রতীক হ'লো তারক। দলের যেটা বাহ্য প্রকাশ বা মতবাদ তার নিয়ামক হ'লো নর-নারীর আকর্ষণ। রূপকের অস্পষ্টতা আলো-আঁধারিতে এগিয়ে এসেচে। এর পর এলো পুরনো প্রত্যয়ের বিপর্যয়।

দ্বিতীয় স্তরে এসেছে সমস্যাসংকুলতা, যার ভিত্তি হ'লো বাস্তব। এ ধারার বাহক হিসেবে স্মরণীয় হ'লো "জননী" [১৯৩৪], "অহিংসা" ও "অমৃতস্য পুত্রাঃ" [১৯৩৮]। এক একটি আদর্শই এখানে রূপ ধরেচে পাত্র পাত্রীর রক্ত মাংসে। "জননী" উপন্যাসে প্রিয়ার পরিবর্তন হয়েচে মাতৃত্বে। কিন্তু এ বিকাশেরও আছে স্তরবিন্যাস। প্রথম শিশুর জন্মকালে শ্যামা দেখেচে যৌবনের শেষ রশ্মি আর দ্বিতীয় শিশুর অভ্যাগমে মাতৃত্বের দায়িত্ব। এই ক্রম পরিণতিতে গৃহিনীপনাও এসেচে অনিবার্য-ভাবে, যেহেতু স্বামী শীতল খেয়ালী। এই মাতৃত্ব-বিকাশ ও গৃহিনীপনা থেমেচে যখন পুত্রবধূও মাতৃত্বে রূপান্তরিত হয়েচে। মনস্তাত্ত্বিকতার মানদণ্ডই এখানে মূল্যায়নে সহায়তা করেচে। "অহিংসার" ভণ্ডামি ও ধর্মোন্মাদ কুয়াশার মতো ঢেকে ফেলেচে চরিত্রচিত্রণ। তবে যৌনায়ন বাদ পড়েনি এথেকে। এরপর "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বীরেশ্বরের পরিবারে যৌন সমস্যা কিভাবে আন্দোলিত হয়েচে তারি কথা বলেচে। তরঙ্গ, শঙ্কর ও অনুপম পরস্পর ভাই বোন। তা হ'লেও তাদের মধ্যে এসেচে যৌন বোধ। এখানে কোন শৈল্পিক সংহতি নেই। গোটা গল্পায়ন এক উদ্ভট কল্পনায় আবর্তিত হয়েচে। এখানে বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় মেলে।

তৃতীয় স্তরে আছে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'সহরতলী' (১৯৩৯)। এ হ'লো গণজ সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রথমটি সাধুভাষা ও লৌকিক কথ্যভাষায় রচিত হয়েচে। পদ্মার ভাঙাগড়ায় মানসিক ভিৎও টলে যায়, জেগে ওঠে সুদূরের পিপাসা। কুবের জেলে মাছ ধরে জীবিকা চালায়। তার আছে পঙ্গু স্ত্রী মালা, লখা-চণ্ডী দুই পুত্র ও গোপী নামে মেয়ে। মদন জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিয়েচে কুবেরের সংসারকে। আর কুবের পালিয়ে গেল শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে ময়না দ্বীপে। যৌনবানের সঙ্গে পদ্মার প্রবাহ তুলনীয়। পদ্মা ভেঙে দিচ্চে দুই তীরের ঘর বাড়ি; আর যৌবন ও ঘরসংসার। এখানে প্রাণনের লীলাই মূর্ত হয়েচে স্রোতের দুর্বারতায়। কুবের যেন Ibsenএর নোরার উল্টো পিঠ। কথ্যভাষায় যে লোকসংস্কৃতির পরিচয় আছে তা বিস্ময়ের।

এর সঙ্গে তাই তুলনীয় তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। এরপর 'সহরতলীতে' এসেচে শহুরেপনা। গ্রামীন উপভাষার জায়গায় স্থান পেয়েচে নাগরালির উপভাষা যা ফুটেচে শ্রমিক আন্দোলনের পটে। গণশক্তির জাগ্রতরূপ এখানে তুলে ধরা হয়েচে। যশোদা হ'লো শ্রমিকদের প্রতিনিধি। মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয় প্রভৃতি শ্রমিকরা অকৃত্রিম হ'লেও চাকরির খাতিরে এসেচে স্বার্থ-সংঘর্ষ। এরি অনিবার্য ফল হ'লো মনোমালিন্য ও বিদ্রোহ। সত্যপ্রিয়মিলের ধর্মঘটের মূলে কাজ করেচে যশোদা, যে স্মরণ করিয়ে দেয় Dickensএর Madame de Fargeকে [A Tale of Two Cities]। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যশোদা ধরা দিয়েচে সত্যপ্রিয়ের চক্রান্তে। মোট কথা এখানে মজদুর বিদ্রোহ ও চাকুরিয়াদের স্বার্থসংঘর্ষ চিত্রিত হয়েচে বাস্তবের তুলিতে। নন্দ-কুমুদিনী চরিত্রও বেশ জীবন্ত। এতে আছে অগ্রগতির সাক্ষ্য।

মাণিক কথাসাহিত্যে ভালমন্দ'র সুমিতিমাত্রা রক্ষা করতে পারেননি। এর রচনা কখনো হয়েচে উৎকর্ষের পরিচায়ক কখনো বা অপকর্ষের বাহক। লেখকে বৈশিষ্ট্য ফুটেচে অস্বাভাবিক মনস্তত্বের অবতারণায়। অতিমাত্রায় যৌন চেতনার জন্যে তিনি মানসকুট-গ্রস্তই হ'য়েচেন। ফলে রঙিন চশমায় সবি যৌন আকর্ষণের রকমফের হিসেবে প্রতিভাত হয়েচে। বস্তুর এ অবলোকন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এরি রূপায়নে চাই Voltaire এর বৈহাসিকতা, বা Lawrence এর পুঙ্খানুপুঙ্খতা, বা কাব্যপ্রবাহের গভীরতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এতটা শক্তি নেই মাণিকের। তাই জায়গায় জায়গায় যৌনতার অস্থিসংস্থান বিশ্লেষণে এসেচে একরকমের অভদ্রতা, যা সামাজিক দিক থেকে অপাংক্তেয়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য না-থাকায় কখনো কখনো একটু একঘেয়েমির সুরও বেজেচে; আর এসেচে রসাভাস। এক কথায় বলা যায়, তিনি যে পরিমাণে ভাবের দিক থেকে স্বকীয়, সে-পরিমাণে শৈল্পিক সুষমা আনতে পারেন নি। তাই শিল্পায়ন সব জায়গায় রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। তা সত্ত্বেও নতুন পরীক্ষার জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

(২) 'গণ'-চক্র

যৌন ও গণ এ-দুধারায় উত্তরতিরিশ সাহিত্যায়ন এগিয়েচে। এ দুয়েরি মিলনে দেখা দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যিনি অচিন্ত্য-বুদ্ধ-প্রেমেন্দ্র অক্ষের পরিপূরক। যৌন-ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেচে গণজপ্রবাহ। অবহেলিত মানবের আকৃতিই এখানে ফুটে উঠেচে। এতকাল যারা উপেক্ষিত ছিল সমাজে ও সাহিত্যে, তারা ভাঙনধারায় পেলো স্বীকৃতি আর সাহিত্যেও এলো তাদের আহ্বান। এ গণ-আন্দোলন মানসিক বিলাসই বটে, যেহেতু বিদ্রোহে এর জন্ম আর রচয়িতা এখনো মধ্যবিত্ত মানস। রুশ সাহিত্যের ধারা এর নির্মাণকল্পে সহায়তা করেচে, যেমন মধ্যবিত্তের ভাঙন। ১৯১৭-র বিপ্লবের পর রাশিয়া এগিয়ে এলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। মার্কসায়নের দৈহিক রূপ ধরা পড়লো এখানে। তাইতো এ আদর্শ হিসেবে পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেলো অনন্যের

মতো। কিন্তু অনঙ্গতো বৈদেহী থাকতে চায়না, সে খুঁজচে অঙ্গ, চাইচে কায়া। এ-ভাবে মার্কস ম'রে গিয়ে প্রমাণ করেচেন যে তিনি অমর। বাংলার সমাজ-ভাঙনে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা বড়ো হ'য়ে দেখা দিলো, তাই 'প্রজাসত্ব আইনের' হ'লো নবায়ন (১৯২৮), এলো 'বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন' (১৯৩৬) ও "বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল আইন" (১৯৩৮)। এতে ফুটেচে ভাঙনের ইতিহাস। কাজেই সর্বহারারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে। সমাজের দাবি হিসেবে তাই এলো সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের ভিতর এ-ধারার কিছুটা চিত্রণ আছে। তবে সে তখনো নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন ও জসীমুদ্দিন একে আরো এগিয়ে এনেচেন। এরপর গণপ্রবাহ চলেচে সজোরে।

অচিন্ত্য-বুদ্ধ-প্রেমেন্দ্র অঙ্কের শেষ যোজনা হ'লো প্রেমেন্দ্র মিত্র। যৌনবৃত্তে এলো গণজ ঢেউ। কিন্তু যোগসূত্র হিসেবে স্মরণীয় এ-অঙ্কের যৌথ কীর্তি। "বনশ্রী" (১৯৩৪) ও "বিসর্পিলে" (১৯৩৪) তিনের ঐক্য ও পার্থক্য ধরা পড়ে। বুদ্ধদেবের কাব্যায়ন, অচিন্ত্যর কাল্পিক গল্পায়ন আর প্রেমেন্দ্রের গাল্পিকতা এখানে লক্ষ্যণীয়। ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়েচে এঁদের কবিত্ব, যা ভাষার মারফতে ভেঙে পড়েচে। গাল্পিকতায় এগিয়েচেন প্রেমেন্দ্র, যার বাহন হ'লো "কালিকলম" (১৯২৬)। তাঁর ভিতর দু'টো ধারা লক্ষ্যণীয়—পতিতের জয়গান ও বিজ্ঞানের ভিতে রহস্য সৃষ্টি। যেহেতু গণ-আন্দোলন এখনো আদর্শায়নের নামান্তর, তাই এসেচে এই বিজ্ঞান-বিলাস। অন্তজ্যরা এসেচে বাস্তবায়নে, আর বিজ্ঞান আদর্শায়নে। এ দু'ধারার দ্বিধা খণ্ডিত হয়েচে প্রেমেন্দ্র' মানস। তাই তো হয়েচে এর ভরাডুবি চলচ্চিত্রের চঞ্চলতায়। এ সম্বন্ধে সচেতনতাই করেচে তাকে দ্বৈপায়ন আর লেখক নিজেই বলেচেন: "মানুষ মাত্রেই বুঝি এমনি এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সৃষ্টির রহস্য সাগরে ঘেরা।" কিন্তু দ্বৈপায়নেরও আছে বহু যুগের স্মৃতি-উর্বরতা, চারিধারের পদ চিহ্ন। তাইতো আবেষ্টনী এসে একলা মানুষটিকে ঘা দিয়েচে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৫—)

বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়েচেন লেখক ১৯২১ সালে, ষোল বছর বয়সে। কাজেই অবনত সমাজের ক্রন্দন অনুরণিত হয়েচে তাঁর "পাঁকে"। প্রেমেন্দ্র এখানে রুশ-বিপ্লব ও প্রথম মহাযুদ্ধের সুরে মশগুল। তাই তিনি বুঝেচেন যে জনসাধারণের ব্যাকুলতাই তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে প্রগতির দিকে। কিন্তু তার আগে চাই পথ-প্রস্তুতি। এ-কাজ হ'লো জনগণকে জাগ্রত করা, চেতিয়ে-তোলা-"বীভৎসতা, পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে তুলে বিপুল অসন্তোষ তাদের মনে রোপণ করতে"। তার পরেই "আমূল পরিবর্তন" হবে জনগণের। অশান্ত কর্মকার তাই বলচে: "মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না।" এতে সমাজ-তান্ত্রিক সাধনা আছে, যাতে রুশ-ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা মিশেচে। এর পর লেখক বেরিয়েচেন "মিছিলে" [১৯৩৩]। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে গ'ড়ে উঠেচে কথন-প্রবাহ। "নির্ভীক" আফিসের চাকরি নিয়ে আবর্তিত হয়েচে

গল্পায়ন। এখানে লেখক সীমারেখা টেনেচেন মানুষী ও বিধাতার গল্পের—"মানুষের সব গল্প গোল হ'য়ে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বিধাতার গল্পে লাখো আরম্ভ কিন্তু বড় জোর একটি সম্পূর্ণতা।" তাই "সব খেই মেলে না" বিধাতার গল্পে। "মিছিলে"ও হয়েচে তাই। এ একদম জাগতিক গল্প-প্রবাহ, যার স্রোতে জন মিছিল এসেচে। মনু, শচীন, রবীন, নন্দ প্রভৃতি জীবনের মিছিল, ছন্নছাড়া, এলোমেলো। "পঞ্চশরে" প্রেমের প্রবাহ চলেচে ভ্রমণবৃত্তে। এ প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারি কথা"'র মতো। পদ্ধতি হ'লো আত্মজৈবনিক। লেখক নিজেই একটি চরিত্র, যে সুরেন, শ্রীপতির সঙ্গে যুক্ত হয়েচে। এখানকার ভাষাও সরসতায় সজীব। স্কাণ্ডিনেভীয় রীতিতে এসেচে ছোট ছোট শব্দ, যা ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়েচে আবেগের দোলায়।

এর পর সমাজ স্তরে প্রবেশ করেচেন লেখক "উপনায়নে" (১৯৩৩)। আদর্শ-বিলাস এখানে বাস্তবায়নে ধরা দিয়েচে। আবেষ্টনীর প্রভাবে মানুষ যে-ভাবে পিষ্ট হচ্চে তারি ছবি ফুটেছে এখানে। ছোট শিশু বিনুর জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেলো পারিপার্শ্বিকের চাপে। সে অভাবের তাড়নায় শিখেচে চুরি, জোচ্চোরি। স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হ'য়ে গেচে শিশুর কাছে। তাই মনে হয়েচে যে "সমস্ত পৃথিবী এই শিশুটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে"। বিনু তাই শেষে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেলো আর নাম রাখলো অমৃতানন্দ। এখানে মধ্যবিত্ত ভাঙন আরও পরিস্ফুট। তাই সমাজ চিত্রণ পরিকল্পিত হয়েচে মনোবিকলনে। এরপর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এলো "কুয়াশায়" (১৯৪৬)। এখানে একটি সমস্যা পাক খেয়েচে স্মৃতি নিয়ে। পূর্বস্মৃতি একেবারে লোপ পেতে পারে কিনা তাই দেখান হয়েচে। নায়ক প্রদ্যোৎ বসু পুরনো জীবন ছেড়ে একেবারে নতুন জীবন আরম্ভ করেচে ক'লকাতার পরিবেশে। এখানকার জীবন গ'ড়ে উঠেচে অমলের বন্ধুত্বে ও তার পারিবারিক পরিবেশে যেখানে অমলের বোন নির্মলা ও ভাই বিমল আছে। নির্মলার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয়েচে প্রদ্যোতের আকর্ষণে। বিয়ের জন্যে যখন আরম্ভ হ'লো পীড়াপীড়ি, তখনি প্রদ্যোৎ এলো পালিয়ে। আকস্মিক পূর্বসঙ্গী মথুর রায়ের আবির্ভাবে গল্পের ধারা গেল উল্টে। প্রদ্যোতের পূর্বস্মৃতি এলো ফিরে। তাই গোটাটাই কুহেলিকায় ঢাকা পড়লো। কুয়াশায় আঁকা রইল অনিশ্চয়ের প্রশ্নিলতা: "হয়তো সত্যই প্রদ্যোৎ আবার সেখানে ফিরিবে, অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়া সুরু করিবে নূতন জীবনের সূচনা।" গল্পটি আরম্ভ হয়েচে ট্রেন যাত্রায় আর শেষও হয়েচে এতে। আর এই ট্রেনই হ'লো জীবনের প্রতীক। এ একাধারে মনস্তাত্ত্বিক ও সমস্যাবহুল হ'য়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনকে।

৪র্থ স্তরে আছে চিত্রনাট্যের রূপান্তর। প্রথম পর্বের যৌনায়ন পরিবর্তিত হ'লো সমাজতান্ত্রিক সাধনায়, যা তৃতীয় পর্বে রূপ পেয়েচে মনস্তত্ত্বে। আর ৪র্থ পর্বে চারিয়ে গেচে গণজ ঢেউ চলচ্চিত্রে। গৌরাঙ্গ বসুর হাতে "ভাবীকাল" [১৯৪৬] উপন্যাসীকৃত হয়েচে। এ হ'লো কালাঝুরি জঙ্গলের রূপান্তর আর এ এসেচে

কুড়ুল, কোদাল ও লাঠি এই তিনটি স্তরে। গণ আন্দোলনে জমিদারী ভিৎ নড়ে উঠচে। এই চেতনায় এসেচে শিবনাথ, সোমনাথ ও ইন্দ্রনাথ। ভাবী কালের রূপও এই। ভাষা এখানে সংযত ও ধারালো। ছায়া ছবির দ্বিতীয় রূপান্তর হ'লো "অভিযোগ" (১৯৪৭), যা বিচারালয়ে আরম্ভ হয়েচে। বাদী হ'লো কৃপাশঙ্কর, আসামী প্রবীর আর বাসন্তী অভিযোগের বিষয়বস্তু। বাসন্তীকে বুড়ো বরের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ায় প্রবীর হয়েচে আসামী। পরে অবিশ্যি প্রবীর ও বাসন্তীর বিয়েতে জটিলতার হয়েচে অবসান। এ সাধারণ কাহিনী। গৌরাঙ্গপ্রসাদের কৃতিত্ব কম নয়। তার পরে "প্রতিশোধে" প্রকাশ পেয়েচে নির্যাতিত নারীত্বের প্রতিশোধ। নির্মলাকে ফেলে বিজয় বিয়ে করলো অণিমাকে। এদের ছেলে যখন রোগশয্যায়, তখন নির্ম'লা এসেচে প্রতিশোধ নিতে। আর মিলনও হয়েচে এখানে। এ মিলনান্তক হ'লেও শোকান্তিকা। নতুনত্বের পরিচিতি এখানে তেমন নেই। গণ চাহিদা মেটানোর জন্তেই হয়েচে এ সব কাহিনীর আমদানী।

বাস্তবায়নের ইতিহাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণীয়, যেহেতু তিনি তথাকথিত চোর, জুয়াচোর প্রভৃতি অন্ত্যজদের পাংক্তেয় করেচেন এবং চেষ্টা করেচেন তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে। যেখানে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব যৌনতত্ত্বের কথা ক'য়েচেন সেখানে প্রেমেন্দ্র বলেচেন সমাজতন্ত্রের কথা। জীবন যে শুধু সুন্দর তা নয়—এখানে আছে অসুন্দরও। এ দুয়ে মিলেই হ'লো জীবন। কাজেই জীবনের চিত্রশিল্পীই লেখক। লেখা তাঁর কাছে এক বিরাট দায়। এর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তিনি—"লেখাটা শুধু অবসর বিনোদন নয়, মানসিক বিলাস নয়। সামনে ও পেছনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দুজ্ঞেয় পর্ণামর জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার বিরাট বিপুল এক দায়" ("কেন লিখি")। এই বিরাট দায় সম্বন্ধে লেখক অবহিত বলেই ভয় পান তিনি লিখ্‌তে। এ শুধু যে জীবনের দায় তা নয়, এ "প্রাণের দায়"ও। ফলে প্রেমেন্দ্র'র সমাজ সংস্কারী প্রচেষ্টা প্রবলতর—কি গদ্যে কি পদ্যে! তাঁর উদ্দেশ্য জীবনের আঙ্গিকে জীবন-রহস্যেরই আবিষ্কার। কিন্তু এতে নেই মন-কণ্ডূয়ন, যা আজকালকার সাহিত্যের উপজীব্য। এখানে উগ্রতার অভাবই লক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যমূলক হ'য়েও তাঁর উপন্যাস শিল্পের সীমা অতিক্রম করেনি। আর এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

যিনি কাব্যের স্বপ্নিলতায় এগোলেন আর নিরুপম গুপ্তের ছদ্ম নামে তিনি হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'কল্লোল' ভেঙে 'কালি-কলমে'র যে-রূপ দেখা গেল, তাতে উৎকীর্ণ হয়েচে এঁর নাম। গণ-সাহিত্যের প্রসারে অনিবার্যভাবেই এসে পড়লো বস্তুনিষ্ঠা, যা বাস্তবায়নেরই একাগ্রতা। শৈলজানন্দী আবহাওয়ায় বস্তুর রূপই প্রতিভাত হলো খোলা চোখে। এখানে অচিন্ত্য-বুদ্ধ'র কবিত্ব যেমন অনুপস্থিত, তেমনি নেই প্রেমেন্দ্র'র মননশীলতা। বস্তুকৈবল্যের চেহারা ফুটেচে হৃদয়াবেগে, যাতে দুলেচে কোল-ভীল-মুটে-মজুর। দরদের দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়েচে তাদের জীবনযাত্রা। তাইতো জন্ম হয়েচে একটি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০—)

বিশেষ পরিবেশের যার নাম হ'লো 'আঞ্চলিক'। এখানে বস্তু রস গভীর নয়। তাই বস্তুবাদ প্রকৃতিবাদে বিবর্তিত হ'তে পারেনি যেমন হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে। তবুও বাস্তবের চিত্ররসে যে "আনন্দের ভোজে"র আমদানি হয়েছে, তাতে লেখক নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন "মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সুমুখে" তাদেরকে। এ গুরুকাজে মানব চরিত্রশালার দরজা খুলে দিয়েছেন তিনি। ভঙ্গিসর্বস্ব লেখনের বিরুদ্ধে তাইতো জেহাদ ঘোষিত হয়েছে: "শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"

শৈলজানন্দের প্রথম লেখা "ঝোড়ো হাওয়া" ঝড়ের মতো ব'য়ে গেছ্‌লো তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে যেমন কল্লোল তুলেছিল অচিন্ত্যকুমারের "বেদে", বুদ্ধদেবের "রজনী হ'ল উতলা" ও প্রেমেন্দ্রের "পাঁক"। এখানে সমাজকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা আছে। তাইতো মানস সত্তার রূপই ধরা পড়েছে। গন-আন্দোলন যে বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছে, এখানে তার আভাস আছে। যেহেতু মানুষের প্রধানতম আকর্ষণ হ'লো যৌন, তাই গণভিত্তিও হ'লো কামজ। ফলে শৈলজানন্দের ছোট গল্পে যেরকম বিদ্রোহের গতি পাওয়া যায়, উপন্যাসে তা নয়। এখানে কামনার কূপে বন্দী হয়েছে নরনারী। তাই এক হিসেবে এ যৌনবৃত্তের গতিপথে চলেছে। তাঁর "অভিশাপ" [১৯৩৩] টাকা-পাগল শ্রীহর্ষের জীবন চরিত। কাঞ্চন সংস্পর্শে মানুষের যে অধোগতি হয় এখানে তাই ফুটেছে। শ্রীহর্ষ টাকার জন্যে শিববাবুকে ঠকিয়েছে, যার জন্যে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। এতে কিন্তু সে পেয়েছে বাড়ি আর প্রথমা স্ত্রীর মেয়ে মালতীকে। পরে চাঁপাকে বিয়ে করলো সে আর মেয়েকে বিয়ে দিলো যক্ষ্মাগ্রস্ত জামাইয়ের সঙ্গে। ফলে পেলো বিশহাজার টাকা। একদিকে এসেছে কাঞ্চন, অন্যদিকে সামাজিক স্নেহ প্রীতির হয়েছে বিলোপ। টাকার অভিশাপই এখানে দেখা দিয়েছে গ্রীক নাটকের **Fury**-র মতো। মানুষ এখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। "খরস্রোতা" ব'য়ে চলেছে সংসারের ঘূর্ণাবর্তে। এখানে ফুটেছে শশিশেখরের জীবনকাহিনী। মাতুলালয়ের অত্যাচারই মাতা পিতৃহীন বালককে করেছে ঘরছাড়া। অমলার দাবী উপেক্ষা ক'রে চলেছে সে মণিমালার দিকে। তাই সে সন্ন্যাসী হয়েছে কিন্তু শান্তি আসেনি। কাজেই সে ফিরে এলো অমলার কাছে। কিন্তু অমলা বিবাহিত। তাইতো পরসেবাব্রতে সে উৎসর্গ করেছে নিজেকে। এখানে শোকান্তিকার রস উপচে পড়েছে। "শোভাযাত্রায়" (১৯৪৫) দৃশ্যাবলী বিন্যস্ত হয়েছে জানকীবাবু ও জামাই অশোকের দু দুবার দার পরিগ্রহে। বিমাতার ঈর্ষার জন্যে অশোকের পুত্র গোপালের পড়াশুনা হ'লোনা। এখানে গার্হস্থ জীবনই শতদলের মতো ফুটেছে। জীবন-জিজ্ঞাসার কুটিলতা নেই, যেমন বালাই নেই নৈতিকতার। এ একপ্রকার নিষ্ঠুর নিয়তির লীলা যেখানে মানুষ অসহায়। তবে তারও আছে ইচ্ছাশক্তি। আর এদুয়ে মিলেই গড়ে তুলেছে বাস্তব চিত্রণ।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পেই শৈলজানন্দী কৃতিত্ব বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। এর জন্যে দায়ী অবিশ্যি ছোট গল্পের স্বল্পপরিসর। বৃহত্তর পটভূমিকায় এগোনো

সত্যি কঠিন ব্যাপার। রুশসাহিত্যের বিস্তার এখানে নেই। ছোট খাট ঘটনার ঘূর্ণিতে যে আবর্ত, এখানে আছে তারি বুদ্বুদ। "সাঁওতালি" (১৯৩২) বা কয়লা কুঠির বৈশিষ্ট্য তাই এখানে অনুপস্থিত। গল্পায়ন ও চরিত্রায়নের যৌথ বিকাশ স্বভাবতই একটু কঠিন। তাই যে কোন এক দিকে লেখকের প্রতিভার বাঁক ফেরে। সাধারণ চরিত্রগুলিতে জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা চোখে পড়ে। যে দ্বন্দ্ব- সংঘাত নিয়ে উপন্যাসের কারবার, অন্ত্যজদের চেহারায় তা তেমন লক্ষণীয় নয়। কাজেই বিষয়বস্তুই রশি টেনেচে তাঁর কল্পনার। মানুষী জীবন আদর্শের সংঘর্ষেই এগোয়, যেমন দেখা যায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে। তা হ'লেও উত্তর তিরিশ যুগে এর প্রসারও সীমায়িত হয়েচে। ফলে শৈলজানন্দী দৃষ্টি বাস্তবের যে ছবি দেখেচে তা রক্তমাংসে সজীব হ'লেও গণ্ডি লীন। কাজেই তাঁর জগৎ সাধারণ একঘেয়েমিরই অনুবর্তন। তবুও বাস্তবপন্থীর নিরাসক্ত দৃষ্টি এখানে স্মরণীয়, যা "আঞ্চলিক" উপন্যাসের পথিকৃৎ।

'কল্লোলে'র মারফতে যাঁদের নাম বেরোয়, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় একজন। এঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' (১৯২৭) প্রকাশ পায় 'কল্লোলে'। এতে বিদ্রোহ তেমন না থাকলেও ছিল পৌরুষের ছাপ। তাঁর প্রথম জীবনে কবিতা উৎসারিয়ে উঠেছিল পয়ারে: "পাখীর ছানাটি আজ মরিয়াছে হায়। তার মা এসে কতই কাঁদিতেছে তাই।" এ স্মরণে আনে বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন ও অনুষ্টুপছন্দ। পরে অবিশ্যি তিনি বুঝলেন যে কবিতা তাঁর ভাবের বাহন নয়। তাই তিনি শৈলজানন্দের মতো গল্প-উপন্যাসে হাত দিলেন। শুধু তাই নয়, বীরভূম-বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতি অন্ত্যজদের যে চিত্র শৈলজানন্দ রূপায়িত করেচেন, তার আরেকটা দিক বীরভূমি লাল রঙে উদ্ভাসিত হয়েচে তারাশঙ্করে। তবে এখানে আছে বৃহত্তর দিকটা, যেখানে বেদে, বাগ্দী, কাহার, ডোম প্রভৃতি ভিড় ক'রে আছে। এই "আঞ্চলিক" উপন্যাসে তারাশঙ্কর সত্যিকার কৃতিত্ব দেখিয়েচেন, কি চরিত্র, কি গল্পায়ন, কি সংলাপ, এর প্রত্যেকটাই 'স্থানিক রঙে' রাঙা হয়েচে। ভবঘুরেদের ছবি শরৎচন্দ্র বা প্রবোধকুমার যা এঁকেচেন, এখানে হয়েচে তার ব্যাপক প্রসার। উপেক্ষিত সমাজ যেন তার বেদনা নিয়ে হাজির হয়েচে সাহিত্যের ভোজে। কারণ, তারাশঙ্কর তাকে নেমন্তন্ন জানিয়েচেন। কাজেই যাকে নতুন ব'লে মনে হয় তার ভিতর আছে আবিষ্কারের চমক। এসব জন্ম-যাযাবরদের সমাজ চিরকালই উপেক্ষা ক'রে আসচে, কিন্তু লেখক তাদেরকে করেচেন পাংক্তেয়। গণসাহিত্যের প্রগতি তাই সম্ভব হয়েচে। কবিকঙ্কনের চণ্ডী ও ঘনরামের "ধর্মমঙ্গলে" যে কালকেতু ও কালুডোম দেখা দিয়েচে, তারা শরৎচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েচে সাপুড়ে, জোলা, বাগ্দী, বেশ্যায়। এরা প্রবোধ-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দের ভিতর দিয়ে কাহার, ডোম, বোষ্টমিতে পরিণত হয়েচে। এরি অগ্রগতিতে এসেচে তারাশঙ্করের জনপ্রিয়তা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮)

লেখকের সাহিত্যায়নে আছে তিনটি স্তর—বিদ্রোহ, সমাজ-ভাঙন ও গণ-প্রগতি। কিন্তু সব স্তর ঘিরে আছে ক্ষয়িষ্ণুতা। সমাজ যে ভেঙে যাচ্চে বিভিন্ন স্তরে এখানে

আছে তারি পরিচয়। সমাজ-চেতন মনে প্রথমেই এসেচে বিদ্রোহের ঘূর্ণিঝড়। এতেই অব্যবস্থার নিরসন হবে এই আশাতেই আছে বিদ্রোহীর জয়োল্লাস। "পাষাণপুরী" ও "চৈতালী ঘূর্ণি" প্রথম স্তরের ইঙ্গিত বহন করচে। এখানে আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতে বেজেচে বিদ্রোহের সুর। তাইতো "পাষাণপুরী" কারার নিরানন্দ জীবন চিত্র। এর সঙ্গে তুলনীয় ডষ্টয়ভস্কির "হাউস অব দি ডেড" (১৮৬১)। তবে সেখানে অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান আরও বেশি পরিস্ফুট। এখানে কয়েদী জীবনের একঘেয়েমির সুরই বেজেচে। সাইদ, গৌর, কেষ্ট, চৈতন প্রভৃতি এ নেপথ্যের কুশীলব। কালীকামারের চরিত্রটি পূর্বস্মৃতি ও বর্ত্তমান নিয়ে গ'ড়ে উঠেচে। এতে এসেচে একরকমের উন্মাদ অবস্থা। ঘানির টানে, সান্ত্রীর বুটের খট খটে, ও ঘণ্টার ঢং ঢঙে বাস্তব ধাক্কা দিচ্চে দরজায় আর অমনি বিদ্রোহ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌চে: "মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কিছুই নাই।" "চৈতালীঘূর্ণি" কিন্তু এনেচে শ্রমিক আন্দোলনের ঝড় গোষ্ঠ ও দামিনীকে কেন্দ্র ক'রে। নির্যাতিত এখানে কথা ক'য়ে উঠেচে বিদ্রোহে: "মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুশে নিস্পন্দ, ব্যর্থ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক।" এখানে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে কটাক্ষ করা হয়েচে। রূপকবহুলতায় এগিয়েচে এ বিদ্রোহ। এখনো এ-সুর কায়া ধরতে পারেনি। এর জন্যে আরো অভিজ্ঞতার তাই প্রয়োজন হয়েচে।

দ্বিতীয় স্তরে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সমাজের ভাঙন। চিত্রণে ভাঙন প্রকাশ পেয়েচে প্রেম, বিত্ত ও রাজনীতির মারফতে। বস্তুত এ ত্রিবেণীতে ব'য়ে চলেচে অখণ্ড প্রবাহ। সমাজ ভেঙে চুরে যাচ্চে ঘরে বাইরের ঘটনায়। প্রেমের মাধ্যমে ধ্বংসের ছবি ফুটেচে "রাইকমল" [১৯৩৪], "প্রেম ও প্রয়োজন" [১৯৩৫], "আগুন" [১৯৩৭] ও "কবিতে" [১৯৪২]। বৈষ্ণব সমাজে প্রেমের যে লীলা চলেচে তার চিত্রণে শরৎচন্দ্র এনেচেন কমললতাকে। এরি সগোত্রীয় হ'লো কমলিনী। কমলিনী ও রসিকদাসের মধ্যে হয়েচে মাখামাখি। পরে রঞ্জন এসে রাঙিয়ে দিয়েচে কমলিনীকে। পরীর আবির্ভাবে কমলিনীর জীবন দুর্বিষহ হয়েচে শোকান্তিকায় আর দুঃখও ফুটেচে তারি জবানীতে—সখি বলিতে বিদরে হিয়া,

আমারই বঁধুয়া আন্‌বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

"প্রেম ও প্রয়োজনে" একটি সমস্যা আছে। প্রয়োজন কেমন করে প্রেমে রূপান্তরিত হয় তারি কথা বর্ণিত হয়েচে রমা-নলিনী-সঞ্জীব ত্রিভুজে। নানা ঝড়ঝাপটার পরে রমার সঙ্গে সঞ্জীবের মিলন হয়েচে। নলিনী ও সঞ্জীবের সংলাপ বেশ ফুটেচে। এরপর "আগুনে" জ্বলেচে সত্যিকার আগুন চন্দ্রনাথ-মীরা ও হীরু-যাযাবরী সম্পর্কে। এ আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে বলা হয়েচে নিরুর স্মৃতির ভিতর দিয়ে। চন্দ্রনাথ

স্বাধীনচেতা আর হীরু খেয়ালী। "পাহাড়ের শাল বনের আগুনে" মীরার চন্দ্রালোক নৃত্য "দিবারাত্রির কাব্যের" আনন্দের নাচের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে মনের গহনে প্রবেশের প্রচেষ্টা আছে। এরপর "কবি"তে নিতাই ডোমের কবিয়াল হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েচে। তার জীবন দুলেচে ঠাকুরঝি ও বসন্ত'র টানে। দুজনেই মারা গেল আর নিতাইয়ের জীবন মরু খাঁখাঁ করতে লাগলো। এতবড় মর্মান্তিক শোকান্তিকায় ভেঙ্গে পড়েচে কবিয়াল। কবিয়াল সম্প্রদায় ও ঝুমুরনাচুয়েদের সংলাপে "কবি" হয়েচে সার্থক রচনা। বীরভূমের রঙ যে কত বাস্তব হ'তে পারে, তার পরিচয় মেলে নিতাইয়ের গানে—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?" সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়ায় সমাজে এসেচে যে ফাটল শ্রেণীসংগ্রামে, তারি রূপায়নও চোখে পড়ে "নীলকণ্ঠ" (১৯৩৩), "কালিন্দী [১৯৪০], "মন্বন্তর" ও "পদচিহ্ন" [১৯৫০]। "কালিন্দী" ও "পদচিহ্নে" ফুটেচে বেশি ক'রে এই শ্রেণীসংঘাত আর "নীলকণ্ঠে" ও "মন্বন্তরে" আর্থিক ভাঙনের চেহারা প্রকট হয়েচে। এ হ'লো ভাঙনেরই ছবি। "নীলকণ্ঠের" পূর্বনাম "যোগবিয়োগ", যা শ্রীমন্ত ও গিরিকে নিয়ে এক শোকান্তিকায় পরিণত হয়েচে। এখানে কৃষির ভিৎ টলে গেচে। ফলে কৃষক পরিবার বিত্তহীনতায় যাযাবর হয়েচে। শ্রীমন্ত সংসার ঘূর্ণিতে দিশেহারা হ'য়ে ও শ্রীপতির মাথায় লাঠি মেরে জেল খেটেচে। স্বামীর বন্ধু বিপিনের কাছে ধরা দিয়েচে গিরি দায়ে প'ড়ে। পরে ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালার প্রতিকার পেয়েচে শ্মশান-শয্যায়। এদিকে গিরির ছেলে নীলকণ্ঠ অবজ্ঞায় বেড়ে উঠেচে। শেষকালে শ্রীমন্ত ও নীলকণ্ঠ ঘর ছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েচে। এখানে জ্বলেচে দুঃখের দেওয়ালি! "কালিন্দী" গড়ে উঠেচে মানুষ ও প্রকৃতির পটে জড়ত্বের লীলায়। একদিকে সামন্ত যুগীয় রামেশ্বর, অন্যদিকে কালিন্দীর চর। পুরানো সংসারের ভিতে এসেচে মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র। আর প্রকৃতির রাজ্যে এসেচে কৃষিসভ্যতার জায়গায় শিল্পসভ্যতা। তাইতো চাষের জমিতে উঠেচে কলকারখানা। এখানে এক আদিম মানুষের রূপ প্রস্ফুটিত হয়েচে। এ স্মরণ করিয়ে দেয় Goldsmith-এর Deserted Village-এরকথা। "মন্বন্তরে" জাতির সত্তায় যে চিড় এসেচে তারি পরিচয় আছে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় মহানগরী চীৎকার করচে যন্ত্রণায় 'ম্যয় ভূখা হুঁ—ম্যয় ভূখা হুঁ।" সুখময় চক্রবর্তির ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের চিত্র স্মরণে আনে Thomas Mann-এর Buddenbrooks। তবে এখানে জটিলতা নেই ম্যানের মতো। কানাই, গীতা, বোমা যেন পাশাপাশিই চলেচে। তবে দুঃখের পরে যে শান্তি আসবে এখানে আছে তার ইঙ্গিতও। বিজয়ের মারফতে তাই বাণী প্রকাশ পেয়েচে "মহা মরণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মধ্যেও তারা [মানুষেরা] ঐ আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, যুদ্ধের সমাপ্তিতে আসবে মুক্তি।" এখানে ভাষাও প্রথমে কথ্যভঙ্গি আশ্রয় করেচে। "পদচিহ্নে" সত্যিকার পদচিহ্ন পড়েচে শ্রেণীসংগ্রামের। "এর

কাল ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৮।৯ সালপর্যন্ত।" সামন্ততন্ত্র যে ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে এখানে আছে তারি আভাস। তবে ইঙ্গিত এখানে বলিষ্ঠতর। জমিদার স্বর্ণবাবু ও নবোদিত ধনী ব্যবসায়ী গোপীচন্দ্রের সংঘাতে এগিয়েচে উপন্যাস রস। সমাজ "ভাবজীবন এবং কঠোর বাস্তবের বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে ভেসে চলে ছোট ছোট ডিঙির মত।" পরে ধনতন্ত্রের কাছে হয়েচে সামন্ততন্ত্রের পরাজয়।

ভাঙনের ইতিহাসে রাজনীতির লীলাও স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হ'লো "ধাত্রী দেবতা" [১৯৩১], 'সন্দীপন পাঠশালা" [১৯৪৫] এবং "ঝড় ও ঝরাপাতা" [১৯৪৬]। ধাত্রীদেবতায় মাটিই দেশ আর এদেশ দেবায়নের উদ্গতিতে এগিয়েচে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে শিবনাথ ছেড়েচে পারিবারিক শান্তি আর গ্রহণ করেচে আন্দোলনকে। কিন্তু গৌরী একটু ভিন্নধর্মী। শিবনাথের মানসে যে তান্ত্রিক উপলব্ধি দেখা যায় তার রূপায়নও ফুটেচে: "সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বস্তু।" তাইতো "বস্তুর মূর্তিমতী দেবতা" এসে দেখা দিয়েচে। এ হ'লো নগ্নিকা কালিকা মূর্তি যা কখনো "ধাত্রীদেবতার শুষ্ক কণ্ঠের হাহাকার" কখনো বা "হাহাকার করিতেছে! কথা কহিতেছে" মাটি-মা-দেশ- জন্মভূমির রূপে। আঞ্চলিকতার রঙ এখানে পাকা। এর পর "সন্দীপন পাঠশালায়" প্রতিভার ম্লানায়মান ছবিই ফুটে উঠেচে। এর পূর্ব নাম ছিলো "উদয়াস্ত" 'কৃষক' পত্রিকায়। এখানে ধ্বংসশীল সমাজের রূপই বেশি প্রকট হয়েচে। অসহযোগের পটে আঁকা হয়েচে ধীরানন্দ ও সীতারামের চরিত্র। ইস্কুলটি ভেঙে গেচে আর সীতারাম হয়েচে অন্ধ। মনে হয় একে বাঁচাবার কিছু নেই। সন্দীপন পাঠশালার উদ্দীপনের ক্ষমতা নেই। করুণ রসই চুইয়ে পড়চে। "ঝড় ও ঝরাপাতার" বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে কথ্য ভাষার প্রয়োগে ও 'রসিদ আলি দিনে'র ঘটনা প্রবাহে। কেরাণী গোপেন মিত্রের জীবনে এর ঝড় যে ভাবে ভেঙে পড়েচে, তাতে চুরমার হয়েচে তার সংসার, চিড় এসেচে সমাজ বাঁধনে। ঝড়ে রইল শুধু সমাজের ঝরাপাতা। কেমন যেন নিয়তিবাদ এখানে মাথা খাড়া করেচে। শোকান্তিকার প্রাণরস উপচে পড়েচে: "ঝড় বই কি! শাসকের শাসন, যখন মানুষের চোখে অশ্রু হয়ে ঝ'রে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয় যতবিন্দু অশ্রু, ততবিন্দু ক্ষোভ।"

গণসাহিত্যের ঢেউ ভেঙে পড়েচে 'গণদেবতা"য় (১৯৪২) "পঞ্চগ্রাম" [১৯৪৪] ও "হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়" [১৯৪৮]। এর আগেও অবিশ্যি ছিটে ফোঁটা পড়েচে "রাই কমল" ও "কবি"তে। তবে এখানে হয়েচে এর ব্যাপক প্রসার। "গণদেবতা"য় জনসাধারণই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েচে। পল্লী মা'র ছেলেপুলেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো দ্বারিক চৌধুরী, ছিরু ওরফে শ্রীহরিপাল, দেবুপণ্ডিত ও শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন। দুর্গা ছিরু ও দেবুকে ভালবাসে। ছিরু মন্দ'র প্রতীক, যেমন দেবু ভাল'র। সমাজ-ভাঙনে চণ্ডীমণ্ডপের শক্তিহীনতা চোখে পড়ে। সে আর ছিরুকে শাসন করতে পারচে না। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে তাইতো উঠে এসেচে অনিরুদ্ধ

কামার ও গিরীশ সূত্রধর। কৃষি সভ্যতায় চিড় ধরেচে আর শিল্পীকরণের প্রচেষ্টা দেখা দিয়েচে। এখানে গণদেবতার আবাহন যেমন আছে, তেমনি তার বিদ্রূপও। লেখক বলতে চেয়েচেন, "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।" এরি দ্বিতীয় পর্যায় এসেচে "পঞ্চগ্রামে" [১৯৪৪]। মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর, ও কঙ্কণা নিয়ে ব'য়ে চলেচে এ-কাহিনী। গণদেবতার রূপায়ন হয়েচে লোকজন ও দেশের মারফতে। প্রথমের পরিচায়ক হ'লো "গণদেবতা" আর দ্বিতীয়ের "পঞ্চগ্রাম"। দেবু ঘোষই এখানকার প্রধান চরিত্র, যাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে শিবকালীপুরের শ্রীহরি, কুসুমপুরের দৌলত শেখ, কঙ্কণার বড় বাবুরা ও মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মশাই। ঘটনার স্রোতে ভেসে এসেচে ভল্লাবাগ্দীদের ডাকাতি, ময়ূরাক্ষীর বান, ১৯৩০ এর অসহযোগ আন্দোলন। অনিরুদ্ধ পালিয়েচে সাবিত্রীকে নিয়ে আর স্ত্রী পদ্ম খৃষ্টান নগেন্দ্রকে বিয়ে করেচে। কৃষিজ আভিজাত্যের জায়গায় দেখা যাচ্চে শিল্প-কৌলিন্য। তাইতো "কলের বাঁশি বাজিতেছে—কলের কাজে যাইতে হইবে। কত কাজ! কত কাজ!! কত কাজ!!!" এতেই আসবে মুক্তি। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিয়েচে। পঞ্চগ্রামে আবার জোয়ার আসবে, নতুন ক'রে গ'ড়ে উঠবে ঘর দুয়ার, পথঘাট। তখন 'শত গ্রামের, সহস্র গ্রামের মানুষ সেই পথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে!" এখানে কিন্তু বেজেচে 'Knut Hamsun' এর Growth of the Soil-এর সুর যদিও শেষেরটির কল্পনা আরও বলিষ্ঠ। "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" [১৯৪৮] কথ্য ও অপভ্রংশে লেখা। এখানে লেখক একেবারে মানবসভ্যতার আদিম যুগে এসেচেন। এরি জন্যে তিনি পেয়েচেন "শরৎচন্দ্র পদক"। এরি সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে মাণিকের "পদ্মা নদীর মাঝি," যেখানে ব্যবহৃত হয়েচে কথ্যভাষা। বর্তমান উপন্যাস গ'ড়ে উঠেচে ৬টি পর্বে—এ যেন ষড়ঙ্ক নাটিকা। কাহিনীর স্থান হ'লো কোপাই নদীর হাঁসুলী বাঁক আর মৌজা বাঁশবাঁদি, যা কাহারদের আবাসভূমি। কালরুদ্রের মন্দির ও কাহারদের জীবনযাত্রায় এসেচে বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ ও কোপাইয়ের বন্যা। এরি মধ্যে "রঙের খেলা" খেলচে বনোয়ারী, করালী, সুবাসী ও পাখী। এ হ'লো আদিম জৈবভূমি, "আদ্যিকালের অন্ধকার"। এরি মধ্যে "ঝিঁঝিঁ ডাকে। তক্ষক ডাকে টক্ টক্ টক্ ক'রে। প্যাঁচা ডাকে ক্যাচ ক্যাচ আর গভীর রাত্রে হুম—হুমপাখী। বাঁশ বনে নেচে বেড়ায় বা-বাউলী অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে দপ্দপিয়ে জ্বলে বেড়ায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া।" এই আদ্যিকাল রূপায়িত হয়েচে গ্রাম্যগান ও প্রবাদ-প্রবচনে। নতুনের অভিযানে গ্রামটা ধ্বংস হ'য়ে গেলো আর তারি ভিতে গড়ে উঠবে ইঙ্গিত করা শহর। "করুণ রস তাই উপ্‌চে পড়েচে পাগলের গানে:"

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বল্‌বো কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে, কথা ভেসে যায়।

এ মর্মান্তিক— একেবারে কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছায়।

এ-ছাড়াও তারাশঙ্কর লিখেচেন আরও উপন্যাস। তিনি রক্তমাংসের মানুষকেই লোক চক্ষুর গোচরীভূত করেচেন। এ মানুষ যে জগতের বাসিন্দা, সে জগৎ হ'লো আদি কালের। এখানে প্রকৃতির লীলাই প্রকট, মননের নেই নিয়ন্ত্রণ। জীবনের এই অখ্যাত-অজ্ঞাত অংশের রূপায়নে আছে এক রকমের খেয়ালী কল্পনার বিলাস। আবিষ্কারের চমকই চোখে ধাঁধাঁ লাগায়। একে সজীব ও প্রাণধর্মী করতে লেখক ব্যবহার করেচেন "স্থানিক রঙ", যার প্রসাদে তথ্য বহুল ঘটনায় এসেচে রসের ধ্বনি। তবে গোটাটা মিলেই হয়েচে এ সম্ভব। সামগ্রিক রূপেই আছে এ রস। কিন্তু সব উপন্যাস উৎরায়নি, যেহেতু সেখানে নেই শৈল্পিক সংহতি। ঐক্যের নিয়ম লঙ্ঘনই চোখে পড়ে অনেক জায়গায়। তাই উপন্যাসের উপাদান থাকলেও, সব জায়গায় উপন্যাস হ'য়ে ওঠেনি। এর জন্যে যে সংযমের দরকার, এখানে তারি অভাব। ফলে কালের গণ্ডি পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো সার্থক সৃষ্টি আছে কমই।

(৪) গোপাল হালদার (১৯০২—)

সমাজ ভাঙনের ইতিহাস-রচনায় গোপাল হালদারের নাম স্মরণীয়। ইনি দেখেচেন সমাজের চেহারা সমাজ তান্ত্রিকের দৃষ্টি নিয়ে। এও এক রকমের তান্ত্রিক সাধনা। শৈলজা-প্রেমেন-তারাশঙ্কর বৃত্তে আছে যেমন খোলা চোখে সমাজ দর্শন, গোপাল হালদারে তেমনি সমাজতন্ত্রের চশমায় ভাঙন দেখা। প্রথমে দরদ উদ্বেল হয়েচে আর দ্বিতীয়ে রঙিন চশমার ঝলমলানি। এ এগিয়েচে একটা বিশেষ মতবাদ নিয়ে, যা মার্কসায়নের বাঙালী সংস্করণ। অন্ত্যজরা এখনো মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু ভাঙন মারফতে তাদের অগ্রগতি ধ্রুব-নিশ্চিত। এই মার্কসায়নে রাজনৈতিক দিকটার প্রকটতাও লক্ষ্যণীয়। এ ধারার পরিচিতি বহন করচে রাজনৈতিক উপন্যাস। এর উপজীব্য হ'লো কৌটিল্যায়ন, যার প্রান্তিকে এসেচে মার্কসায়ন। শেষেরটির উপান্তে গণজ আভাসও দেখা যায়। তাই গোপাল হালদারের সাধনায় প্রকট হয়েচে ৩টি বিশেষ ধারা—কৌটিল্যায়ন, মার্কসায়ন ও গণায়ন। তবে গণায়নের চেহারা তেমন পরিস্ফুট হয়নি। এর গোটাটাই আবৃত হয়েচে মার্কসায়নে। কাজেই দু'টো ধারাই হ'লো প্রধান।

রাজনৈতিক উপন্যাসে স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", রবীন্দ্রনাথের "গোরা", "ঘরে-বাইরে" ও "চার অধ্যায়" এবং শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"। উপেন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করে এর কিছুটা পরিচয় আছে। তার পরে গোপাল হালদারের "একদার" (১৯৩৯) ফুটে উঠলো নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছবি। এর রচনাকাল ১৯৩৯এর ১৩ সেপ্টেম্বর—২০ সেপ্টেম্বর। আর রচনা স্থান প্রেসিডেন্সি জেল। এ উপন্যাস পরিকল্পিত হয়েচে James Joyceএর Ulyssesর মতো একটি দিন নিয়ে। দিনটি হ'লো ১৩৩৭ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ—সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। বাসে কলিকাতা

পরিক্রমায় মনীশ, সুনীল ও অমিত এই তিন বিপ্লবীর আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনায়ন জড়িয়ে গেচে মুন্সেফ শৈলেন ও এটর্নি সাতকড়ির কর্মজীবনের সঙ্গে। এ সম্ভব হয়েচে স্মৃতির সুড়ঙ্গপথে। আত্মজৈবনিক স্মৃতিরোমন্থনে ভেসে উঠেচে অতীত, যা বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রচনা করেচে ভবিষ্যতের ভূমিকা। একদিকে মূর্ত হয়েচে বিপ্লবীর নিবিড় জীবনায়ন (intense living), অন্যদিকে চাকুরিয়াদের ক্ষুদ্র স্বার্থায়ন। সুনীল-অমিতের জীবন পরিবার থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়েচে—সাধারণ আরামের স্থান নেই এখানে। খড়্গের চোখ-ঝলসানো রূপই দেখা যায়, যা শান্তিনিকেতনীয় দৃষ্টি ধাঁধায় তীক্ষ্ণতায়। সরকারের সঙ্গে বিরোধেও আছে ছলা কৌশল। কাজেই চঞ্চল জীবনের দোলনে চাকুরেদের জীবনযাত্রা যেন "মরুশয্যায় ধীর সমাধি। বিপ্লবের ভিত্তিতে গঠনের কাজ কতদূর অগ্রসর হবে এখানে আছে তার ইঙ্গিতও। তাই এ দেয় জীবনজিজ্ঞাসার সন্ধান। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার স্পর্শে এ হয়েচে মানবায়িত। "একদার" পরার্দ্ধ হ'লো "অন্যদিন" (১৯৫০)। এ দু'বছর পরের আর একটি দিনকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে। এর ঘটনা কাল ১৩৩৭-৩৮। অমিত জেল থেকে মুক্তি পেয়েচে বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে; গৃহপথ পর্বে সে ফিরে এসেচে বাড়িতে—তার মা মারা গেছে, বাপ শীর্ণ মানুষের বিকৃত রূপ। "পথচারী"-পর্বে সে বুঝেচে সেক্সপীয়রের দৃষ্টি, লেনিনের সৃষ্টি; "What a piece of work is man" এবং "Life marches"। তাই তার কর্মজীবন আরম্ভ হ'লো। সে দেখলো "কারখানার মানুষ কারখানার বাঁশীর ডাকে" বেরিয়ে পড়েচে। এর পদ্ধতিতে ফুটেচে আত্মজৈবনিক স্মৃতি রোমন্থন, যা একটি চরিত্রের ভূমিকায় দাঁড়িয়েচে।

এরপর এসেচে মার্কসায়ন, যাতে মোট সমাজকে দেখা হয়েচে ধ্বংসশীল রূপে। ফলে রাজনৈতিক উপন্যাসের জায়গায় এসেচে ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৩৫০এর দুর্ভিক্ষে বাংলা সমাজের যে ভাঙন চোখে পড়ে, তারি রূপায়নে দক্ষতা দেখিয়েচেন লেখক তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে—"পঞ্চাশের পথ" (১৯৪৪), "উনপঞ্চাশী" (১৯৪৬) ও "তেরশো পঞ্চাশ" (১৯৪৫)। এ মন্বন্তরের রূপ কিছুটা ধরা পড়েচে তারাশঙ্করের "মন্বন্তরে"। কিন্তু এখানে সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে ভেসে উঠেচে মধ্যবিত্ত ভাঙনের ভয়ালতা। উপন্যাসত্রয়ীর ঘটনা কাল ৩টি পর্য্যায়ে এগিয়েচে—১৯৪২এর এপ্রিল-আগষ্ট; ১৯৪২এর আগষ্ট-ডিসেম্বর; ১৯৪৩এর জানুয়ারী-এপ্রিল। কাজেই গোটা একটি বছরের ইতিহাস এ। তবে এ কালকে দেখা হয়েচে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিক থেকে। সমসাময়িক কাল নিয়ে এ ভাবে ব্যাপক উপন্যাস আর লেখা হয়নি। কিন্তু ঘটনা ঐতিহাসিক হ'লেও চরিত্র কাল্পনিক, জাতিরূপের পরিচায়ক। এখানে কালই মুখ্য ভূমিকায় নেমেচে, তাই তথাকথিত চরিত্র কতকটা গৌণ। নায়ক শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষ থেকে দেখেচে এই ভাঙনের রূপ, যা ঘটনার আবর্তে নতুন নতুন আলোড়ন তুলেচে। এখানে প্রাধান্য পেয়েচে "রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা ও ও আলোচনা, কর্মী ও মানুষের কথা ও চরিত্র।" এ-ধরণের পরীক্ষা পাশ্চাত্ত্যেও

হয়েচে মালরো বা ষ্টাইনবেকের হাতে। কাজেই যা কিছু নতুনত্ব তা কাহিনী-পরিকল্পনায়। এ একাধারে রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'য়ে সমসাময়িক হয়েচে। এর প্রধান চরিত্র বর্মা-ফেরত ডাঃ বিনয় মজুমদার। সোনাপুর গ্রাম থেকে এ বিস্তৃতি লাভ করেচে কলকাতায়ও। এতে বোঝা যায়, গ্রামীন সভ্যতা বিধ্বস্ত হ'য়ে ভেঙে দেবে শহুরে বিলাসও। জটিলতা এসেচে মতবাদের অনুপ্রাসে ও ঘটনার ঘূর্ণিপাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো League M. L. A মীর জাহেদুদ্দীন, রাজনীতিক কর্মী শিবুদা, বীরু সেন, সীতা রায়, মিঃ নির্মল দাশগুপ্ত প্রভৃতি। ঘটনার স্রোতে এসেচে এ, আর, পি, সাইরেন; কেরোসিন বণ্টন; মহামারী ; সরকারী নিষেধাজ্ঞা; লঙ্গরখানা ইত্যাদি। জাতির মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণিত হয়েচে এখানে। জৈব-প্রেম এখানে বিলাস। তাইতো বিনয় সুধার জায়গায় স্থান দিয়েচে দেশমাতাকে। ভাঙনের রূপ ফুটেচে অনবদ্য ভাষায় : "বড় হয়ে উঠচে কতজনা—টাকার জোয়ার চলেছে, ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে টাকা, কত নতুন ব্যবসা আর কত নতুন আয়োজন—আর কতক্ষুধা, রোগ, মহামারী, মৃত্যু—মাতৃত্বের অপমৃত্যু, নারীত্বের সমাধি·· ডুবে গেছে চাষী—ডুবে গেছে মধ্যবিত্ত, সভ্যতা চূর্ণ হ'য়ে গেছে—নিবে যাচ্ছে শিক্ষার দেউটি বাঙলা দেশে। মাসমাহিনার বান্দা আজ সবে, ওয়েজ স্লেভ্‌স—মেয়ে পুরুষে সমানে পথে বেরিয়েছে, ট্রামে ভিড় করছে······"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজে যে পরিবর্তন এলো তারি রূপরূপান্তর ধরা পড়েচে উপন্যাস-ত্রয়ীতে—'ভাঙন' (১৯৪৭), 'স্রোতের দীপ' (১৯৫০), 'উজান গঙ্গা' [১৯৫০]। 'ভাঙনের' কাল হ'লো প্রাক্-১৯২৪। এখানে নজরে পড়লো "বাঙালী ভদ্রলোকের সংকটমুখী কাল···প্রবীনেরা অস্তোন্মুখ।" তাই ১৯২৪-২৭ এর মধ্যে সে সব প্রবীণেরা পুরানো আদর্শের দীপ জেলে দিলেন 'স্রোতের দীপে'। বাইরের ঘটনায় তারা বিধ্বস্ত, সমাজে ভাঙচুর চলেচে। চিত্রিসারের চৌধুরী পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস দেখেচেন প্রবীন জ্ঞান চৌধুরী। নতুন কালে তাই নতুন ক'রে পুরানোকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করচেন তিনি। অমরকে লেখা চিঠিতে তাই তো ফুটে উঠেচে তাঁর আকুতি : "তোমাদের সংসারে আজ এই শতাব্দীতে আমরা সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন···তোমরা সংশয়ীযুগের মানুষ...আমরা স্বস্তির যুগের মানুষ।" কিন্তু পুরাতন তো শুধু বর্তমানেই বাঁচেনা, সে সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎকেও। তাই 'উজান গঙ্গায়' সৃষ্টির আভাস আছে নতুনের। জ্ঞান চৌধুরী এগিয়ে এসেছেন ১৯২৭-৩০-এ। তিনি শুনচেন সেই নিখিল-ব্যাপী গর্জন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ?" এবার বুঝেছেন যে পুরানো Imitation of Christ এর আদর্শের জায়গায় এসেচে Imitation of Hollywood। তাই তো ভাবচেন এখানেই "আসুক কাল স্রোত, চক্রাকারে আবর্তিত হোক উজান-গঙ্গা।" দুকূল ভরা উজান গঙ্গায় জ্ঞান হয়েচেন অজ্ঞান চিরতরে আর এসেচে গ্রীক শোকান্তিকার সংঘাত। তবে এ সংঘাত এখন আর বাইরের নয়, ভিতরেরও এবং মানুষেরও।

সমাজচিত্রণে গোপাল হালদারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বস্তুর সামগ্রিক রূপই আবর্তিত হয়েচে তাঁর লেখনীতে। তাই সংবাদ তাঁর কাছে প্রতিমুহূর্তে আনচে "সংগ্রামের আহবান," যেহেতু "জীবন চারিদিকে ছাপিয়ে উঠ্‌ছে, লাফিয়ে উঠ্‌ছে"। এ গতির নেশায় তাই তো "পৃথিবী পাগল।" এই গতিছন্দ দেখতে ও বুঝতে লেখক সদাই চেষ্টিত। জীবনের দরদী শিল্পী দেখচেন চারদিকেই "মানুষের শত্রু মানুষ।" কাজেই তাঁর "সাংবাদিক মন বিদ্রোহ করে ওঠে।" বস্তুত সাংবাদিক-তার প্রকাশ ও তাই। ফলে তাঁর সৃষ্টির উৎসমূলে আছে "জীবিকা", "জীবনের দায়িত্ব" "মানুষের মমতা" ও "সংগ্রামের নেশা।' এরি সম্মেলক রূপই লেখকের সৃষ্টি-প্রেরণা। ফলে এসেচে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও মননের তীব্রতা। স্থূল রূপেই হয়েচে অনেক জায়গায় তাঁর অবস্থিতি। সূক্ষ্মায়নের পরিচিতি একটু কমই চোখে পড়ে তাঁর রচনায়। কাজেই সব জায়গায় তিনি সাহিত্যিক হতে পারেনান যদিও হয়েচেন সাংবাদিক।

(৫) হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নির্যাতিত মানবতার অসম্মান সইতে না পেরে কলম ধরেচেন হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাতা হিসেবেই ফুটিয়েচেন এর অভিব্যক্তি। সংসারে দ্বৈতলীলার আছে একদিকে বিলাস, অন্যদিকে নির্যাতন। একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে অপ্রতুলতা। এ বৈষম্য চিরকাল টিকতে পারে না। এতে আগুন লাগবেই একদিন না একদিন। সমাজ-ভাঙনে কাজ করেচে 'অস্তাচল', "এগারোই ফাল্গুন" প্রভৃতি। কিন্তু এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'লো "মুমূর্ষু পৃথিবী" [১৯৩১]। ভাঙনশীলতায় পৃথিবী আবর্তিত হচ্চে। কাজেই এ "সরু সুতোয় গাঁথা প্রেমের গল্প বা অবসরের হালকা-খোরাক রূপকথার কাহিনী" নয়। এর প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেচে "জীবনের সেই নির্মম সত্য, যা দিনের আলোর চেয়েও পরিষ্কার অথচ আগ্নেয়গিরির ধূমান্বিত বহ্নিশিখার মত লেলিহান।" কলকাতা শহরের চিত্রণে ফুটেচে ধনিকের প্রমোদবিলাস যার পাশে পাশেই "বঞ্চিত দেবতার করুণ আর্তনাদ"। কাজেই পৃথিবী হয়েচে মুমূর্ষু। সত্যেন, অতসী, দীনু —এরা হয়েচে ভিখিরী। পৃথিবীর ক্ষুধাই এখানে তার করাল বদন ব্যাদান করেচে। এরি সঙ্গে তুলনীয় Knut Hamsun-এর Hunger। জ্বালার তীব্রতায় শেষে দীনু প্রমোদ ভবনে দিয়েচে আগুন জ্বেলে। আর জ্বলে উঠচে সভ্যতার দেউলে আহবাগ্নি। নির্যাতিতের দাবি বর্ণিলতায় এগিয়েচে: "পৃথিবীর বুকে পথ-ভুলে-যাওয়া ওই উলঙ্গ পথিক। জন্মের পর জন্ম অমনি করেই পথ ভুলে এসেচে পৃথিবীতে, আবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেচে গুরুভার ষ্টিমরোলারের নির্মম নিষ্পেষণে। মানুষের হাতে-গড়া লৌহ চক্রের চাপে দিনের পর দিন লুপ্ত হয়েছে মানুষের অস্তিত্ব।" উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস হয়েও, লিখন ভঙ্গির গুণে এ হয়েচে রসোত্তীর্ণ। গল্পায়নের আড়ে আবডালে চরিত্রায়ণ

ফুটেচে নির্মম সত্য হিসেবে। এতে নেই সনাতন ভাববিহ্বলতার স্পর্শ। নিরেট, নিটোল সত্যেরই জয় জয়কার ঘোষিত হয়েচে। এতে যেমন এসেচে সাহিত্যের প্রগতি, তেমনি লেখকের কৃতিত্বও।

(৩) সংস্কৃতি বিলাস ঃ

বাবুসংস্কৃতির বিলাস মনীন্দ্রলালে খেয়ালী কল্পনায় এগিয়েচে। এর ভেতর স্বস্তির পরিচয়ই বেশি। তাই পরিক্রমায় এ পাড়ি জমিয়েচে। কিন্তু এ শুধু দিশি সীমায় আবদ্ধ থাক্‌তে পারে। এ খুঁজেচে বিদেশ-বিভূঁই। তাই ইউরোপ ভ্রমণ সহায়তা করেচে এর বিস্তার। কাজেই মনীন্দ্রলালী খেয়ালে এলো মানসিক বিলাস, যা এগিয়েচে ইউরো-ভারতীয় পরিক্রমায়। ফলে বিদেশি অভিজ্ঞতা ও মননের তীক্ষ্ণতা যুক্ত হয়েচে জীবনের ব্যাপ্তিতে। এরি পরিচায়ক হ'লেন কয়েক জন সংস্কৃতিবান লিখিয়ে।

(১) অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—)

'কল্লোলের' ঢেউ অন্নদাশঙ্কর রায়কে পৌঁছে দিয়েচে জনগণের কাছে। 'কল্লোলের' যৌনসমস্যা, আঞ্চলিক রঙ, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবঘুরেমি দেশের বুকে এনেচে বান। কিন্তু একে প্রতীক্ষা কর্তে হয়েচে অন্নদাশঙ্করী মনীষা ও ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির জলুসের জন্যে। মননের দীপ্তিতে সংস্কৃতি হয়েচে উজ্জ্বল। দিশি সীমা উলঙ্ঘনে আছে ব্যাপ্তির প্রসার। বাঙালী দ্বৈপায়ন এখানে হয়েচেন ইউরো-ভারতীয়। মধ্যবিত্ত মানস ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলো আর গড়ে উঠলো ইউরো-ভারতীয় সংস্কৃতি, যা বহন করে চলেচে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ। এও এক রকমের আদর্শায়ন, যা বস্তুকে মুক্তি দিয়েচে দেশকালের গণ্ডির উর্দ্ধে। এখানে ইউরেশিয় সংস্কৃতিসমন্বয়ের চেষ্টা আছে। দেশি ছোটখাটো সীমা এখানে উবে গেচে, এসেচে দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা, বিস্তৃত হয়েচে মনুষ্যত্বের ভিৎ। অন্নদাশঙ্করী মানসবিবর্ত্তনে তাই ধরা পড়ে দুটি স্তর—প্রেম ও জীবন। প্রথম স্তরে দেখা দিয়েচে প্রাণনের লীলা, যা এলিস-ফ্রয়েডী ভিত্তিতে এগিয়েচে। এ যৌনতা যৌবনেরই জয়গান গেয়েচে। দ্বিতীয় স্তরে এসেচে অভিজ্ঞতার প্রসার যার ফলে সম্ভব হয়েচে জীবন সমস্যার চিত্রণ। প্রথম দফায় স্মরণীয় হ'লো "অসমাপিকা" [১৯৩০], 'আগুন নিয়ে খেলা" [১৯৩০] ও "পুতুল নিয়ে খেলা" [১৯৩৩]। এগুলি ছোট উপন্যাস। এরপর মহাকাব্যিক ঢঙে এসেচে "সত্যাসত্য" [১৯৩২-৪২]।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনোন্মেষে যৌনবোধ জেগে উঠলো। প্রাণন সব কিছু উপেক্ষা ক'রে চল্‌তে চাইলো। তাই "অসমাপিকা" দেখা দিলো Robert Browning-এর The Ring and the Book-এর ছাঁচে। সুরুচি ও সুচারু যথাক্রমে পম্পিলিয়া ও কাপনসাকী। দু'জনের প্রণয়লীলায় আছে সন্তানকামনা, যাতে চিত্ত দুলেচে। কিন্তু সুচারুর ভালবাসা চিড় খেয়েচে যখন সুরুচি হয়েচে অন্তঃসত্ত্বা।

শোকান্তিকা এসেচে জাতকের অভ্যাগমে। জাতকই হয়েচে মিলনের অন্তরায়। প্রেমের পরিণতি পিতৃত্বে হয়নি ব'লে উপন্যাসের নামকরণ হয়েচে অসমাপিকা। এর পর উপন্যাসের পটভূমি হয়েচে দূর বিস্তৃত। তাই "আগুন নিয়ে খেলায়" আছে স্মৃতি রোমন্থন যা বয়ে চলেচে কল্যাণকুমার সোম ও পেগীকে নিয়ে। এর স্থান হ'লো লণ্ডন আর এ-প্রেমনাটকের অঙ্ক হ'লো ছ'টি। এক একটি দিনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেচে কাহিনী। "শেষের দিনের শেষে" সোম বুঝেচে—"দেহও সমুদ্রের মতো প্রাকৃতিক বিস্ময়। প্রেম মাত্রেই আগুন নিয়ে খেলা। সে আগুন স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলে দাঁড়াতে পারে যে কোন মানুষের জীবনে।" "পুতুল নিয়ে খেলা" "আগুন নিয়ে খেলারই" উপসংহার। এখানে নায়ক সোম ফিরেচে ভারতে, যেখানে তার বাপ জানকী পুত্রের বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েচে। পরে পিতাপুত্রের মধ্যে হয়েচে "পূর্ণিয়া প্যাক্‌ট" যাতে ঠিক হ'লো যে সোম বিয়ে করবে সেই নারীকে যে সোমের পূর্ব পরিচয় জেনেও বিয়ে কর্তে রাজী হবে। এরপর সুরু হয়েচে পত্নী নির্বাচন পর্ব আর সোম ছুটেচে পরিক্রমায়। একে একে দেখেচে পঞ্চ নারীকে। কিন্তু এরা কেউ বিয়ে করতে রাজী হয়নি। নারী পরিচয়ে দেখা যায় শিখানী ধনের প্রতীক, যেমন সুলক্ষণা মান, অমিয়া কুলমর্য্যাদা, প্রতিমা পারিবারিক সামঞ্জস্য আর মায়া জীবনের ব্রত। তারপর সোম বেরিয়েচে সাঁওতাল ভীল কুকি নাগা প্রভৃতির মধ্যে। আশ্বাস আছে এরি ভেতর পাবে সে স্ত্রীরত্ন, যা দেখে তার বাপ কন্যার জন্মপরিচয় জিজ্ঞেস করবে না। বিয়ে হ'লো পুতুল নিয়ে খেলা —এযে প্রহসন তারি ব্যঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেচে উপন্যাস। এ পর্বের বৈশিষ্ট্য হ'লো প্রেম নিয়ে বিতর্ক, যাতে ফুটে উঠেচে মানসিক ঔজ্জ্বল্য। প্রেমের দেশকালিক রূপ পেরিয়ে এখানে প্রচেষ্টা চলেচে এর মৌল সত্তা আবিষ্কারের। কাজেই বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবেই এসে গেচে।

যৌবনোত্তর পর্বে জীবনায়নই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। এরি রূপায়ন হ'লো "সত্যাসত্য," যা ছ' খণ্ডে বিভক্ত। এর সঙ্গে তুলনীয় ইংলণ্ডের Galsworthy-র Forsyte Saga ও ফ্রান্সের রোমাঁরলাঁর Jean Christophe। এতদিনে জীবন সমস্যা সংকুল উপন্যাসের আবির্ভাব হ'লো। এতে ফুটেচে জীবনেরই রূপ যা প্রকাশ পেয়েচে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। এখানে আছে রূপকের রূপায়নও। সুধী প্রজ্ঞার প্রতীক যেমন বাদল মননের এবং উজ্জয়িনী "আত্মনিবেদনের।" এ উপন্যাস মহাকাব্যিক ঢঙে ঢালাই করা যদিও লেখক কালায়নে ত্যাগ করেচেন এর "এপিক" ব্যাখ্যা। এর বৈচিত্র্য ধরা পড়েচে বিভিন্ন উপাদানের সন্নিবেশে—তাইতো মহাকাব্য, চরিত্র শালা, ঘটনা প্রবাহ, বিশ্বকোষ, প্রচার ও সন্দর্ভ মিশেচে এখানে। প্রথম ভাগ হ'লো "যারযেথা দেশ" [১৯৩০-৩২]। বাদল বিলেত গেলো স্ত্রী উজ্জয়িনীকে রেখে। শ্বশুর পরে মারা যায়। "অজ্ঞাত বাসে" [১৯৩৩] বাদলকে দেখা যায় বন্দী "প্রমিথিয়ুসরূপে!" চিন্তনের অনুপ্রাসে বাদল "অশ্বারোহণ পর্বে আবিষ্কার করেচে

বাদল কাল বা ego-time। ইচ্ছাশক্তি ও নিয়তিবাদ দুটোই সত্যি ব'লে মনে হয়েচে বাদলের কাছেও তাইতো হয়েচে তার অজ্ঞাতবাস। "কলঙ্কবতী"র (১৯৩৪) গৃহত্যাগ স্মরণে আনে Forsyte Saga-র An Indian Summer কে। এর গোটাটাই উজ্জয়িনীকে নিয়ে গ'ড়ে উঠেচে। "দুঃখ মোচনে" (১৯৩৬) উজ্জয়িনীর সন্দেহ-বাণ পড়েচে স্বামীর চরিত্রে। "আশ্রম ত্যাগ" পর্বে বাদল তাই ভাবচে: "মানুষের অহমিকা অত্যন্ত উগ্র। যতদিন না মানুষ কবুল করেচে যে সে কেউ নয়, ততদিন সদিচ্ছা প্রণোদিত হস্তক্ষেপের দ্বারা ও সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেটুকু হবে তার বহু গুণ হবে অনিশ্চয়তাজনিত মস্তিষ্কজ্বর"। "মর্ত্যের স্বর্গে" [১৯৩৮-৩৯] সুধী হয়েচে উজ্জয়িনীর "বিবেক, ধর্মবুদ্ধি"। আর সে বলচে "অহিংসাই এযুগের ধর্ম"। বাদল কিন্তু চিন্তাস্রোতে ভাসমান। তারপর 'অপসরণে' [১৯৪২] বাদল মারা গেল। সে বুঝলো যে, নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে (determined world) স্বাধীন সংকল্পের (free will) কোন স্থান নেই। সারা দুনিয়ার অসুখই চোখে পড়চে। এ অসুখের নাম হ'লো ধনতন্ত্র (Capitalism) আর এর ব্যাসিলি private profit বা ব্যক্তিগত মুনাফা। এরি নিরসনের জন্যে বাদলের যে প্রচেষ্টা তাতেই তার রোগ হ'লো। এতেই হ'লো তার মৃত্যু। বাঁচার রাজ্যে বিশ্বাসহীন মননের তো কোন স্থান নেই। 'সত্যাসত্য' গড়ে উঠচে Intellect-intuition-emotion বা বাদল-সুধী-উজ্জয়িনীর ত্রিত্বে। এ খণ্ডন করেচে 'নৌকাডুবির' প্রতিপাদ্য, উলটিয়ে দিয়েচে 'ঘরে বাইরের' পরিণামকে। উজ্জয়িনী তাই অসত্যের ঘর করবে না; সমাজের ভয়ে অসত্যকে [বাদল] স্বামিত্বের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে সত্যের [সুধী] প্রতি অবিশ্বাসী হবে না। এখানে মেলে বিশ্ববীক্ষার পরিচয়।

এই যে উপন্যাসপরিক্রমা শেষ হ'লো এতে দেখা যায় লেখকের আছে সংস্কৃতি বিশ্লেষণ, যাতে গোটা সভ্যতারই রূপ বিচার্য। আর এখানে তিনি দক্ষতাও দেখিয়েচেন। তাঁর 'কেন লিখির' জবানবন্দী হ'লো "মুক্তির জন্যে"। এ মুক্তি আছে ব্যক্ত করায়। ব্যক্ত করার সাধনাই মুক্ত হবার সাধনা তাঁর কাছে। তাই আত্মপ্রকাশেই মুক্তি। নির্জ্জনলোকে যে সব ভাব কোনঠেসা হ'য়ে আছে, তারাই খুঁজচে মুক্তি। আর এ সম্ভব হয়েচে ফ্রয়েডীয় "অবাধ অনুষঙ্গে"র মারফতে। যে তরী অচেতনার ঘাটে বোঝা নিয়েচে, সে আবার প্রকাশের তীরে দিয়েচে নিজেকে উজাড় ক'রে। অন্নদাশঙ্কর তাই "এক হাটে লন বোঝা, শূন্য ক'রে দেন অন্য হাটে"। এতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটেচে। বস্তুত ব্যক্তিত্ব তো প্রকাশেরই নামান্তর। ব্যক্তির ব্যাপ্তিতে তাই এসে পড়ে জগৎ ও শিল্পের সম্পর্ক। এসম্পর্কে শিল্পায়নকে দেখা যায় কখনো জীবনের প্রতিবিম্বনে, কখনো এর ভাষ্যরচনায়, কখনো বা এর রূপান্তরে। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর এর বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েচেন। তাঁর কাছে "জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনি মানবের সৃষ্টি। জীবনের উদ্দেশ্য বা, আর্টের উদ্দেশ্য ও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আত্মপ্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্য-

দান"। এতে বোঝা যায়, শিল্পীর কাছে আর্টই সৃষ্টি, যা নতুন জগতের পরিচিতি বহন করচে। এই প্রত্যয়ে সব রচনাই উদ্বুদ্ধ হয়েচে। মননের ফসল ফলেচে অভিজ্ঞতার আবাদী জমিতে। বস্তুত জীবন থেকে উৎসারিত অভিজ্ঞতাই জুগিয়েচে উপাদান যা মানসিক চাপে এক শৈল্পিক সুষমায় রূপান্তরিত হয়েচে। এতে সহায়তা করেচে লেখকের ইউরোপ ভ্রমণ। দেশবিদেশের সমাজ ব্যবস্থা ও দর্শনের মারফতে তিনি ফোটাতে চেয়েচেন অনুশীলিত মনের চেহারা। তাই উপন্যাস অনেক জায়গায় সন্দর্ভে পরিণত হয়েচে। কোথাও বা সাংবাদিকতাই ফুটেচে। কিন্তু সামগ্রিক রূপে পরিচয় মেলে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও প্রসন্নতার।

(২) দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭—)

ইউরেশিয় পটভূমির আরেক স্তরের সাক্ষাৎ মেলে দিলীপকুমার রায়ে। ইনি একাধারে কবি, গায়ক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। শুধু তাই নয়, ইনি সাধকও, যিনি সংস্কৃতি সন্ধানে ঘুরেচেন দেশ বিদেশে। অধ্যাত্মায়ন বিশ্লেষে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েচেন স্তরবিন্যাস। দেহ, প্রাণ, মন ও অতিমানস এই চারটি হ'লো আরোহের সিঁড়ি। পণ্ডিচারীর দিলীপকুমারও এনেচেন এই বিশ্লেষণ কথা সাহিত্যের সমালোচনায়। তাই তিনি এর বিকাশের ইতিহাসে লক্ষ্য করেচেন ৪টি পর্ব। "বালপর্বে" ঘটনা বিন্যাসই মুখ্য হ'য়ে আনে দেহধর্মিতা। "কৈশোর পর্বের" চরিত্র চিত্রণে আসে প্রাণধর্মিতা। "যৌবন পর্বের" দান হ'লো মাননিক বিশ্লেষণ আর "প্রবীণ পর্বে" জড়ো হয় "মানুষের মনের প্রাণের অন্তরের নানান তর্ক বিচার, গবেষণা, পরীক্ষা জিজ্ঞাসা।" তাই তাঁর উপন্যাস "নিছক গল্প নয়; জটিল আর্ট।" লেখক কিন্তু প্রেরণায় আস্থাবান। অন্নদাশঙ্কর যেখানে মননেই শুধু পাড়ি জমিয়েচেন, সেখানে দিলীপকুমার এসেচেন প্রাণলীলায়। শুধু তাই নয়, অন্নদাশঙ্করী অনুভূতি যেখানে দেহধর্মী সেখানে দিলীপকুমারী প্রাণন মনস্তাত্ত্বিক। প্রথমের পরিক্রমা দেহ প্রাণ ও মনে সীমায়িত, কিন্তু দ্বিতীয়ের আছে এ-ছাড়াও অধ্যাত্মায়ন। তাই এখানে আছে অগ্রগতির পরিচয়।

এবার বিচার্য দিলীপকুমারের উপন্যাস। এর আছে ৪টি স্তর। প্রথম স্তরে আছে দৈহিক ঘটনা বিন্যাস। বাইরের কাঠামোই বেশি পরিস্ফুট এখানে। তাই "রঙের পরশে" [১৯৩৪] কাহিনীর রঙই রাঙিয়ে দিয়েচে ঘটনাস্রোতকে। অতনু-দীপাকে নিয়ে চলেচে গল্পায়ন দুটি বিশিষ্ট খাতে। অতনু খাতের পরিচিতি বহন করচে রুন্তা-লরা-অতনু ত্রিভুজ আর দীপা খাতে বয়ে চলেচে দীপা-অতনু ও রাজা। স্রোতের টানে এসেচে আবর্ত, ঘূর্ণিপাক আর জড়িয়ে গেচে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব। দোটানায় দুলেচে দীপা রাজা ও অতনুর মধ্যে। এদিকে অতনু ও দোল খেয়েচে রুন্তা ও লরার দোলনে। আকর্ষণ বিকর্ষণ শুধু যে যৌনজ তা নয়, এ আধ্যাত্মিকও। তাই অতনুর জীবনে আছে দুটি ধারা, যা লরা লক্ষ্য করেচে

—এক, ভোগপ্রবণতা ; দুই, অধ্যাত্মায়ন। এখানে ঘটনা ও কুশীলবের দৈহিক আকর্ষণই বড়ো ক'রে দেখান হয়েচে ব'লে এর নাম হয়েচে 'রঙের পরশ'। দ্বিতীয় ধাপে আছে প্রাণের লীলা, যা ফুটেচে 'দোলায়' [১৯২৭]। এর আছে দুটো ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বিশ্লেষণ এগিয়েচে "সন্ধ্যা", "ইসাবেলা" ও "মশিয়ে বেনার" এ তিন পর্বে। স্বপন, সন্ধ্যা ও আনাকে নিয়ে যে ত্রিভুজ এলো তারি মারফতে ফুটেচে চিত্রণ। চিঠিতে তাই রূপায়িত হয়েচে প্রেমের স্বরূপ: "প্রেমে পূর্ণতা-আকৃতি মনের মরীচিকা নয়—সে আছে, কেবল এই চেনা বাসনার জানা পথে মেলে না তার উদ্দেশ। প্রেমকে যে বরণ করতে শেখে নিষ্কামনার নির্দেশে শুধু তারই পথে সে ধরে অম্লান আলো নইলে বুঝি সোনামুঠো অহরহই হ'য়ে দাঁড়ায় ধুলোমুঠো"। এখানে আছে প্রাণধর্মী চরিত্র চিত্রণ। তৃতীয় পর্ব এসেচে 'মনের পরশে' [১৯২৬] যা মনোধর্মী। এতে ঘটনার বিস্তার আছে শুধু বিশ্লেষণের দরজায় থেমে যাওয়ার জন্যে, চরিত্র আছে মননকে এগিয়ে দেবার জন্যে। পরিচয় মেলে মিসেস নর্টন, মিঃ টমাস, মিঃ স্মিথ ও ম্যাডাম রিশারের। প্রেমানুভূতির দ্যোতনা কায়া ধরেছে মিসকুপার, নাতালি ভগ্নীচতুষ্টয় ও আইরিনের মারফতে। দেশ পরিক্রমায় মনের পরশই এগিয়ে চলেচে প্রথম ভাগের কেম্ব্রিজ-লণ্ডনে এবং দ্বিতীয় ভাগের প্যারিস-বার্লিন-রোম-ভেনিসে। মাঝে মাঝে এ কিন্তু ঘা দিয়েচে অনুভূতির তারে ও। শাপিরা ও আইরিনের দু'খানি চিঠিতে এসেচে প্রেমের বিদায়। কিন্তু বিদায়ের বাঁশি বাজলেও রইল মনের পরশ।

এরপর ধর্মপর্বে প্রবীণতা এসেচে "বহু বল্লভ ও দু'ধারায়" [১৯৩৫]। সমস্যার জটিলতা এখানে উপস্থিত। এরি দ্যোতনা আছে "তরঙ্গ রোধিবে কে!"-তে। বাল্য কৈশোর ও যৌবন পর্বের মালমশলা নিয়ে গড়ে উঠেচে প্রবীণ পর্ব। তবে এর ভিত্তি হ'লো প্রেম। বস্তুত দিলীপকুমারের প্রেমবিশ্লেষণ চলেচে দেহ, প্রাণ ও মনের দৃষ্টি কোণ থেকে। মাঝে মাঝে অসীমের সুরও বেজেচে অধ্যাত্মায়নের চমকে-দেয়া অনুভূতিতে। অন্তরাত্মার আকূতিই এখানে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েচে। এখানকার সমস্যা হ'লো নারীপুরুষ পরস্পরে শুধু এক না বহু কে ভালবাসতে পারে। জবাব কিন্তু হাঁ ধর্মী। "বহু বল্লভে" প্রদীপ-ডায়ানা-শ্রীলা ত্রিভুজ এগিয়ে চলেচে। চারটি অধ্যায়ে প্রদীপ-স্যর ফ্রান্সিস-ডায়ানা-শ্রীলা চতুরঙ্গে এগিয়েচে গল্পায়ন। একে নাট্যোপন্যাস বলা চলে, যার নজির মেলে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে'। প্রদীপ ভালবাসে ডায়ানাকে আর ডায়ানা হাসিঠাট্টা করে চার্লসকে নিয়ে। প্রদীপ কিছুতেই বোঝে না এর অর্থ। তাই সে চলে গেলো, যেমন বিদায় নিয়েচে শ্রীলা। এর স্বরূপ উদঘাটন করেচে স্যর ফ্রান্সিস: "যুবকের সঙ্গে যুবতীর আর যাই হোক বন্ধুত্ব হয় না"। এক জন মেয়ে দু'জনকে ভাল বাসতে পারে। তাই A. E. র ভাষান্তরে বলা যায়—"স্বৈরাচারিণী হ'ত হিয়া, যদি দিত মালা শুধু একটি জনে।" এই হ'লো মৌল সত্তার পরিচয়। এরপর 'দুধারা'

যা হিন্দীতেও অনূদিত হয়েচে। গল্পায়ন চলেচে নিলয়ের মৃত প্রণয়িনী মীনার প্রেমের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে। জড় হ'য়েচে ওল্‌গা, তার স্বামী রেনে ও ভাই পিয়ের। মীনা-নিলয়ের প্রেম ব্যবচ্ছেদের পথে চলেচে। মীনার সমস্যা ছিলো সে কাকে মালা দেবে। তাই তো ব্যক্ত হয়েচে তার কারুণ্য: "কিন্তু কাকে যে মালা দেব আমি? দু'জনকেই নয় কেন?" নিলয় তাই বল্‌চে সত্যি কথা: "কি-নারী কি-পুরুষ, আসলে উভয়েই অসতী—অর্থাৎ প্রকৃতির আকাংক্ষার দিক দিয়ে। কাজেই সতীত্বের যেটা দর দেওয়া হয়েচে সেটা তার বাজার দর মাত্র।" এখানে অন্তরাত্মা কথা কইচে গল্প—চরিত্র-মনায়নের ত্রিবেণী সঙ্গমে।

দিলীপকুমারী উপন্যাস প্রেম নিয়ে আলোচনা করলেও এতে নেই শরৎচন্দ্রী দ্যুতি, কি অন্নদাশঙ্করী মহাকাব্যিক ঢঙ। এ মানুষী প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটনেই বেশি সচেষ্ট। এর আদর্শ ভারজিনিয়া উল্‌ফের সংজ্ঞায় ফুটে উঠেচে: "সব কিছুই উপন্যাসের উপজীব্য হ'তে পারে—প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক চিন্তা: আত্মা ও মস্তিষ্কের প্রত্যেক গুণ।" তাই এখানে ঘটনার চেয়ে মননই প্রাধান্য পেয়েচে, যা ব্যাপ্ত হয়েচে ইউরো-ভারতীয় পরিবেশে। সমস্যাকে নবরূপে দেখা হয়েচে আর অন্তরাত্মা দোল খেয়েচে প্রকাশের ব্যাকুলতায়। মননের অভিযাত্রী যে তার্কিকতা, তাও প্রতিমায় পেয়েচে তার সীমা। এতে ইউরো-ভারতীয় সংস্কৃতির রূপই ফুটেচে। তাই বুদ্ধিজীবীদের কাছেই এর আবেদন বেশি। জনসাধারণ্যে চারিয়ে যাওয়ার জন্যে অবিশ্যি আছে প্রেমের অবতারণা যা জৈব ভিত্তিতে এগোয়: চরিত্রায়নে একটু আড়ষ্টতা এসেচে; গল্পায়নও এগিয়েচে থমকে-দাঁড়ানো ছন্দে। চলার পথে বিশ্লেষণী প্রতিভা দৃশ্যরস উপভোগ করেচে মনায়নে। তাই এই বিশিষ্ট ভঙ্গি চোখে পড়ে। তাহ'লেও রসসর্বস্বতার বিরুদ্ধে লেখক যে জেহাদ ঘোষণা করেচেন তা প্রশংসার্হ নিশ্চয়ই। এতে রচিত হয়েচে মননশীল উপন্যাসের ভিৎ আর এসেচে অধ্যাত্মায়নের আকুতিও। হয়ত ভবিষ্যতে দেখা দেবে আধ্যাত্মিক কথকালি ও।

(৩) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০—)

অন্নদা-দিলীপ অক্ষের শেষ যোজনা হ'লো ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথমের বিদেশিয়ানা এখানে ভারতীয় রক্তমাংসে রূপ ধরেচে। মননের সূক্ষ্মতায় তাই সম্ভব হয়েচে নতুন অন্তর্মুখিন্‌ উপন্যাস। ইনি শুধু বিদেশি সাহিত্যের ভাব সম্ভার আমদানি করেই নিরস্ত হন নি। এর প্রয়োগ কৌশলেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েচেন। তাই প্রুস্ত-জয়েস-উল্‌ফ প্রভৃতি উপায়নে ভিড় করেচেন অন্তর্জগতে। মন কেবল চিন্তায়ই নৈরাজ্য ও নয়, সেখানে ভিড় করে ঐতিহ্যের সংস্কার ও প্রবাদ। তাই অন্নদা-দিলীপে যেখানে ফুটেচে ইউরোপীয়ানার ছবি, সেখানে ধূর্জটি এনেচেন ভারতীয় তথা বাঙালী সংস্কৃতির বিলাস। পাত্র

পাত্রীর বহিরঙ্গই মনন ও প্রাণনের লীলায় দুলেচে। এখানে বুদ্ধির চাষ আরও সংযত আরো সংহত হয়েচে। আগেকার মনন এগিয়েচে অনেকটা প্রাণ প্রাচুর্যে। এখানে কিন্তু বুদ্ধিই চলেচে উপলব্ধির পায়ে পায়ে। কাজেই উপন্যাসের সংজ্ঞাও এখানে গেছে বদ্‌লে। মনোবিকলনে হয়েচে এর সৃষ্টি। জীবন যেহেতু গোয়েন্দার গল্প নয়, তাই সত্যিকারের নভেলে গল্পাংশ থাকেনা। কীট্‌সের negative capabilitiy থাকবে, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে; তবে স্রোত যে বইচে তার ইঙ্গিত থাকবে। অন্তঃশীলার গতির ইতিহাসই হ'লো pure বা বিশুদ্ধ নভেল। এই pure নভেল আমদানি ক'রে শ্রদ্ধাভাজন হয়েচেন লেখক। তবে তিনি বুদ্ধিমান হলেও, বুদ্ধিসর্বস্ব নন। তাই দেশি প্রবাদ-প্রবচন এসেও হাজির হয়েচে মনায়নে, যেমন (১) "আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করার ডাক"; (২) "যার ধর্ম তারে সাজে অন্যেরে লাঠিবাজে।" এতে পাঠকসাধারণ্যে চারিয়ে গেছে বুদ্ধির জলুস।

আবেগপ্রবণতা একদম নিষ্কাষণ সম্ভব নয়। তাইতো অনুভূতির নিবিড়তায় প্রাতিভাসিক জগৎ বিচ্ছিন্ন বুদ্‌বুদের মতো অন্তঃশীল চৈতন্য স্রোতে ভাসমান। নায়কের সঙ্গে একাত্মবোধে আছে এর পরিচয়। এরি নজির মেলে উপন্যাস ত্রয়ীতে—"অন্তঃশীলা" [১৩৩৫] "আবর্ত্ত" ও "মোহানায়" [১৩৪৩]। এ তিনখানা বই আলাদা ভাবে যেমন উপভোগ্য, তেমনি সম্মিলিত ভাবেও। "অন্তঃশীলা"র শোকান্তিকা আরম্ভ হয়েচে খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যায়। এ-কাজ কেন করচে সাবিত্রী তারি ইতিহাস ফুটেচে খগেন বাবুর মানসের স্মৃতিরোমন্থনে। এর আরম্ভ তাই নাটকীয়। সমস্যা তাই এগিয়েচে খগেন বাবুর অন্তর্দ্বন্দ্বে, লোকায়ত ও লোকোত্তর ধর্মের সংঘাতে। একদিকে রমলার প্রতি আসক্তি, অন্যদিকে অধ্যাত্মায়ন। দেহের নৈরাশ্যে এসেচে বিদেহ মিলন। মানসিক দোলায় যে-ভাবে দুলেচেন খগেনবাবু, তাতেই বয়ে চলেচে চিন্তার স্রোত। কুলকুল তার ধ্বনি। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না; বড় বড় গাছ সেই স্রোতের টানে মাটির সংশ্রব ছাড়ে। মিথ্যার মাটি ধু'য়ে যায় আর শোনা যায় কেবল কুলকুল শব্দ। এই চেতনার দিগ্বাহী স্রোতে রমলা ও খগেনবাবুর কথাবার্তা জয়েসেরই "উলিসিসে"র প্রক্রিয়ায় ফুটেচে:

র—সেও [সাবিত্রী] আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসতো।

খ—কখ্‌খনো না। ভালবাসলে ছেড়ে দেয়।

র—শেষের কবিতায়।

খ—আদি সত্যের তাগিদে।

এ এক নতুন জগতের পরিচিতি।

"অন্তঃশীলার" উপসংহার হ'লো 'আবর্ত্ত।' মনের গহনে যে স্রোত ফল্গুর মতো বয়ে চলেছিল, তা এখানে সৃষ্টি করেচে আবর্ত। তাই পূর্ব নায়ক খগেন বাবু স্থান ছেড়ে দিয়েচেন সুজনকে। হরিদ্বারে খগেনবাবুর জ্বর ফুটেচে। একঘরে

সুজন ও রমলা। খগেনবাবু ও কাশীতে এলেন। সুজনে মিশেচে প্রেমিক ও ছোটভাই। রমলা কিন্তু হয়েচে রূপান্তরিত প্রেমের আকর্ষণে। এখানকার ঘূর্ণাবর্তে ঝলসে উঠেচে বিজন, মাসীমা ও অক্ষয়ের চরিত্রায়ন, যেমন মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিরূপ। তাই রমলার পোষাকে উদ্ভাসিত হয়েচে অনুরাগের রক্তরাগ ও সংস্কৃতি বিলাস: "লাল ডগ্‌ডগে শাড়িতে ফ্লামিঙ্গো; ময়ূরকণ্ঠীতে মাদরাজা, নীলকণ্ঠ, নীলশাড়িতে কস্‌মস্ ....মূর্ত্তিমতী য়ুক্যালিপ্টাস।" এই আবর্তের রূপান্তর হয়েচে "মোহানায়।" কলকাতায় যে জীবনের অন্তঃশীল প্রবাহ, তা কাশীতে হয়েচে আবর্ত আর কানপুরে রূপ নিয়েচে মোহানায়। রমলা ও খগেনবাবুর মিলন হ'লো না। তাদের হ'লো ছাড়াছাড়ি। তাই খগেন বাবু এগিয়ে এলেন কর্মক্ষেত্রে আর রমলা রইল প্রাজাপত্য সাধনায়। এর সঙ্গে মিলেচে শ্রমিক আন্দোলনও। ফলে খগেনবাবুর জীবনে এসেচে রূপান্তর। নিরুদ্দেশ যাত্রায় দুজনের জীবনে নেমে এসেচে নিশ্চিতের যবনিকা, ঘোষিত হয়েচে "অজানার জয়"। খগেন বাবুর জীবন স্রোতে যে সব চিন্তা-ফুল ভেসে চলেচে, তারি পরিচয়ে পাওয়া যায় অনুরাগ, অধ্যাত্মায়ন, শ্রমিক আন্দোলনের তিনটি স্তর। জীবনের এই চড়াই-উৎরাইয়ে মিশেচে মনীষার বিশ্লেষণ।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য হ'লো শিল্পায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি অনুপ্রেরণায় আস্থাবান নন। তাঁর সৃষ্টি তখনই সার্থক যখন তিনি হন "রাগান্বিত।" অর্থাৎ তাঁর রচনার পেছনে আছে রাগ, অনুরাগ নয়। বাস্তবের সংস্পর্শে তিনি পান এই রাগ। কথকালিতে তিনি খুঁজেচেন জীবনেরই প্রতিরূপ, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে পুরুষকার। তাই উপন্যাস এগিয়েচে "চরিত্রের অভিব্যক্তি"তে। এরি পরিচিতি বহন করেচে খগেনবাবু, সুজন ও রমলা। তাই কেন'র চেয়ে কেমনে'র উপরই তাঁর ঝোঁক বেশি। তাঁর নিজের কথায় বলা যায়—"আমি তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, প্রাণপণে চেষ্টা করি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে। সেই জন্যই বোধ হয় কেন'র চেয়ে কেমন এর দিকে আমার পক্ষপাত"। কলমের থেকে যা বেরোয় তাই ললিতকলা নয়। তাকে মেজেঘষে রূপদেওয়াতে ফুটে ওঠে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও সুষমা। কাজেই লেখকের রচনায় বেশি ক'রে চোখে পড়ে তাঁর রূপায়ন কৌশল, যাতে মিশে আছে উপাদান ও উপায়ন। বস্তুত এই যৌথরূপই প্রয়োগ দক্ষতার সাক্ষ্য।

(৪) বনফুল (১৮৯৯—)

সংস্কৃতি এগিয়েচে বিজ্ঞানের অভিযানেও, যেমন বিদেশ-ভ্রমণে দিলীপকুমার অন্নদাশঙ্করে, যেমন মনায়নে ধূর্জ্জটিপ্রসাদে। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি হ'লো পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত, প্রাণিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, নৃবিদ্যা প্রভৃতি। এরি মারফতে বস্তুর হয়েচে নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার। কার্যকারণ সম্বন্ধে বস্তুপরম্পরার মধ্যে হয়েচে যোগসূত্র স্থাপন। এরি রূপায়নে যিনি দেখা দিয়েচেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তিনি হ'লেন বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

সন্ধানী আলোর সহায়তায় তিনি বস্তুর আন্তর রূপ দেখেচেন আর চিকিৎসকের ছুরি চালিয়েচেন তার নকসা-কাটায়। নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাই তাঁর কাজে লেগেচে ফলে রূপালি রোদে ঝলসে উঠেচে ঝিলিক-মারা ইস্পাতের মতো বুদ্ধির ক্ষুরধার আর ভাবের জেল্লা। দেশজ মানুষ নিয়ে তাইতো এগিয়েচে এ বিজ্ঞান-বিলাস। এতে আছে রহস্য অপসারণের চমক। তা হ'লেও, নেই এখানে অতীন্দ্রিয় স্পর্শ কিংবা তুরীয় সাধনার ফলন। নিছক বস্তুতান্ত্রিক হিসেবেই তিনি দেখেচেন বস্তুকে। তাই বাস্তবের অকুণ্ঠিত প্রকাশনে আছে অগ্রগতির সাক্ষ্য। এতে স্থানে স্থানে রচনা থমকে দাঁড়িয়েচে, এগোয়নি রসোত্তীর্ণতার দিকে। বস্তুজীবনে আছে যে প্রেতি তা জীবনায়নে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে আর চলে জীবন। এ চলেচেই শুধু। এই "অকারণ অবারণ চলার" বিস্তারে আছে গতিবাদের বিকাশ আর এ চলেচে মানুষী গহনে ও জাগতিক বস্তুসত্তায়। এই যে বনিয়াদ তৈরি হ'লো এরি উপর বনফুল তুলেচেন তাঁর কথাসাহিত্যের ইমারৎ। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সধর্মী। বস্তুতঃ "বলাকা" ও "জঙ্গম" যেন একই শক্তির পরিচায়ক। তবে রবীন্দ্রনাথে প্রাণন হয়েচে রহস্যরূপোলি যা বনফুলে অনুপস্থিত। জীবন ব'য়ে চলেচে আর বনফুল দূরবীন হাতে দেখেচেন এর শোভা। মাঝে মাঝে অবিশ্যি তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েচে রঞ্জনরশ্মি যাতে ধরা পড়েচে বস্তুর শিরা-উপশিরাও। এই যে তান্ত্রিক সাধনা এ বিজ্ঞানের। এখানে নেই রহস্যবোধের ঝলক। এও একরকমের জীবনবেদ যা পাশ্চাত্ত্যেরই দান। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিপ্রদীপে যে আলোকপাত সম্ভব হয়েচে তার মৌল সত্তার পরিচয় লেখক নিজেই দিয়েচেন এ-ভাবে: "আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সর্বত্রই সন্ধানী আলোকপাত করবার দিকে আমার প্রবণতা।"

বনফুল কাব্যচর্চা নিয়ে যে সাহিত্য জীবন সুরু করেছিলেন ১৯১৮ এ, তা "তৃণখণ্ডের" গল্পে রূপান্তরিত হ'লো ১৯৩৫-এ। সাহিত্য বাহনের এ রূপান্তরে আছে রূপচর্চা ও। বলনের বাহন কি হবে এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি পেয়েচেন এর সন্ধান। কথকালির ধাঁচকে ভিত্তি ক'রে তাই দেয়া যায় উপন্যাস-পরিচয়। এতে আছে পাঁচটি স্তর—আত্মজৈবনিক, কাথনিক, মিশ্রকী, চিত্রোপন্যাস ও নাট্যোপন্যাস। ঢঙে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি বিষয়বস্তুতে বিভিন্নতা। কথাশিল্পীর কথা বৈচিত্র্য এনেচে কথনবৈচিত্র্য। বস্তুত বৈজ্ঞানিকের নিয়ম ও তাই। যেহেতু তিনি রূপ নিয়ে মেতে উঠেন, তাই আসে রূপকল্পের বিহার। গল্পায়ন পদ্ধতিতে প্রথমেই লক্ষণীয় গীতিকার আত্মজৈবনিক ঢঙ। এখানে লেখক নিজেই একটি চরিত্রের ভূমিকায় নেমেচেন আর গীতলতায় এগিয়েচেন। স্মৃতি-রোমন্থন হ'লো এরি অনিবার্য্য ফল। তাই ফ্রয়েডীয় রীতিতে এগোয় গাল্পিকতা, যাতে অতীত ও বর্তমান একসূত্রে গাঁথা। এরি পরিচিতি বহন করচে "তৃণখণ্ড" (১৯৩৫), "বৈতরণী তীরে" (১৯৩৬), "কিছুক্ষণ", "রাত্রি" ও 'স্থাবর" (১৯৫০)। "তৃণখণ্ড" ডাক্তারের জীবন নিয়ে লেখা। ডাক্তারই তৃণখণ্ড যা জীবন স্রোতে

ভেসে চলেচে। অথচ মজা এই যে মজ্জমান লোকে "তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাতবাড়াইবে"। গতিবাদ রূপায়িত হয়েচে কবির ভাষায়—

জলের তাড়নে এক গাছি খড় দূরে চ'লে যায় ভেসে,
ভেসে চলে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে,
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।

বিবেক নিয়ে এতকাল যে সংস্কার ছিল, তাকে বিজ্ঞানীর কাছে দেখা গেলো "সামাজিকবুদ্ধি" হিসেবে। বস্তুত সামাজিক রূপই অচৈতন্যে বেঁধেচে তার বাসা। ফলে দ্বৈতব্যক্তিত্বের রূপায়ন চোখে পড়ে। এই খণ্ডন কার্যে সহায়তা করেচে ফ্রয়েডীয় আবিষ্কার। আর এসেচে Dr. Jekyll ও Mr. Hyde : কু ও সু। কাজ ও প্রেম তাই পাশাপাশিই বয়ে চলেচে এখানে। প্রাণকৃষ্ণ ভাবচে ভাগ্নের জ্বর ও প্রেমের কথা। পাঁচু গোপাল পাগলীর মৃত্যুতে শোকাকুল হ'লেও বিয়ে কচ্চে আবার। তার পর "বৈতরণী তীরে" "শুধু ভূতের গল্প নহে—বর্ত্তমানেরও গল্প এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও।" এখানে মনের গহনে কি লীলা চল্‌চে তারি উদ্‌ঘাটন। মড়ারা সব কথা কইচে। বক্তা ল্যাপল্যাণ্ডের যুবক যুবতীর প্রেমের কাহিনী পড়চে আর স্মৃতির সুড়ঙ্গ পথে আস্‌চে মড়ারা। কেউ মরেচে উদ্বন্ধনে কেউ পটাশিয়াম সায়ানেডে, কেউ বা ক্ষুর প্রয়োগে। এভাবেই অপমৃত্যু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে।

"কিছুক্ষণ" গতিবাদের সমর্থক, যাতে দেখা যায় "সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।" ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে গাড়ি উল্টে যাওয়ায়-অসংলগ্ন জনতার ভিড়ে এসেচে Mertha ও Paul এবং মাখন ও বিনোদিনী। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেচেন : "সাবাস! উল্টে পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্য থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয়, পথ্যও বটে।" "রাত্রি" কিন্তু চলমান জীবনের প্রতিবিম্বন হ'লেও রহস্যরূপোলি। এখানে বিজ্ঞানী হঠাৎ যেন "বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহরে" একটু বেসামাল হ'য়ে পড়েচেন আর অচৈতন্য ভর করেচে তাঁকে স্বপ্নিলতায়। ফলে রাত্রির কথায় ফেটে পড়েচে রহস্যের অতীন্দ্রিয় স্পর্শ ও প্রকৃতির জয়গান। রাত্রির ভাই স্বর্ণেন্দু বংশীকে খুন করে ফাঁসি মঞ্চে ঝুলেচে। বংশী ছিলো রাত্রির প্রেমে মুগ্ধ। রাত্রিও চ'রে বেড়াচ্চে কখনো জ্যোতির্ময় কখনো অবনীশের সঙ্গে। পরে সন্তান সম্ভবা হ'য়ে জন্ম দিলো প্রভাতকে। এখানে রাত্রি-প্রভাতের রূপক আছে। কিন্তু সন্তানটি মারা যায়। ভাইবোনের যৌন-সম্পর্কে ফুটেচে রাত্রি ও জ্যোতির্ময়ের প্রেমবিলাস। গোয়েন্দাগিরিতে হয়েচে রহস্যোদ্‌ঘাটন। একটা ভাঙনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট সর্বত্র, যা সমাজেরই প্রতিরূপ। তাইতো রাত্রিকে মনে হয় "একটা আকাশচারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি করে মাটিতে নাবিয়ে এনেচে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল তাতে মাতৃ

হৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল শরাহত ভগ্ন পক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ।" তাইতো রাত্রি নিরুদ্দেশ হ'লো। শোকান্তিকা এখানে মর্মান্তিক, যেহেতু মানুষ চিত্রিত হয়েচে নিয়তির ক্রীড়নক হিসেবে। "স্থাবর" কিন্তু নৃবিদ্যার পুরাতাত্ত্বিকতায় এগিয়েচে। মানুষ সৃষ্টির নির্ঝরে নেবেচে এ। লেখক তাই বলেচেন—"মানব জাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইল।" কাজেই এর বক্তা "অনাদি পুরুষ", যিনি "যুগযুগান্তরে বহু খণ্ড জীবনের সংস্পর্শে" এসেচেন। এর রূপ কিন্তু ধরা পড়বে আত্মানুসন্ধানে, যেহেতু প্রত্যেক মানুষী রক্তে আছে এর স্পন্দন। মানুষের পুরাতত্ত্বকে এখানে করা হয়েচে উপন্যাসের উপজীব্য। এ এক নতুন অধ্যায় রচনা করেচে শিল্প জগতে।

দ্বিতীয় স্তর হ'লো কাথনিক। কথকতায় এসেচে গীতলতার বহিঃপ্রকাশ। জীবনায়নের অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করেচে এর রূপ। আত্মজৈবনিকতা তাই রূপান্তরিত হয়েচে কথন প্রাধান্যে, যেখানে গল্পলিখিয়ে নিয়েচেন নিরাসক্তির আসন। এ ধাঁচ-নিরূপক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেচে 'দ্বৈরথ' [১৯৩৭], 'মানদণ্ড' [১৯৪৮] ও 'ডানা' [১ম-২য় পরিচ্ছেদ ১৯৪৮-৫০] এবং 'নির্মোক' [১৯৪০], 'জঙ্গম' [১ম-৫ম অধ্যায়, ১৯৪৩-৭৫] ও 'নবদিগন্ত' [১৯৪৯]। এখানে তাই লক্ষণীয় দুটি অনুস্তর। প্রথমে আছে বস্তুর বৈপরীত্য-দর্শন আর দ্বিতীয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা। কাজেই বস্তুর যে বাহ্যরূপ, তাও আন্তর সাদৃশ্যের নামান্তর। বাহ্যবিকাশে 'দ্বৈরথ' দেখা দিয়েচে উগ্রমোহন সিংহ ও তার শ্যালক চন্দ্রকান্ত রায়ের আদর্শ-সংঘাতে। রহস্য এসেচে উগ্রমোহন-বঙ্কিকুমারী-গঙ্গাগোবিন্দ ত্রিভুজে, যার উপজীব্য হ'লো প্রেম। এ কিন্তু পুষ্টিলাভ করেচে বাহিনী নদী, বাজরা ও গানের পরিবেশে। 'মানদণ্ড'ও নির্দেশ করেচে বিচারের মান। তুঙ্গশ্রীর মানদণ্ড প্রতিফলিত হয়েচে লোকোন্নয়নের আদর্শে, যেমন বীরার অস্পৃশ্যদের মুক্তি সংগ্রামে ও অলকার নারীর আত্মরক্ষায়। এদিকে ডাঃ হিরণ্যগর্ভের সাধনা পরিব্যাপ্ত হয়েচে সাপ-ব্যাঙের পরীক্ষানিরীক্ষায়। মানদণ্ডের ঘূর্ণিঝড় বস্তুর বাহ্যরূপই প্রকাশ করচে। এরপর 'ডানা'য় এ আদর্শ বৈচিত্র্য ধরা পড়েচে পাখী প্রীতিতে। কিন্তু আদর্শ ভিন্ন হ'লেও উদ্দেশ্য এক। হরেক রকমের পাখীর সমাবেশে দেখা যায় গয়লাবুড়ী, সোনাপাখি, খঞ্জন, রেডষ্টার্ট, কাদাখোচা, ধনেশ, রাজহংস প্রভৃতি। কবি আনন্দমোহন, বিজ্ঞানী অমরেশ সেনগুপ্ত ও বস্তুতান্ত্রিক রূপচাঁদের পাখী ধরার শখ এগিয়েচে ডানাকে কেন্দ্র করে। বাইরের কাঠামো ভিন্ন দেখালেও, এদের ভিতরকার রূপ এক। তাইতো ডানার মনে হয়েচে "আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাদবাবুর একশো টাকার মোট একই জিনিষের দুই রূপ, রসায়ন শাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন।" এখানে যে ভাবে পক্ষিজগতের রূপ উদ্ভাসিত হয়েচে তা স্মরণ করিয়ে দেয় **Maeterlinck-এর Life of the Bee-কে।**

এর পর দ্বিতীয় অনুস্তরে দেখা যায় বাহ্য আদর্শ সংঘাতের ভিতরকার দর্শন।

'নির্মোক'-এ ব্যর্থতাবোধ এসেচে চিকিৎসা ব্যবসায়ের উগ্রতায়। বিজ্ঞানীর মনোভাব এখানে আঘাত খেয়েচে। লেখক তাই বলেচেন—"বর্ত্তমান সভ্যতার বিদ্যা ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের এত প্রভাব বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বিদ্যা সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহার শেষ নাই—ইহা লইয়া ব্যবসায় চলিবে কিরূপে ?" এই প্রশ্নিলতায় এগিয়েচে গল্পায়ন। উপন্যাসটি তাই একটি রূপক। ডাঃ বিমল চট্টোপাধ্যায় এম, বি ১০০০৲ টাকার লোভে মতিলাল চৌধুরীর কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার ভার নেয়। কিন্তু ডাক্তারের নিজেরই মুখে দেখা দিলো ছোটো ছোট গুটি। এতে সে হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে পালিয়েচে আর ছেড়েছে স্ত্রী মণিমালাকে। এর কারণ অবিশ্যি বিমলের আশঙ্কা যে তার কুষ্ঠরোগ হয়েচে। বস্তুত বিমলের কুষ্ঠ হয়নি, তার হয়েছিল ডারমাল লিশ্‌ম্যানিয়াসিস, যা কালাজ্বরের হেতু। বিদ্যাকে ব্যবসায়ের কাজে লাগালে যে আপদ আসে এখানে আছে তারি পরিচয়। এখানে একটা সমস্যা মাথা খাড়া করেচে, যা আরও ব্যাপক হয়েচে 'জঙ্গমের' বহুমুখীনতায়। 'জঙ্গম' গতিবাদেরই সুষ্ঠু প্রকাশ। এ তো জীবনেরই রূপ "যা নিয়ত গতিমান, আদর্শহীন, ধর্মহীন, পশু প্রকৃতির বিকাশ।" এ স্রোতে মানুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। তাই গোটা চরিত্র প্রতিভাত না হ'য়ে, জন্ম দেয় কতগুলি "মুখ ও মুখভঙ্গি"র। প্রায় হাজার চরিত্রের এ-রূপ বিকাশ আছে। 'জঙ্গম' আরম্ভ হয়েচে চলার গতিতে : "(শঙ্কর) তন্ময় হইয়া পথ চলিতে লাগিল"। আর যবনিকাও টেনেচে এরি আবেগে : "সে (শঙ্কর) দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।" প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েচে শঙ্করের পাঠ্য জীবনকে কেন্দ্র করে। স্রোতোবেগে ভিড় করেচে ভন্টু, মৃন্ময় মুখার্জি, বেলা; মিষ্টিদি প্রভৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শঙ্করের বিবাহ। মুক্তা বেশ্যার আসক্তি থেকে সে মুক্তি পেল অমিয়াকে বিয়ে ক'রে। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মের উত্তেজনা এসেছে শঙ্করের বাস্তব জীবনে। চাকরি হ'লো। জীবনায়নে মিললো যতীন-চুন্‌চুন্‌, ভন্টু-ইন্দুমতী প্রভৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ে এসেচে শঙ্করের সাহিত্যায়ন। সে বুঝেচে "জীবনই তো কাব্য। ছোট খাঁচায় বড় পাখির পাখা ঝাপটানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্য জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতি শাসিত মানুষের দুর্দ্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অকৃতের আকাঙ্ক্ষা এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।" এর পর পঞ্চম অধ্যায়ে শঙ্কর নিজেকে নিয়োগ করেচে সমাজের কাজে। বিশ্বরূপ দর্শনে তার যে উপলব্ধি তাই রূপায়িত হয়েচে চিন্তনের অনুপ্রাসে : "অপরকে ভালো করিবার দায়িত্ব তোমার নহে; কায়মনোবাক্যে নিজে তুমি ভালো হও। পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর।" এই হ'লো জীবনের মূলমন্ত্র। এখানকার চরিত্রায়ন না এগোলেও, নামকরণে আছে কৃতিত্ব, যেমন গ্যানচথ, লদ্‌কালদ্‌কি, খুজবুজ, চামলক্‌, বিডভিকার, ক্যানভ্‌ল। এর জন্যে ভন্টু চরিত্র সমুজ্জল, যেমন হয়েচে করালীচরণ। জীবনের গতি পথে তাই তো 'নব দিগন্ত' [১৯৪১] এসেচে রম্যাঁ রলাঁর I will not restএর অনুপ্রেরণায়। এতে মিশেচে 'জাঁক্রীস্তফের' রসও

পিতা পুত্রের সংঘাতে এই দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েচে। দিবস বৈজ্ঞানিক আদর্শের অনুসন্ধানে কৃচ্ছ্র সাধনার পর বিমানে ছুটলো ইউরোপের দিকে। আর পড়ে রইলো বৃদ্ধ বাপ সূর্যকান্ত চৌধুরী। কাব্যিক ভাষায় দিবসের জীবনায়ন ফুটেচে। একে একে মৃৎপাত্রের মতো সে ফেলে দিয়েচে বাপের স্নেহ, রঞ্জনার প্রেম, দেশজ সংস্কার। বিজ্ঞানের উড়ন্ত ছন্দই তার কাছে ধরা দিয়েচে। কিন্তু নতুনের যতই চমক থাক না কেন, "ছন্দে না মিললেও নূতন এবং পুরাতন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বাঁধা।" তাই তারা চায় পরস্পরকে, কিন্তু পায় না—"রূপান্তরিত হয়েও একজন আর একজনকে চিনতে চায়, কিন্তু পারে না, নাগাল পায় না।" কাজেই জমে ওঠে নাটক যা নব দিগন্তের ব্যঞ্জনায় মুখর।

তৃতীয় স্তরে এসেচে মিশ্রকী, যা হ'লো গদ্য-পদ্য-নাট্যের মিশোল। উপন্যাস এক রকমের মিশ্রশিল্প। কিন্তু বনফুল এখানে মিশ্রতাকে করেচেন আরও বিস্তৃত। এর পরিচিতি বহন করচে 'মৃগয়া' [১৯৪০]। 'গ্রামে' পর্বে শিকার-যাত্রার বিবরণ আছে পদ্যে। হিরণপুরে জেগেচে শিকারের সাড়া আর এর কর্ণধার হয়েচে বিপিন ঘোষ, হরু মণ্ডল, জগদেও পাঁড়ে ও ঝাংরু সর্দার। 'পথে' পর্বে গরুগাড়ির বহরে চলেচে যাত্রা, যা রূপায়িত হয়েচে গদ্যে। রতনদীঘি, বাতাসপুর, কালভৈরবের মাঠ, তপসেডাঙ্গা প্রভৃতি ঝিলিক দিয়েচে এ-পরিক্রমায়। 'প্রান্তর' পর্বে শিকারকাহিনী বয়ে চলেচে ৬টি দৃশ্যে। ময়না নদী, ছোট বাবুর তাঁবু ও তরঙ্গিণী বেশ একটু রহস্যের তরঙ্গ তুলেচে। এখানে খেয়ালী কল্পনাই জয়ী হয়েচে। তাই তাকে বাস্তবে ধ'রে রাখার জন্যে দরকার হয়েচে নাট্যের। এর পর চতুর্থ স্তরে 'চিত্রোপন্যাস' স্মরণীয়। এ রূপকল্পে মিশেচে চলচ্চিত্র ও উপন্যাস—একের ছবি, অন্যের কথন। এর পরিচায়ক হ'লো 'সপ্তর্ষি' (১৯৪৫), যা এগিয়েচে চিত্রণ ও কথনের যুক্ত ডানায়। সাতটি চরিত্রে রূপায়িত হয়েচে কাহিনী। এক একটি কেন্দ্রক হ'লো হংসশুভ্র, সোমশুভ্র, শশাঙ্কশুভ্র, মৃগাঙ্কশুভ্র, শঙ্খশুভ্র, রজতশুভ্র ও হীরকশুভ্র। রাজনীতির বিবর্তনে এরা এক একটি স্তম্ভ। অভিব্যক্তির শেষ বিন্দুতে ফুটেচে সমাজতন্ত্রের রূপ যা প্রকাশ পেয়েচে রজতকে লেখা হীরকের চিঠিতে :—"Democracy পুরাতন রাজতন্ত্রেরই নব রূপ। নূতন রাজাটির নাম টাকা। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে। মাথা বিকিয়ে দিয়েও কিন্তু তাদের স্বস্তি নেই।" রাজনীতির বনিয়াদে উঠেচে 'অগ্নি'ও [১৯৪৭]। এই অগ্নি হ'লো প্রাণনেরই রূপান্তর। অন্তরা—অংশুমানের ফাঁসিতে পরিসমাপ্তি হয়েছে এদের প্রীতিভালবাসার। নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরার স্বপ্ন দেখচে কারাবাসী অংশুমান। এতে এসেচে মনোবিকলনের ব্যাপ্তি এবং চলচ্চিত্রের 'মণ্টেজ'-পরিকল্পনা। গোটা জীবনপ্রবাহে রাজনীতিও যে একটি বুদ্বুদ, তারি পরিচায়ক এসব রচনা।

রূপায়নে পঞ্চম স্তর এসেচে নাটক ও উপন্যাসের মিশ্র শিল্পে, যার নাম দেয়া যায় "নাট্যোপন্যাস"। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ এখানে এগিয়েচে মনের গহনে। মনের রূপ ধরা পড়েচে ব্যক্তিত্বের দ্বিধা খণ্ডনে। এরা দুই ভাগ হ'য়ে কথা কইচে নাটকীয়

চরিত্রের মতো। তা হ'লেও গল্পায়ন অক্ষুণ্ণ হয়নি। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হ'লো "সে ও আমি" এবং "স্বপ্ন সম্ভব" [১৯৪৬]। প্রথমের 'সে' ও 'আমি' ব্যক্তি-মানসেরই দু'টো রূপ। এ ফুটে উঠেচে কখনো P. S. Dutt ও মোহনলালের 'আমি'ত্বে, কখনো ছাত্রাবাসে, কখনো দার্জিলিঙে, কখনো বা আরবের মরুভূমিতে। মনোবিকলনে প্রবৃত্তির রহস্যলীলা উন্মোচিত হয়েচে এখানে। এই ব্যক্তিত্ব খণ্ডনে সমাজের ভাঙনই প্রকট হয়েচে। এর জন্যে দায়ী সময়ের দ্বিধারূপও। সময় চেতনা সত্যি সহায়তা করেচে এ-ধারার বিকাশে। Dunne-এর An Experiment with Time এ-প্রসঙ্গে স্মরণে আসে। সংলাপে প্রকাশ পেয়েচে নিজত্ব ও পরত্ব। কথা-সাহিত্যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এ-উদ্ঘাটন মৌলিকতার দাবী করতে পারে। এরপর "স্বপ্নসম্ভবে" ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন রূপায়িত হয়েচে ভাষার কায়ায়। মনের গহনে যে ঘূর্ণিঝড় বইচে, তারি বাহ্যরূপ দেখা যায়। যতীনবাবু খবরের কাগজ পড়চে—এ থেকে হয়েচে নাটকের উৎপত্তি। তাই এ "নাটক মহানাটক। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ নাটকের দৃশ্যপট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত কিছুই ইহার মুখ পাত্রপাত্রী"। মানসপটে বিচরণ করচে ভ্রমর, টিক্‌টিকি, ফ্রয়েড, সীতা, অহল্যা নীলা ও এ্যালার্ম। শুধু তাই নয়, লেনিন, যীশু খ্রীষ্ট প্রভৃতিও ভিড় করেচে। অতীত তাই চিত্রের জৌলুসে হাজির হয়েচে। তারপর দৃশ্যান্তরে এসেচে বর্তমান আর যতীন ভাবচে বোনের বিয়ের কথা। আবার অতীতে ডুব দিয়েচে স্মৃতি। একে একে কঙ্কালগুলো ভেসে উঠচে পাশু, বন্দিনী, বিশু রূপে। মানসে ফুটেচে মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি সফর ও মানুষের আর্তনাদ। বর্তমান সভ্যতার বিশ্লেষণে তাই মনে হয় "লক্ষ্মণের বুকে রাবণ আজ যে শক্তিশেল হেনেছে, তা যে হিন্দুবিদ্বেষ তা সে বুঝতে পারছে না। গন্ধমাদনেই এর ওষুধ আছে। গন্ধমাদন পাহাড় নয়—গন্ধে যা চতুর্দিক আমোদিত করে অথচ যা পর্বতের মতো দৃঢ়, সেই মানব চরিত্রের নাম গন্ধমাদন। বিশল্যকরণীও গাছের শেকড় নয়, ও সব রূপক—যা সত্যি মানুষকে বিশল্য অর্থাৎ বেদনামুক্ত করে, তার নাম—ভালবাসা, প্রেম।" মনোরাজ্য চিত্রণে যে নতুন আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েচে, তাতে আছে বিস্ময়ের চমক।

এই যে উপন্যাস-পরিক্রমা শেষ হলো, এতে দেখা যায় বনফুলের বৈশিষ্ট্য ফুটেচে কথকতার আঙ্গিক আবিষ্কারে ও প্রয়োগে। রূপরূপান্তরই এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। এতে যে অভিনবত্ব ফুটেচে, তার জন্যে তিনি সত্যি প্রশংসার্হ। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও বৈচিত্র্য এসেচে। মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরই উদ্ভাসিত হয়েচে বৈজ্ঞানিক আলোকে ও সাহিত্যিক ভাষায়নে। বিশ্লেষণী প্রতিভারই এতে হয়েচে জয়জয়কার, যা স্মরণে আনে মধ্যবিত্ত ভাঙন। ফলে সাহিত্যিক ইমারতে গড়নের চুন সুড়কিই অনেক সময় ধরা পড়ে। ঔপন্যাসিকের মায়া-সিমেণ্টের পলেস্তারা পড়েনি এখানে। এর জন্যে দায়ী অবিশ্যি তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি যা সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখানোতেই বেশি আনন্দ পায়। কাজেই সব রচনাই রসোত্তীর্ণ

হয় নি। ছোটছোট চরিত্রের নকসা-কাটার জেল্লাই এখানে বড় কথা। তবে ভাবায়নে এসেচে যে জীবনদর্শন তা গতিবাদেরই নামান্তর। একে 'জঙ্গম'-দর্শনও বলা যায়, যা বস্তুর ভিতরকার প্রাণ-চাঞ্চল্যই ফুটিয়ে তোলে। এরি ব্যাপক প্রসারে কথা সাহিত্যের সীমা হয়েচে বিস্তারিত, আর এসেচে 'প্রসাদ' গুণের প্রসন্নতা। আর এইখানেই হ'লো বনফুলের বৈশিষ্ট্য।

(৫) সুবোধ বসু

সংস্কৃতির অভিযানে একদিকে যেমন দেখা যায় মনন, অন্যদিকে তেমনি কল্পনা বিহার। একের মনস্তাত্ত্বিকতা, অন্যের খেয়াল, এদুয়ে মিলেই চলেচে সংস্কৃতি-বিলাস। বস্তুর রূপ উন্মোচনে সহায়তা করেচে ফ্রয়েড, এ্যাডলার, য়ুং প্রভৃতির মনোবিকলন। এর জটিলতা আধুনিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেচে। তাই এ-থেকে মুক্তির জন্যেও মানুষ খুঁজেচে কল্পনাবিহার। সংস্কৃতির এই দিকটা বিংশোত্তর যুগে দেখা দিয়েচে মণীন্দ্রলালে। এ আরেকবার এসেচে সুবোধ বসুতে যান্ত্রিকতায় বর্তমান দুনিয়া এগোলেও, এর রহস্য অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান বস্ত্র দ্রৌপদীর আবরণ খুলেচে বটে, কিন্তু তাতে সে একদম বস্ত্রহীন, উলঙ্গ হয়নি। একে ঢেকে রেখেচে রহস্যের ইন্দ্রজাল। মানুষের পরিবেশেই আছে এই রহস্যঘন অনুভূতির স্পন্দন। আর এই পরিবেশ কল্পনায় মিশেচে পল্লী ও শহর। বস্তুত এ-রহস্যের স্বরূপ ধরা পড়েচে একরকমের প্রাকৃতিকতায়, যা রহস্য-রূপোলি। কাজেই সুবোধ বসু তুলেচেন দু'টি বিন্দুতে—একদিকে পল্লী, অন্য দিকে শহর। কিন্তু এ দুই ঘিরেই আছে রহস্য, যা ঈথরের মতো জড়িয়ে আছে গোটা পরিবেশে। এর সত্তায় আছে অনুভূতির সূক্ষ্মতা। এও এক প্রকারের বিলাস যা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে। কাজেই যান্ত্রিক যুগেও এরকম অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও রূপায়ন সত্যি বিস্ময়কর। এখানে ফুটেচে প্রতিভার স্পর্শ।

সুবোধ বসু এগিয়েচেন প্রেমের যৌন ভিত্তিতে। তবে এর উপর ভর করেচে নাগরালির ইস্ত্রীকরা ভদ্রতা। তাঁর কল্পনা ছুটেচে পল্লী থেকে শহরে, মর্ত্য থেকে স্বর্গে। নাগরিক সভ্যতাই জয়ী হয়েচে গ্রামীন সংস্কৃতির উপর। মোট কথা মধ্যবিত্ত মানসই এখানে হয়েচে রূপায়িত। সাধারণ ঘটনা প্রবাহে তাই ধরা পড়েচে পরিক্রমার চেহারা। প্রতিভার দোলক দোল খেয়েচে পল্লী ও শহরের দুই বিন্দুতে। তাই গ্রামীনতা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েচে শহুরে চটকে। কাজেই দু'টো বিশেষ স্তরে এ প্রবাহকে অঙ্কিত করা যায়—এক গ্রামীন, দুই শহুরে। প্রথম স্তরে পাওয়া যায় 'বন্দিনী' (১৯৩৭), 'নটী' (১৯৩৭), 'স্বর্গ' (১৯৩৮) ও 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' [১৯৩৬] আর দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য হ'লো 'সহচরী' 'রাজধানী' (১৯৪৩), 'পদধ্বনি' (১৯৪৫) ও 'পাখীর বাসা' [১৯৪৮]। আরেকটা দিক উদ্ঘাটিত হয়েচে

'নবমেঘ দূত' মানবের শত্রু নারী' ও 'স্ত্রীবুদ্ধে'। এ তৃতীয় স্তর হ'লো নরনারীর প্রেম সমস্যা নিয়ে। তবে এ অন্য দুটো ধারারও ভিৎ। কাজেই এদের পরিচয়ে পাওয়া যায় যৌন আকর্ষণের রূপরূপান্তর।

পল্লী রূপায়নে "বন্দিনী" উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি-পরিবেশে মানুষের রিক্ততা বন্দিনীর মতো। একদিকে সৌন্দর্য-প্রাচুর্য, অন্য দিকে মানুষী অপ্রতুলতা। এই বৈষম্যেই বান্দার চেহারা ফুটেচে। মানুষ ও প্রকৃতি মিলেই চলে সৃষ্টির কাজ। একের অভাবে সৃষ্টি হয় অপূর্ণ। তাই সৌন্দর্য-বিশ্লিষ্ট উত্তরা হয়েচে খাপছাড়া। দীপঙ্করের চরিত্রায়ন বেশ স্পষ্ট। শহর ক্রমে ক্রমে এগোচ্চে। তাই এ অগ্রগতির সাক্ষ্য মেলে 'নটী'তে। পল্লীস্মৃতি কলকাতার পরিবেশে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেচে। শহুরে আড়ম্বরে আছে কৃত্রিমতা। রাজীব ও আশালতার প্রেম বিবাহে রূপান্তরিত হ'তে পারেনি, যেহেতু সমাজ এসে এর কণ্ঠরোধ করেচে। পরে আশার রূপান্তর হয়েচে মণিকা বাইজীতে। পরিণতি হ'লো পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা। এ যেমন জীবনের শোকান্তিকা, তেমনি নাগরালিরও। শহুরে ভদ্রতার রূপ ফুটেচে বর্ণনার বর্ণিলতায়: "ঝলসিয়া উঠিয়াছে তার পরণের ঘাঘরা, তার রঙিন মসলিনের জড়িদার ওড়না, জ্বলিয়া উঠিয়াছে কানের হীরার টোপ, হাতের জড়োয়ার বাজু ও সোনার সরুবালা।" এর পর 'স্বর্গে' প্রশান্ত-চামেলির প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়েচে। মৃত্যু-রহস্যের অন্তরালে প্রশান্ত'র যে মানস-পরিক্রমা তা অজ্ঞেয়তার পরিচায়ক। এ স্বর্গের সঙ্গে তুলনীয় দান্তের paradiso ও মিলটনের স্বর্গ। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় পৌরাণিক স্বর্গ-কল্পনাও। অনুভূতি পৌঁছেচে এখানে রবীন্দ্রনাথের মতো "অলোক আলোক তীর্থে"। এই যে অতীন্দ্রিয় স্পর্শ, এতে ধরা পড়েচে মরমিয়া সাধনার উপলব্ধিও। এ সত্যি অভিনব। হাল আমলের A. Huxley-র Time must have a stop-এর তুরীয়ানন্দের কথা এখানে স্মরণীয়। তারপর গ্রাম ও শহর মিশেচে 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'তে। এখানে আছে দু'টো ধারার সমন্বয়, যদিও নায়ক ছুটেচে শহরের দিকে। পদ্মার প্রভাবে আছে রহস্যের ইঙ্গিত, যাতে বাঁধা পড়েচে দুর্গা, হৈমন্তী, হেমাঙ্গিনী, অর্ধেন্দু ও প্রসন্নের পুত্র রাজা ওরফে রজত। বাল্য সহচরী পদ্মা ছেড়ে রজত যৌবনোন্মেষে পাড়ি জমিয়েচে কলকাতায়। পদ্মার প্রভাবেই এসেচে রজতের জীবনে স্বাধীনতার ঢেউ যাতে সে শেষে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেলো সম্পত্তি ছেড়ে। পদ্মা যেন মহাকালেরই নামান্তর। তাই এই ভয়ঙ্কর ফেনিলোচ্ছল রূপ সৃষ্টির এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেচে দুর্বার বেগে আর "পৃথিবীর বুকে ভীম বিক্রমে সে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে—ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্।" এ হ'লো সমাজ-ভাঙনেরই প্রতিরূপ, যাতে ভেঙে যাচ্চে পল্লী, গুঁড়ো হচ্চে সংস্কৃতি, উবে যাচ্চে মধ্যবিত্ত।

তাই দ্বিতীয় স্তরে এসেচে নাগরালির বিলাস। 'সহচরী'তে কলকাতার যে রূপ ফুটেচে, তাতে লতিকা হয়েচে মিঃ গুপ্তের সহচরী। সে অবিশ্যি ত্রিদিবের কমরেড হয়েচে। নারীর জীবন-যাত্রা চলেচে সংভরণ বিভাগে কাজ ক'রে।

সমাজ-ভাঙনে এ এক নতুন রূপান্তর। তারপর 'রাজধানী'র বিলাসে আছে ইঙ্গ-ভারতীয় আভিজাত্যের ছায়া। এরি পরিচিতি বহন করচে মিসেস ম্যালহোত্রার ফিনিশিং স্কুল, অরুণা—মণীশের সংলাপ-আচরণ আর দিল্লীর এ, বি, সি, ডি ঘরের সংস্থান। মানুষী সৃষ্টি যে শহর তার ভেতর যে রহস্য আছে এখানে তা দেখান হয়েচে। মধ্যবিত্ত বিলাস তাইতো রূপায়িত হয়েচে: "ঢং করিয়া জয়ঢাকের শব্দ হইল; কিংখাবের পর্দা ফাঁক হইয়া সরিয়া গেল। দ্বাপর যুগের যমুনার কালো কোমল জল প্রবাহিত হইল; কদম গাছে গাছে থারা কদম্ব ফুটিয়া উঠিল"। সমাজ-ভাঙার ইতিহাসে 'পদধ্বনি' স্মরণীয়। এ বোমার হিড়িকে যে অপসারণ লীলা চলেছিল, তারি রূপায়ন। এর সঙ্গে তুলনীয় অচিন্ত্যকুমারের 'যায় যদি যাক'। এর কাহিনীকাল হ'লো ১৯৪২-৪৩। সুপ্রকাশ ও সুমিতার হাব ভাবনিয়ে গল্পায়ন এগিয়েচে। এতে সুমিতা হ'লো গর্ভবতী ও সন্তানের মা। সুনীলা চাইচে সুপ্রকাশকে; কিন্তু সুপ্রকাশ খুঁজচে সুমিতাকে। নাগরিক সভ্যতায় যে চিড় ধরেচে, তা বেশ ফুটেচে: "এই নগরী কত জীবিকার সংস্থান করিয়াছে, উৎসব সভায় কত দীপ জ্বালিয়াছে, আজ তার দুঃসময়ে কাহারও আর তাহা মনে রহিল না; ব্যাধিগ্রস্তা নটীর মতোই সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল।" এ-ভাঙনের প্রান্তে এসেচে "পাখির বাসা।" এর পূর্ব নাম "নীড়" ছিল। দার্জিলিঙের "অরুণাচল" বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী অসীমাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেচে উপন্যাসটি। অসীমা প্রেমে পড়লো অজিতের সঙ্গে; পরে তারা মিলনের পথে এগিয়ে এলো। এর সঙ্গে তুলনীয় রাজধানীর বিদ্যালয়টি। এখানে ফুটে উঠেচে মধ্যবিত্ত বিলাস।

সুবোধ বসু স্মরণীয় হ'য়ে রইলেন মধ্যবিত্ত বিলাসে। তাঁর সংবেদনশীল মনে দাগ কেটেচে বস্তুর যান্ত্রিক রূপ ও পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু গোটাটাই রহস্যের মলমে ঢাকা পড়েচে। ফলে, এসেচে এক রকমের অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ। এতে বস্তুর রূপই অপরূপ হ'য়ে ধরা দিয়েচে। প্রকৃতির লীলা চাঞ্চল্যই এখানে বড় কথা। তবে এর জৌলুসটা হ'লো নাগরিক সভ্যতার। এখানে তাই সক্রিয় হয়েচে ওয়ার্ডসওয়ার্থী কল্পনা। কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক থেকে এতে নেই বৈচিত্র্য। একই পরিবেশ ও নরনারীর সম্পর্ক এখানে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েচে। কাজেই একঘেয়েমি এসেচে অনিবার্য ভাবেই। তবে রহস্যের পলেস্তারায় ঢাকা পড়েচে বস্তুর রূপরূপান্তর। এজন্যে সুবোধ বসু উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি বিলাসের চিত্রণে।

(৬) জীবনময় রায়

মননের শুষ্ক জমিতে যিনি মিশিয়েচেন হৃদয়াবেগ তিনি হ'লেন জীবনময় রায়। এখানে সংস্কৃতিবিলাস ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও কল্পনাখেয়ালের যৌথ ফল। তাঁর 'মানুষের মন' [১৯৩৭] বাস্তবের পটভূমিকায় এঁকেচে চিরন্তন ত্রিভুজ—

শচীন-কমলা-পার্বতী। শচীনের স্ত্রী কমলা কুম্ভমেলার ভিড়ে হারিয়ে যায় এবং তার স্মৃতিবিলোপ ঘটে। এই সুযোগে শচীন-পার্বতীর আকর্ষণ বেড়ে উঠেচে। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তরায় হয়েচে শচীন-কমলার প্রেমের একনিষ্ঠা। ফলে শচীন দুলেচে কমলা ও পার্বতী বিন্দুতে। শচীন-পার্বতীর সম্পর্কে চিড় এসেচে কমলার পুনরাবির্ভাবে। কমলা যেন প্রেমের 'প্রোথিত বীজ' আর পার্বতী এর বিকাশনী 'সৌর কর'। সূর্য ছাড়া বীজ যেমন অন্ধ তেমনি বীজহীন সূর্য শূন্য। কাজেই দুয়ের যোগে ফুটে ওঠে প্রেমের শতদল। তাই দরকার হয়েচে পার্বতীর। এক রাত্রিই উপযোগী হয়েচে শচীন-কমলার মিলনের জন্যে। এই মূল আখ্যানকে পুষ্ট করেচে আর দুটো উপাখ্যান—এক, মালতী-নন্দলালের সংসার চিত্র; দুই, সীমা-নিখিলনাথের সম্পর্ক। প্রথমটিতে কমলাই সেতু রচনা করেচে আর দ্বিতীয়ে নিখিলনাথই করেচে যোগসূত্র রচনা সীমা ও কমলার মধ্যে। শুধু তাই নয়, নিখিলনাথ কমলাকে সহায়তা করেচে স্বামী আবিষ্কারে। এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হ'লো মনায়নে। মনের গহনে যে আণবিক নৃত্য চলেচে প্রবৃত্তির, তারি স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েচে এখানে। মায়া ঘেরা প্রবৃত্তির মর্মে প্রবেশ করেচে মনন আর টেনে বের করেচে ভিতরকার রূপ। কাজেই ছোটখাট আকস্মিকের ত্রুটি থাকলেও মনন গল্পায়নে সরস হয়েচে।

(iv) প্রকৃতি-প্রবাহ

মধ্যবিত্ত বিলাসে সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেচে আর এ আবর্তিত হয়েচে শহুরে পরিবেশে। বস্তুত নাগরালির ইস্ত্রী করা ভদ্রতার আছে চোখ-ঝলসানো রূপ। এর চমকে উদ্‌ভ্রান্তি আনে। এরি সঙ্গে সঙ্গে চলেচে গ্রামীন সভ্যতার রূপায়ন, যা এগিয়েচে পল্লীপ্রকৃতির মারফতে। সংস্কৃতির জৌলুসে প্রকৃতি উপহার দিয়েচে তার সৌন্দর্য। দুয়েরি ঐক্য অজস্রতায়, আর পার্থক্য সৌন্দর্যের রকমফেরে। সংস্কৃতির ভেতর আছে কৃত্রিমতা যা মানুষী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফসল; কিন্তু প্রকৃতির আছে গাছপালা-নদী-পর্বত-পশু-পক্ষীর ছন্দকাকলি যা বিধাতার সৃষ্টি। শেষেরটিতে আছে আদিমতার গন্ধ আর প্রথমটির অনুজের অনুভূতি। কাজেই এ প্রকৃতি জগতের ও বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়।

(১) বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩—১৯৫০)

এই প্রকৃতিপ্রবাহের প্রধান উদ্‌গাতা যিনি তিনি হ'লেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শহুরে দেয়ালের বাইরে যে জগৎ আছে, তা মধ্যবিত্ত বিলাসে ছিল অপাংক্তেয়। অনেক সময় এ প্রকৃতি-জ্ঞান ছিল সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু বিভূতিভূষণকে উপহার দিয়ে প্রকৃতি প্রমাণ করেচে যে তার সৌন্দর্য-ভাণ্ডার জীবনায়নে উপেক্ষণীয় নয়। এই যে প্রকৃতির পরিবেশ এখানে আছে আমগাছের ছায়া, বাঁশের

ঝাড়, বকুলের গন্ধ। এখানে মেলে মুক্তির স্বাদ। তাই শহুরে মন ছোটে রাবীন্দ্রিক বলাকার মতো এরি সন্ধানে। প্রকৃতির পল্লীসম্ভারে আছে কত না রঙের বাহার। মনকে দোলা দেয় "পুকুর পাড়ের ষষ্ঠীতলা, আকন্দফুলের ঝাড়।" এই হ'লো বিভূতিভূষণের কাব্য বিভূতি, যাতে করে ফুটে উঠেচে প্রকৃতিপুঞ্জালুতা। এও একরকমের কল্পনা বিলাস, যার কেন্দ্র হ'লো পল্লী আর পরিবেশ গাছপালা পশুপাখি। এদের সুরমূর্চ্ছনায় তাই বেজেচে একতারার সুর। প্রকৃতির এই উপাসনা প্রাকৃতিকতার নামান্তর। এরি পরিচয় মেলে ওয়ার্ডসোয়ার্থী কাব্যে। বস্তুত লেখক প্রকৃতি প্রবাহ তট থেকে দেখেচেন, যা আবর্তিত হয়েচে কখনো মাঠঘাটের দৃশ্যে, কখনো বা পাখির কাকলিতে। এরা নিষ্পেষিত হয়েচে তাঁর কল্পনাযন্ত্রে আর বেরিয়েচে রসরূপে। এই যে রহস্যঘনতা এর সঙ্গে মনীন্দ্রলালী জগতের তুলনা চলে। মনীন্দ্রলালে যেখানে আছে নাগরালির রহস্য, সেখানে বিভূতিভূষণে পল্লীপ্রকৃতির। এরা দুয়ে মিলে পূর্ণ করেচে প্রকৃতিবৃত্ত। তাই বিভূতিভূষণী জগৎ জীবনানন্দী নির্জনতায় সরস হয়েচে—এখানে "অস্ত্রের ঝঞ্চনা নেই, যান-যন্ত্র-মুখরিত নাগরিক জনতার স্রোত নেই"।

বিভূতিভূষণের মূল মন্ত্রকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর রচনাকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রকৃতিপুঞ্জালুতা, মানবায়ন ও অধ্যাত্মায়ন। প্রকৃতির ভেতর মিশেচে মানুষ ও অতিপ্রাকৃত। তাই মানসবিবর্তনে তিনি এগিয়েচেন প্রকৃতি থেকে মানুষে আর মানুষ থেকে অতিপ্রাকৃতে। কাজেই তাঁর মধ্যে যা ছিল বীজরূপে সুপ্ত, তাই বেড়ে মহীরুহে পেয়েচে পরিণতি। বস্তুত অভিব্যক্তির স্বরূপও তাই। প্রথম স্তরে প্রাকৃতিকতা এসেচে "পথের পাঁচালী" [১৯২৯], "অপরাজিত" [১ম-২য় খণ্ড -১৯৩২], "দৃষ্টিপ্রদীপ" [১৯৩৫] ও "আরণ্যক"-এ [১৯৩৯]। এরপর প্রাকৃতিকতা মোড় ফিরেচে মানবায়নে। কিন্তু এ আবার শেষের দিকে মাথা চাড়া দিয়েচে, যার পরিচিতি বহন করচে "অথৈজল" [১৯৪৭] ও "ইছামতী" [১৯৫০]। এরা পূর্বধারারই অনুবর্তন, যাতে নতুনত্বের তেমন কিছু চোখে পড়েনা। "পথের পাঁচালী" বিভূতিভূষণী বিভূতি নিয়ে হাজির হয়েচে আত্মজৈবনিক ঢঙে। পথই যেন নিজের পাঁচালী নিজে আওড়ে যাচ্চে কখনো "আম আঁটির ভেঁপুতে", কখনো "উড়ো পায়রার" পাখা ঝটপটে। শুধু তাই নয়, নিশ্চিন্তপুরের চিন্তাহীনতায় অপু ও দুর্গার জীবন বেড়ে উঠেচে। লতাগুল্ম, বাঁশঝাড়ই পালন করেচে তাদের, যেমন করেচে ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'লুসি'কে। প্রকৃতি এখানে বাস্তব যেমন বর্তমান পরিবেশে তেমনি পুরনো ঐতিহ্যের যাত্রাকথকতায়ও। ফলে মানুষ ও প্রকৃতির যৌথ প্রভাবে রূপায়িত হয়েচে অপুর জীবন। অপু এক অপূর্ব সৃষ্টি। একে নিয়ে গেচে ভাগ্য বিধাতা দেশপরিক্রমায়, কখনো কাশীতে, কখনো মনসাপোতায়, কখনো বা চাঁপদানিতে। নারীসাহচর্য এসেচে অপর্ণা ও লীলার মারফতে। জীবনের ঘূর্ণি তাকে কতই না আঘাত করেচে, কিন্তু তবু নিরস্ত করতে পারেনি তার অদম্য উৎসাহকে। প্রাণের

জয়ই ঘোষিত হয়েচে কারণ সে "অপরাজিত"। এ হ'লো "পথের পাঁচালীর"ই উপসংহার। অপু হয়েচে অপূর্ব কাল-আবর্তনে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র কাজলকে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ করবার চেষ্টা করেচে সে, কিন্তু এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। কালায়নের ধর্মই পরিবর্তন। ব্যথার দ্রাবক রসে সঞ্জীবিত হয়েচে গল্পায়ন ও চরিত্রায়ন। এখানে বিভূতিভূষণ দিয়েচেন নিজেকে উজাড় ক'রে। তাইতো সৃষ্টি হয়েচে সার্থক। প্রকৃতি-পরিবেশই এখানে মুখ্য। এতে যে আন্তরিকতা আছে, তার সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেচেন—"এমন একটি দিনও যায়নি যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন মনোভাব।... অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রানুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনা সৃষ্ট প্রাণী।" এরপর "দৃষ্টিপ্রদীপে" ফুটেচে দার্জ্জিলিংএর শৈলশ্রেণী ও চা-বাগানের দৃশ্য। এখানে প্রকৃতি ও নায়ক কিছুটা মুখর হয়েচে জনকোলাহলে। জিতু তাই নিছক উদাসী নয়। নিশ্চিন্তপুরের স্নিগ্ধতা এখানে রূপান্তরিত হয়েচে চোখ ঝলসানো দ্যুতিতে। মালতীর চিন্তাই বেশি ক'রে উদ্বেগ এনেচে জিতুর জীবনে। তাহলেও 'সুদূরের পিয়াসী'র ঘর-ভাঙানিয়া সুরই বেজেচে শেষকালে। এরপর প্রকৃতি নিজেই তৈরি করেচে তার পরিবেশ 'আরণ্যক'-এ, যেখানে প্রকৃতিই মুখ্য আর মানুষ গৌণ। বনানীর সৌন্দর্য জ্যোৎস্নালোকে যে কত রমনীয় হ'তে পারে এখানে আছে তারি পরিচয়। প্রাকৃতিকতায় মানুষও হয়েচে বন্য। রাসবিহারী সিংহ ও নন্দলাল ওঝা পশুরই নামান্তর। এদের নেই নির্দয়তার ইস্ত্রী করা রূপ। এখানকার মহাজন ধাওতাল সাহুও প্রকৃতির প্রভাবে আপনভোলা। এ-ছাড়া আছে রাজু পাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুণ্ডা রাজপুতানী। এসব নিয়ে অরণ্যই যেন কথা কইচে।

কালায়নে এই প্রাকৃতিকতা রূপান্তরিত হয়েচে মানবায়নে। মানুষ এসে হাজির হয়েচে প্রকৃতির পল্লী পরিবেশে। এরি পরিচায়ক হ'লো "আদর্শ হিন্দু হোটেল" [১৯৪০], "বিপিনের সংসার" [১৯৪১], "দুই বাড়ী" [১৯৪১], "অনুবর্ত্তন" [১৯৪২] ও "কেদার রাজা" [১৯৪৫]। গণজ ঢেউ এসে লেগেচে "আদর্শ হিন্দু হোটেলে"। হাজারি ঠাকুরের জীবনকাহিনী ফুটেচে বাঁশের মর্মরে, নদীর তরঙ্গে ও আগাছার দোলনে। সামান্য ঠাকুরের জীবন এখানকার উপজীব্য। সঙ্গে সঙ্গে বেজেচে একতারার উদাসকরা সুর। "বিপিনের সংসার"-এ প্রেমের আমদানি হয়েচে মার্জিত রুচিবোধে। বিপিন-মানী-শান্তি ত্রিবেণীর বাঁকে বাঁকে যে কাঁপন লেগেচে তাতে সরলতাই চোখে পড়ে। মনস্তত্ত্বের গহনে যাননি লেখক। সামান্য ঘটনার রূপায়নে দেখা যায় নারী হৃদয়ের দোলাও। তাই বীণা-পটল লীলায় শোনা যায় প্রেমের মৃদু পদধ্বনি। এ-ছাড়া আছে বিনোদ-কামিনী স্মৃতি-রোমন্থন। সবি মিলে ফুটেচে মানুষী চৈতন্য, যা এগিয়ে এসেচে বাস্তবের 'অনুবর্তন'-এ। এর উপজীব্য হ'লো ইস্কুল ও শিক্ষক-জীবন। শিক্ষার ভিতে জমেচে যে অশ্রু,

তা ভেঙে পড়েচে শিক্ষকতায়। তাই শিক্ষকতা দেখা দিয়েচে অনুবর্তনে। একই জিনিষেরই পুনরাবৃত্তি চলেচে শিক্ষণে ও জীবিকায়। 'দুইবাড়ী' ও 'কেদার রাজা'য় মৌলিকতার তেমন কোন পরিচয় নেই। এর পরে এসেচে অধ্যাত্মায়ন, যার প্রকাশ ,দেবযান'-এ [১৯৪৪]। অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ আছে এখানে। 'পথের পাঁচালী'র বাউলের একতারা এখানে হয়েচে পরলোকের শত তারা। আধুনিক সংশয়ীর বিরুদ্ধে এ যেন অধ্যাত্মায়নের জেহাদ। লেখক তাদের সম্বন্ধে যেন বলতে চেয়েচেন: "দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা, চরণে তার লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য বিভা!" আধ্যাত্মিক মার্গ দেখা দিয়েচে যতীনের মৃত্যুর পর। যতীনের সঙ্গে বাল্য বান্ধবী পুষ্পের চলেচে জীবনযাত্রা। যতীনের দৃষ্টিশক্তি খুলে গেচে আর সে দেখচে স্ত্রী আশালতার প্রেম বিলাস। আশালতা মার খেয়েচে উপপতি নেত্য'র কাছে। যতীনও দুঃখ পায় এ মারপিটে। তাই পরলোক যেন ইহলোকেরই নামান্তর—এদের পার্থক্য হ'লো প্রথমের সূক্ষ্মায়নে! এ এক নতুন আঙ্গিক। এই স্বর্গলোকের যিনি দেবতা তারি রূপায়ন ফুটেচে পুষ্প'র দৃষ্টিতে: "এই বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠ্‌লে জগৎ স্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।" 'দেবযান' দেবায়নের বাহন হ'লেও, এতে মর্ত্য রসিকের 'রস'রূপ মেলে না। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস যতই থাক না কেন, এখানে নেই সাহিত্যিকের সে-পরিমাণ রসায়ন। তাই 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় এর রস একটু ফিকে।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতি, মানুষ ও দেবতার গঙ্গোত্রী হ'লেও, প্রাকৃতিকতায় তাঁর যেমন দক্ষতা ফুটেচে অন্য দুটো ধারায় তেমন হয়নি। অবিশ্যি যেখানে প্রকৃতি এনেচে তার পুষ্পমাল্য, সেখানেই সাফল্য এসেচে মানবায়নে এবং দেবায়নেও। প্রকৃতি-পূজালুতায় এসেচে যে উপলব্ধি তাতে বাসা বেঁধেছে কত না অনুভূতি। এর দোলনে তাই দেখা যায়—

> বারাকপুরের বনে
> ঘেঁটুর গন্ধে বায়ু হ'ল মন্থর;
> থরে থরে ফোটা ওড়কলমির ফুল,
> ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া নামহীন কত পাখী।

এখানে রহস্যের ইন্দ্রলোক ইশারা জানায়। 'শ্রীকান্তে'র বাউলইএখানে প্রকৃতির রঙে রঙা। যে-সুর এখানে ধরেচে কায়া, তা ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে আনে বুনো হাওয়ার মাতন। এতে মন হয় উদাসী, উড়ে যেতে চায় দিগন্ত পিয়াসী মাঠে। পল্লী প্রকৃতির এ রূপায়নে স্মরণীয় বিভূতিভূষণ। তাঁর হৃদয়াবেগের দোলন চারিয়ে দিয়েচেন তিনি পাঠক চিত্তেও যার জন্যে তাঁর রচনা হয়েচে 'সহৃদয় সংবাদী'। এতে আছে সত্যিকার বৈশিষ্ট্য ও চমক।

(২) প্রমথনাথ বিশী (১৯০২—)

সাহিত্যায়ন এগিয়েচে প্রাণন ও মননের দুটো ডানায়। কখনো একের অভিব্যক্তি, কখনো অন্যটির। বিভূতিভূষণে যেখানে প্রাণলীলার চঞ্চলতা, সেখানে প্রমথনাথ বিশী এনেচেন মননের সুনিয়ন্ত্রণ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় বেজেচে তীব্রতার সুর আর কেঁপে উঠেচে মননের তন্ত্রীগুলি। তবে নিছক মননে যে তৃপ্তি নেই, সে-সম্বন্ধে লেখক সচেতন। কাজেই ব্যঙ্গরসিকের যে-ভূমিকা তিনি নিজেই গ্রহণ করেচেন ছোট গল্পে, উপন্যাসে সে-আসন দিয়েচেন প্রকৃতিকে। ফলে প্রকৃতি দেখা দিয়েচে এক হিংস্র ক্রুর জীব হিসেবে, যা নিয়তিরই রকমফের। বস্তুত এখানে প্রকৃতিবাদ নিয়তিবাদেরই নামান্তর। এরি লীলা বিস্তৃত হয়েচে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যা রূপায়িত হয়েচে পদ্মা ও কোপবতীর প্রবাহে। বস্তুত এ-দুই বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে মানুষী প্রয়াস, যা পদে পদে বিঘ্নসঙ্কুলতার দিকে এগিয়ে এসেচে দুর্নিবার বেগে। এই যে কঠোর ঔদাসীন্য এ স্মরণ করিয়ে দেয় Thomas Hardyর Egdon Heathকে। উভয়েই দেখেচেন প্রকৃতিকে ধ্বংসশীলরূপে। এ মানুষের দিকে তাকায় না, শুধু তাকে নিয়ে চলে বিলুপ্তির কারাগারে। এ দিক থেকে প্রমথ বিশী সত্যি একক, তাঁর কোন জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। প্রকৃতি এখানে ব্যঙ্গ রসিক, সে ব্যঙ্গ করে চলেচে মানুষের সুখ দুঃখ। এ যেন ব্রহ্মার হাসি। এই যে অসূয়া এ ভাবালুতারই উল্টো পিঠ। কল্পনা-খেয়াল ঘা খেয়েচে অভিজ্ঞতার কাছে আর জন্ম দিয়েচে ব্যঙ্গের। কাজেই লেখক আর প্রকৃতি এখানে হরিহর আত্মা—দু'জনেই ব্যঙ্গ রসিক।

প্রমথ বিশীর উপন্যাসে প্রকৃতির পরিহাসই মুখ্য, মানুষী আবেগ গৌণ। প্রকৃতি এখানে একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। আর খেলা করচে মানুষের সঙ্গে। "দেশের শত্রু" বাদে এ ধারার বাহক হ'লো "পদ্মা" [১৯৩৫], "জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার" [১৯৩৮], "অশ্বত্থের অভিশাপ" "চলন বিল" ও "কোপবতী" [১৯৪১]। ব্যঙ্গ নিয়ে আরম্ভ হয়েচে 'পদ্মা'—"উপন্যাসখানা ঘুষ আর ভূমিকাটা ঘুষি"। গল্পায়নে বিনয় আকৃষ্ট হয়েচে কঙ্কণের দিকে কিন্তু পরে তাকে যেতে হয়েচে চরচিলমারী ছেড়ে কলকাতায়। এখানে পারুলের চুম্বকে সে টান অনুভব করেচে। পরে ত্রিভুজের আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলেচে। কঙ্কণ আসন্নপ্রসবা শুনে তার বাপ তারণ দাস পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েচে। এদিকে বিনয় বিয়ে করেচে পারুলকে। ফলে কঙ্কণ বিদায় নিয়েচে জাতককে রেখে। বিনয়ের বুকে তাই আঁকা রইল দুটি ক্ষতচিহ্ন—তার কাছে "কঙ্কণ নববর্ষার পুরবৈঞাঁ বাতাস, পারুল প্রথম ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়া"। 'পদ্মাগর্ভে' নাটকের যবনিকা পতন হয়েচে। এখানে পদ্মার তান্ত্রিক মূর্তি ভয়াল রূপে দেখা দিয়েচে, "যেন অসুর বধের অব্যবহিতপূর্ব চণ্ডী"। শোকান্তিকা তাই মর্মান্তিক। 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' ফুটেচে সাতটি

অধ্যায়ে। এখানে উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, পরন্তপ, ইন্দ্রাণী, বনমালা যেন প্রকৃতির খেলার পুতুল। মানুষের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। সব ঘিরে বিরাজ করচে 'মেয়ে জামাইয়ের দহ' ও 'রক্তদহ'। এ পরিবেশ এক জটিল জালের অক্টোপাসে বেঁধেচে চৌধুরীদের পুরুষকারকে। নকসা যেমন ফুটেচে তেমন হয়নি চরিত্র বিকাশ। বর্ণিলতার ঝলকানিই এখানে মুখ্য, যাতে ব্যাহত হয়েচে গল্পায়নের সাবলীল গতি। পলাশীর বর্ণনা চমৎকার হয়েচে। গোটা চৌধুরী পরিবারের ইতিহাস বর্ণিত হয়েচে উপন্যাস ত্রয়ীতে, যার প্রথম পর্ব হ'লো 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'। এরি দ্বিতীয় পর্বে এসেচে 'অশ্বত্থের অভিশাপ'। এর "মানব নায়ক জোড়া দীঘির সর্বজন, অন্যনায়ক এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ"। এ গাছটিকে কাটার জন্যেই একটি গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেচে। এর কারণ এই যে, মানুষ ও প্রকৃতি মিলেই "এক অখণ্ড সত্তা," যার এক স্থানে আঘাত লাগলে, "অন্যত্রও ব্যথা লাগে"। অশ্বত্থগাছ কাটা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে খুনোখুনি চললো আর এলো মামলা নবীননারায়ণ ও কীর্তি-নারায়ণকে নিয়ে। এ সব সংঘাতের আবর্তে জোড়াদীঘি ধ্বংস হ'লো আর আশ্রয় দিলো পেচক বাদুড়ের। তাই দশ বছরে দেখা গেলো, "চৌধুরীগণ একদা যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, মানব জীবন স্রোতে তাহা তেমনি ভাবে মিশিয়া গিয়াছে"। তাই তৃতীয় পর্বে এলো 'চলন বিল' যা স্মরণীয় হয়েচে সাধু ও কথ্য ভাষার যুগল ব্যবহারে। সাধু ভাষায় এসেচে মন্থরতা আর কথ্য ভাষায় তরতরে চটুলতা। চলন বিলই নায়ক, যে তান্ত্রিক সাধনায় "নদনদীর পঞ্চমুণ্ডী আসনে উপবিষ্ট"। সে যদিও মানব সংসারের ভিতর, তবুও যেন এর বাইরে, যেন "মৃত দেহের উপরে বসিয়া জীবনের সাধনায় নিরত"। দর্পনারায়ণ ও দীপ্তিনারায়ণ ধুলোউড়ির কুঠিতে বাস করচে। তাদের ঘিরে ঘটনার স্রোত আবর্তিত হয়েচে। বন্যায় শেষ কালে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেচে। একে লক্ষ্য করে মোহন তাই বলেচে : "ভগবান, নিয়তি, অদৃষ্ট, শয়তান তোমাকে কি নামে ডাকিব জানি না, কেবল জিজ্ঞাসা করিতে চাই মানুষের জীবন লইয়া তোমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন?" মানুষী প্রশ্নিলতার দোলায় তাই আসে Hardy-র উক্তি "Thus the President of the Immortals ended his sport with Tess"। এখানে তীরন্দাজের তীরে লেখক নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েচেন। তাই ব্যঙ্গ পরিণত হয়েচে আত্মকরুণায়।

'কোপবতী'তে "কোপাই কাহিনীর নায়িকা—কিম্বা নায়িকাদের অন্যতরা।" ফুল্লরার সঙ্গে বিমলের বিয়ে হয়েচে তালবনীতে। কোপাই বিচ্ছেদ করেচে তাল-বনীকে ডাঙাপাড়া থেকে। ফুল্লরার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখা দিয়েচে কোপবতী। ফলে বিমলের হয়েচে সলিল-সমাধি কোপাইয়ের বানে। তার চলন হয়েচে "যন্ত্রচালিত"। এই যে দুর্নিবার রহস্যের মায়িক টান এতেই ফুটেচে নিয়তির ক্রূরতা ও শোকান্তিকার অনিবার্যতা। তাই তো "রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, হিংসাময়ী, এই নাগিনী কোপাই, কোপবতী—তার নিজের যেমন সুখ দুঃখ নাই—তেমনি অপরের সুখদুঃখের

প্রতিও সে উপেক্ষাময়ী"। বিমলের মহাপ্রস্থানে ও ফুল্লরার নলহাটী গমনে মিতম [বিমলের চাকর] প'ড়ে রইল নিঃসঙ্গতায়। তার দশা Eugene O'neill এর Lavinia [Morning Becomes Electra] র মতো : "অন্ধ মিতন একাকী অন্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া সারাদিন বসিয়া থাকে। সারাদিন, সারারাত্রি"।

প্রমথ বিশীর উপন্যাসে ফুটেচে প্রকৃতি ও মানুষের দ্বৈতলীলা, যাতে প্রকৃতি নিয়তি রূপিণী আর মানুষ তার খেলার পুতুল। এদিকটা বাংলা সাহিত্যে এনেচেন বলে তিনি প্রশংসার্হ, যদিও গল্পায়ন ও চরিত্রায়ন তেমন উৎরায় নি সব জায়গায়। এ পরিকল্পনায় আছে মৌলিকতার ছাপ। নাটকে যেমন তিনি G. B. S.-শিষ্য, উপন্যাসে তেমনি তিনি Hardyর ছাত্র। তবে ভাবায়নে কুন্ঠিলকতা থাকলেও, রূপায়নে আছে স্বকীয়তা, যা ফুটেচে দেশজ রঙে, বর্ণনার নকসাকাটায়। এদিক থেকে তিনি পথিকৃৎ নিশ্চয়ই।

(৩) জগদীশ গুপ্ত

প্রকৃতির অখণ্ড সত্তায় স্থান পেয়েচে মানুষও। এরি আছে দুটো দিক—এক, উজ্জ্বল কোণ; দুই অন্ধকার কক্ষ। এই আঁধার থেকে অতিপ্রাকৃতের প্রকৃতি হিংস্রতায় বেরিয়ে পড়ে উজ্জ্বল কক্ষে শিকারের জন্যে। এর প্রভাব খুবই সক্রিয় এবং রূপ এতই ভয়াল যে মানুষ তার কাছে ক্রীড়নক বই নয়। তাই প্রমথ বিশী প্রকৃতির অন্তরে যেখানে দেখেচেন অতিপ্রাকৃতের লীলা, সেখানে জগদীশ গুপ্ত মানুষের ভিতরেই এর সন্ধান পেয়েচেন। এও প্রকৃতির নামান্তর, যেহেতু এ অতিপ্রাকৃতেরই প্রকৃতি। ফলে করুণ রস এখানে উপচে পড়েচে। সভ্যতা বিস্তারে মানুষী অতিপ্রাকৃতের যে নিরঙ্কুশ বিহার সম্ভব হয়েচে, তাই জগদীশ গুপ্ত ধরেচেন তাঁর লেখায়। ফলে ফ্রয়েডীয় অচৈতন্যের হয়েচে মর্ত্য-পরিক্রমা। যুগ-যন্ত্রণাই তাঁর কলমে ফুটে উঠেচে। এ হ'লো চতুর জগতেরই লীলা, যাতে নিয়তিরূপে চতুরালিই সমাসীন। এতে ঝরেচে মানবতার ক্রন্দন—কেমন যেন নিষ্ঠুরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। তাই একঘেয়েমিতে রচনা তেমন এগোয়নি। লেখকের 'অসাধু সিদ্ধার্থ' সাধুভাষায় লেখা। সিদ্ধার্থ দেনার দায়ে মরতে চেয়েছিলো কিন্তু ফিরে এলো রজত ও অজয়াকে দেখে। তারপর অজয়ার প্রেমে জীবন হারাল। এর জায়গা কিন্তু দখল করলো নটবর, সে অজয়ার প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেললো। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর মাতামহ কাশীনাথ এলো আশীর্বাদ করতে আর টের পেল যে নটবর সিদ্ধার্থ নয়। এতে নিষ্পেষণই চোখে পড়ে। একদিকে সয়তানি, অন্য দিকে করুণা। এরি পরিচয়ে ফুটে উঠেচে গোয়েন্দাগিরির চমক। ফলে শোকান্তিকার জায়গায় মাথা তুলেচে করুণ রসের ভিয়ান। যুগধর্মচিত্রণে 'সুতিনী' ও 'যথাক্রমে' [১৯৩৩] স্মরণীয়। শেষেরটিতে দীনবন্ধু ও বোন সাবিত্রীর দুঃখলীলাই লক্ষণীয়। দীনবন্ধুকে ঠকিয়ে ধূর্ত লোকেরা টাকা-পয়সা নিতে লাগলো আর এদিকে

সাবিত্রী নির্বাসিত হয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। নিয়তির খেয়ালে এরা সবাই ছুটচে। এই নিয়তিবাদ অতিপ্রাকৃতের নামান্তর, যা চলেচে মানুষী ধূর্তামির মারফতে। এর চিত্রণ তাই হয়েচে উপভোগ্য।

(৪) সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-)

প্রকৃতির এক একটি স্তরে এক একজন কৃতিত্ব দেখিয়েচেন। বিভূতিভূষণে যেখানে আছে প্রকৃতির রহস্য, প্রমথনাথে অতিপ্রাকৃতের পরিহাস, জগদীশ গুপ্তে অতিপ্রাকৃতের চতুরালি, সেখানে সরোজকুমার রায়চৌধুরী এনেচেন প্রকৃতির বাস্তবতা। এই যে বাস্তবতা এ পল্লীকেন্দ্রিক, যদিও শহরমুখো এর দৃষ্টি। আর এতে মিশেচে মানুষী সত্তার আঞ্চলিক প্রবাহ। প্রকৃতির হয়েচে এখানে মানুষী রূপান্তর। এও প্রকৃতিরই জয়গান, যেহেতু গ্রামীন সভ্যতা উঠেচে এর উপর। তাই সরোজকুমারে ধরা পড়ে দেশকালের সমসাময়িকতা। বস্তুত দেশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এগিয়েচেন কালাঙ্কে। দেশ একটু সসীম, যা কেবল কালায়নেই পৌঁছুতে পারে অসীমে। ফলে তাঁর মানস বিবর্তনে ফুটে উঠেচে তিনটি বিশেষ ধারা—সাংবাদিকতা, পল্লীবৃত্ত ও কালায়ন। রাজনীতির ডানায় এসেচে কৌটিল্যায়ন যার ভিত্তি দেশজ। পল্লীবৃত্তে ধরা পড়েচে বৈষ্ণবায়ন ও ঘরোয়া চিত্র আর কালায়নে সমাজ ভাঙনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সাংবাদিক কি করে সাহিত্যিক হ'তে পারেন তারি পরিচায়ক হ'লেন সরোজকুমার। রাজনীতিক হ'য়েও ইনি এর ঘূর্ণিঝড়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেচেন। তাইতো সাহিত্য দিয়েচে এঁর গলায় জয়মাল্য। কাজেই দেশকাল পেরোনেই ফুটেচে এঁর প্রতিভার ঝলমলানি, বাস্তবের কবিত্ব।

প্রথম স্তরে আছে কৌটিল্যায়ন, যা রাজনীতিরই নামান্তর। এখানে দেখা যায় সাংবাদিকের আবির্ভাবও। সমসাময়িক ঘটনার জেল্লাই চোখে পড়ে। রাজনীতি তাৎকালীন যুগে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এখানে আছে তারি পরিচয়। এখানে যেমন আছে সাংবাদিকতা তেমনি সাহিত্যায়নও। বস্তুত সংবাদ ও সাহিত্যের পার্থক্য ধরা পড়ে এদের রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গিতে। সাংবাদিক সমসাময়িক ঘটনায় জেগে ওঠেন আর করেন তার রূপায়ন। অন্য দিকে সাহিত্যিক রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে করেন ঘটনার প্রকাশ। এই উদ্দেশ্য নিয়েই পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। এ পর্বে দেখা যায় 'বন্দিনী' [১৯৩০], 'শৃঙ্খল' [১৯৩২] ও 'হংস বলাকা'। বস্তুত এখানে যে সাংবাদিকতা এসেচে তার এক বাহু রাজনীতি অন্য বাহু জীবিকায়ন। 'বন্দিনী'র আবহাওয়া রাজনৈতিক, যার রূপায়ন দেখা যায় মক্ষিরানী ও বিপ্লবী দলের মারফতে। পরে বিপ্লবী রূপান্তরিত হয়েচে প্রেমিকে আর মক্ষিরানী বিয়ে করেচে সহকর্মী সমীরণকে। এর তিনটি পর্ব—বন্দিনী, নিশিভোর ও সূর্যমুখী। এদের 'নিশিভোর' হ'য়েচে প্রেমের স্ফুরণে। সূর্যমুখী-পর্বে সমীরণ দেশের ডাকে ছেড়েচে স্ত্রী মক্ষীরানী ও পুত্র অশোককে।

একদম নারীর সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। অইতো মন্ত্রিরানী যদিও ফিরেছে "নারীর স্নায়ু পুরুষের ধনুকে যোজনা" করে, তবুও শেষে বাঁধা পড়েছে ঘরের আকর্ষণে। অন্য দিকে সমীরণের কানে বাজলো সমুদ্রের "সুস্পষ্ট অমোঘ আহ্বান" আর সে ছাড়লো ঘরবাড়ি। এ হ'লো "ঝড়ের রাত্রের হাঙর-তিমি সঙ্কুল সমুদ্র।" 'শৃঙ্খল'-এর উপজীব্য হ'লো বিশ্বেশ্বরের জীবন-কাহিনী! বিশ্বেশ্বর আঘাত পেয়েছে কুসংস্কার ও আদালতের মাধ্যমে। তার স্ত্রী অমলা মারা যায় আর গ্রামস্থ লোকে তোলে হৈ চৈ। ফলে বিশ্বেশ্বরের জেল হ'লো; যাতে সে একদম ভেঙে পড়লো। এতে বেজেচে শৃঙ্খল-ঝঙ্কার আর বিদ্রোহের সুর। রাজনীতির পরে এসেচে সংবাদপত্রের জগৎ। 'হংস-বলাকা'র 'সুদর্শন' পত্রিকার মারফতে এসেচে সুকুমারের জীবিকায়ন। এর তিক্ত অভিজ্ঞতা এনেচে বাস্তবের সুর ও রূপ। তাই সুকুমার-মণিমালার যৌন মিলনে এসেচে যে নবজাতক, তাকে উদ্দেশ ক'রে লেখক পাঠিয়েচেন বাণীদূত: "আমার মতো এমনি লক্ষ লক্ষ ছেলে লক্ষ্যহারা ঘুরছে। আমরা যেন একটি বিপুল হংসবলাকা। চলেছি মানসসরোবরের দিকে, দুস্তর মরুভূমি পার হ'য়ে, আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে।" এতে একদিকে যেমন বর্তমান জগতের লক্ষ্যহারা গতি স্মরণীয়, তেমনি সাংবাদিকতার নতুন পথ-খোঁজাও লক্ষণীয়। এ চলেচে খেয়ালী কল্পনার বাস্তবতার দিকে।

এই বাস্তবায়ন এসেচে দেশ পেরিয়ে দেশজ বৈষ্ণবায়নে। এখানে তাই ফুটেচে আঞ্চলিক রঙ, যা স্মরণে আনে শৈলজা-তারাশঙ্করের গণায়ন। বৈষ্ণব সমাজের ঘরোয়ারূপে তাই এসেচে উপন্যাসত্রয়ী—'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' [১৯৩৮]। এ-ছাড়া আছে গণজ অগ্রগতির সাক্ষ্য 'পান্থনিবাস'-এ [১৯৩৫]। এখানে "তেরো নম্বর মেস" একটি চরিত্রের ভূমিকায় দাঁড়িয়েচে। তপন শ্যামলীকে পড়ায়। এই মেসে এসেচে আরো অনেকে—অবিনাশ, বিলাস প্রভৃতি। পরে দেখা যায় তপন-শ্যামলীর অনুরক্তি। পান্থনিবাস চলেচে ছন্নছাড়াদের আশ্রয় দানে। এতে সমাজ-ভাঙনের ছাপ সুপরিস্ফুট। শহরমুখো দৃষ্টি থাকলেও, এর পটভূমিকা রয়ে গেচে পল্লী। তাই 'ময়ূরাক্ষী' এসেচে অনিবার্য ভাবে। উপন্যাসত্রয়ীর এ প্রথম পর্ব। তবে একক ও সম্মেলক ভাবেও এর উপলব্ধি সম্ভব। এখানে লেখক হয়েচেন সাহিত্যিক। বৈষ্ণব সমাজের চিত্রণে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর স্মরণীয়, যেমন সরোজকুমার। এতে নেই কোন মৌলিক আবিষ্কারের চমক। বিনোদিনী হারাণ মণ্ডলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। সে মিথ্যা অপবাদের জন্যে স্বামী হারাণ ও সন্তান হাবল ও মেনীকে ছেড়ে চ'লে গেলো। এতে হারাণের কোন দোষ নেই, বিনোদিনীর কোন ক্ষোভ নেই, যেহেতু "সমাজের মধ্যে ব্যক্তি অসহায়।" এক করুণ রসে হৃদয় আপ্লুত হয়। বৈষ্ণব সমাজ ও আখড়া চিত্রলতায় এগিয়েচে রসময়, গৌরহরি ও ললিতার মারফতে। পল্লীবাণী প্রকাশ পেয়েচে গ্রামীন বৃষ্টি-নামানো মন্ত্রে: "বাও লো রানী দোদো পানি"। হারাণ-বিনোদিনী মানুষী সত্তা প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে মিতালি করেচে তার পরিচায়ক হ'লো রাক্ষীময়ূ: "ময়ূরাক্ষী চলে ব'য়ে। একদিকে ধূ ধূ করচে বালুচর। কত পাখীর

পায়ের দাগ তার উপর বিচিত্র আলপনা কেটে গেছে। দুটি পাখীর নিগূঢ় বিরহ-মিলন কথায় এই নীরব সাক্ষী কারও চোখে পড়ে না।" এর পরে 'গৃহ কপোতী'তে বিনোদিনী হয়েচে রক্ষণশীলা। তার মধ্যে নেই ইবসেনের নোরার বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর সমাজ-ভাঙার রূপ। সরোজকুমারের বিনোদিনী গৃহকপোতী—তাই সে ফিরে এসেচে রসময়-ললিতা বৈরাগীর আখড়ায়। পরে কিন্তু সে এলো বাপের বাড়িতে মা ও ভাই নিতাইপদ'র অনুরোধে। গৃহকপোতী হলেও বিনোদিনী পেয়েচে মুক্তির স্বাদ বৈষ্ণব আখড়ায়। এরপর 'সোমলতা'য় বিনোদিনী ঝুঁকেচে গৌরহরির দিকে আর অনুরোধ জানাচ্চে কণ্ঠিবদলের জন্যে। এদিকে হারাণও চাইচে বিয়ে করতে। শেষে কিন্তু বিনোদিনী-হারাণের হয়েচে মিলন। গৌর-হরি, বিনোদিনী ও হারাণের চরিত্রায়ন ফুটেচে মনস্তাত্ত্বিক পটে। বৈষ্ণব আখড়া ও বাউল মনোভাব কেমন করে গার্হস্থ জীবনকে ভেঙে দিতে পারে এখানে আছে তার ইঙ্গিতও। তারপর তৃতীয় স্তরে দেখা যায় 'শতাব্দীর অভিশাপ'। এখানে কালায়নে এসেচেন সরোজকুমার। দুই শতাব্দীর ব্যবধানে ফুটেচে সমাজ-চিত্রণ। শৈলবিহারীর পিতা হালদার সাহেব নাতি-নাতনী রাজেন্দু, কণক ও লিলিকে নিয়ে যে জীবনযাপন করেচে তাতে দুই শতাব্দীর ব্যবধানই চোখে পড়েচে বেশি। এ রূপায়িত হয়েচে হালদার সাহেবের কথায়: "আমাদের শতাব্দীর fag-endএ তোমরা এসেছ বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে নিয়ে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল কম।" তাই সমাজ চেতনতা জেগেচে প্রশ্নিলতায়: "সহৃদয়, সমদর্শী (হ'য়ে) এই পৃথিবী কোনোদিন জাগবে না?" হয়তো না'ই এর জবাব। এখানে মানসিক দৃষ্টির অব-লোকন দেশ পেরিয়ে এসেছে কালের জঠরে, যা নতুনের জন্ম সার্থক করবে ভবিষ্যতে।

কবি হিসেবে সাহিত্যিক জীবন সুরু ক'রে এগিয়েচেন সরোজকুমার গল্প-উপন্যাসে। ফলে ভাষার সংক্ষিপ্তি ফুটেছে কবিত্বে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও, শব্দের কারিকুরি আনে সত্যিকার প্রাণস্পর্শ। কিন্তু এতে বস্তুর বাস্তব রস ফুটেচে বাক্-সংযমে, যা স্মরণ করিয়ে দেয় জাপানী কবিতার ছোট ছোট ছত্র। তবে এ কবিত্বের ছন্দে স্পন্দমান। সাধারণ সুখ দুঃখের কথা চিত্রিত হয়েচে ঘরোয়া পরিবেশে। বাস্তব যেন কথা কইচে। এখানে নেই হিঙ্গুল নদীর হীরা-জলা ঝলমলানি, কিংবা রাজসিক চিত্রালি। ধরতাই বুলির অনুপ্রাসও তেমন চোখে পড়ে না, যাতে একটা বিশেষ মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। মনায়ন ও যৌনায়নও অনুপস্থিত। কিন্তু বস্তুবাদ না থাকলেও আছে বাস্তবতা, যা প্রকৃতির রক্তমাংসে জীবন্ত। বস্তুর এই আটপৌরে মূর্তনে এসেচে বাস্তবানুগা অনুভূতি, যাতে সম্ভব হয়েচে সাহিত্যায়ন। কাজেই সরোজকুমার স্মরণীয় প্রকৃতির বাস্তব চিত্র রসে, যেখানে ভাবের চেয়ে রূপই বড়ো।

(৫) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'চন্দ্রহাস' বি-নামে যিনি সাহিত্যের আসরে নিজের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর স্বনাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুর ভিতরকার রহস্য উদ্ঘাটনে আছে কৌতূহল, যার জন্তে উপায়নে এসেচে গোয়েন্দাগিরি। এরি জন্তে তিনি শেষে পাড়ি জমিয়েচেন চলচ্চিত্রের জগতে। এখানে প্রকৃতি হাজির হয়েচে অতিপ্রাকৃতের রহস্যে। বিদেশে এ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেচেন Conan Doyle, Rider Haggard, Hall Caine প্রভৃতি। রহস্যের চমকই এখানে বড়ো কথা। তাই চাঞ্চল্যে এগিয়েচে গল্পায়ন আর প্রাণনে জেগেচে শিহরণ। অল্প পরিসরে জীবনের এ-সব চুটকি বেশ রসঘন হ'তে পারে। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় এর আবেদন একটু বিবর্ণ। তাই ছোট গল্পে যে কৃতিত্ব এসেচে, তা সম্ভব হয় নি উপন্যাসে। এখানে আছে বাস্তবের রহস্যায়ন, যা কল্পনার ডানায় উড়ে চলেচে। এতে প্রতিভার স্পর্শ অনুভূত হয়।

বস্তুর সামাজিক প্রবাহে 'বিষ-রস' উৎসারিয়ে উঠেচে। ফলে "বিষের ধোঁয়ায়, ভুবন আঁধিয়ার, ওরে পথিক আলোক নাহি আর।" সামাজিক সংস্কারের জগদ্দলে জনব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বন্ধ হ'য়ে গেচে। কেবলি "বিষের জ্বালা বুকের মালা জ্বলচে অনিবার"। এ পরিবেশে জন্ম নিয়েচে 'বিষের ধোঁয়া' 'ও বিষ কন্যা'। প্রথমটিতে আবেষ্টনীর আবহাওয়াই মুখ্য আর দ্বিতীয়টির সৃষ্টিই প্রধান। বাহ্য জগতের বাস্তবতাকে অতিক্রম করেচে কল্পনা। 'বিষের ধোঁয়া'র মৃত তীর্থনাথের স্ত্রী বিমলা আশ্রয় নিয়েচে স্বামী-বন্ধু কিশোরের কাছে। কিন্তু সামাজিক বিষ বিষিয়ে দিয়েচে গোটা পরিবেশ। তাই কিশোরকে ত্যাগ করেচে তার বাপ। পরে অবিশ্যি কিশোরের মিলন হয়েচে সুহাসিনীর সঙ্গে, যদিও মাঝখানে দুর্যমন এসেচে অনুপমের মারফতে। বিদ্যুৎই হ'লো কিশোর-সুহাসিনীর জাতক। গল্পের উপসংহারে নতুন আঙ্গিকের পরিচয় মেলে। বিমলার কাছে গল্প শুনচে বিদ্যুৎ তার মা-বাপের। এতে একদিকে যেমন অতীত জাগিয়েচে রোমাঞ্চক শিহরণ, তেমনি এসেচে গল্পায়নের বর্তুলভাও। এখানে রহস্যের ইন্দ্রজালে আকস্মিকও ঢাকা পড়েচে। কিশোরের চৌকাঠের উপর পতন এবং রাত্রে অন্ধের বাড়ি চড়াও হওয়া প্রভৃতি ঘটনা উদ্গতি পেয়েচে কল্পলোকে। এদিকে বিমলা উন্নীত হয়েচে দেবী চরিত্রে। তাই বাস্তবের স্থূলাবলেপ হয়েচে অপসারিত। এখানে শরদিন্দুর কবিত্ব এসেচে বাস্তব রূপায়নে। ফলে এ হয়েচে নতুন জগৎ, যেখানে বস্তু বিশ্ব আছে বটে, তবে রূপান্তরে। এখানে যে দৃষ্টির পরিচয় মেলে, তা জীবনের গভীরে প্রবেশ করেনি। কল্পনার খেয়ালই এখানে জয়ী হয়েচে আর রচিত হয়েচে স্বপ্নলোক, যা বাস্তবের রূপান্তর। যে জীবনদর্শনে গোটা জীবনজিজ্ঞাসা বিধৃত, এখানে নেই তার উপস্থিতি। বস্তুত শরদিন্দুর কৃতিত্ব বস্তুর গল্পরসে, ছোট খাট পরি-

বেশই যেখানে উপযোগী। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এই রহস্যের স্বপ্নলোক প্রায় লোপ পেতে বসেচে এ-যুগে। আর লেখক করেচেন এর পুনপ্রতিষ্ঠা। তাই প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত আবির্ভাব রইল স্মরণীয় হ'য়ে।

(৮) জীবন-প্রভাত

যৌনবৃত্ত, গণচক্র, সংস্কৃতিবিলাস ও প্রকৃতি-প্রবাহে এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এরা জীবনের ভঙ্গিও বটে। আর দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্যে হয়েচে এদের স্বরূপ নির্ধারিত। এ-ছাড়া জীবনের আছে আরো অলিগলি, মত-মতান্তর। এ হ'লো জীবনপরিক্রমার ফসল। এখানে বিশেষ ক'রে ফুটে উঠেচে প্রেমের রকমফেরে জীবনের রূপ রূপান্তর। তাই কখনো হাসিঠাট্টা, কখনো স্নেহবাৎসল্য, কখনো বা গৃহস্থালির ঘরোয়া পরিবেশ চোখে পড়ে। এবার এর পরিচিতির পালা।

(১) 'কল্লোল'দল

'কল্লোলের' যিনি উদ্গাতা তিনি হলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৩-১৯২৫) যাঁর 'পথিক' তৎকালে কল্লোল তুলেছিল। এখানে আছে মণীন্দ্রলালী আবেগ-বিহ্বলতা যা অনেক জায়গায় মাত্রার সমতা রক্ষা করতে পারেনি। জটিল ঘটনার বিন্যাসের চেয়ে ছোট ছোট সহজ আখ্যানেই তাঁর দক্ষতা ফুটেচে বেশি। 'পথিক' নামেই ফুটেচে বাউলের চেহারা আর চলাতে বেজেচে একতারার সুর। ফলে পাঠকচিত্ত সাড়া দিয়ে ওঠে এর পা-ফেলার তালে তালে। রূপসৃষ্টির দিক থেকে চোখে পড়ে নবযুগের পাখা ঝটপটানি। আর যাঁরা পরে জুটলেন 'কল্লোল' আড্ডায় তাঁদের মধ্যে নজরুল ইস্‌লাম (১৮৯৯—) ও নরেন্দ্র দেব স্মরণীয়। এখানে অবিশ্যি গতানুগতিকতার স্বাক্ষর মেলে। নজরুলের 'রিক্তের বেদন', 'কুহেলিকা', 'মৃত্যু ক্ষুধা', 'শিউলিমালা' ও 'বাঁধন হারা'র মধ্যে শেষেরটি পত্রোপন্যাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্র'র গল্প-উপন্যাস হ'লো 'বোঝা পড়া', 'গরমিল,' 'খেলার পুতুল,' 'যাদুঘর' ও 'গৌতমের গতজন্ম'। ইনি কল্লোলে জুটলেও, এ'র লেখায় কল্লোল প্রকাশ পায় নি। তবে তাঁর একটি কথা প্রেম সম্বন্ধে স্মরণীয়: "Cousins are always the best targets"! তাঁর 'আকাশ কুসুম' [১৯৩৭] কথ্যভাষায় লেখা। ভূপেন্দ্র চৌধুরী ও প্রিয়নাথ বসুর মিলন হ'লো আর পুত্র চঞ্চল এগোল মীরার দিকে। এতে নতুনত্ব কিছু চোখে পড়ে না। এরি উপান্তে দেখা যায় রাধাচরণ চক্রবর্তির 'সীতল' [১৯৩৪], যা সাততলা বাড়ী নিয়ে লেখা।

(২) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬—)

হাস্যরসিক হিসেবে পরিচিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এদিকে তিনি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের স-ধর্মী। এঁরি মারফতে এসেচে বিদেশী হাস্যরস। বস্তুত হাসি

ও অশ্রুই হ'লো জীবনের টানাপোড়েন। তাই কখনো হসন্তিকা কখনো শোকান্তিকা হ'লো এর প্রতিরূপ। ছোট গল্পের হাস্যরসিকতা উপন্যাসে বাৎসল্য রসে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার লোকসাহিত্য এগিয়েছে শ্যামা-উমা বাউল সঙ্গীতে। এর ঘরোয়া চিত্রণে উপচে পড়েছে বাঙালী মায়ের বাৎসল্য। এর পরিচয় মেলে মধুসূদনের বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় উক্তিতে: "Heart of a Bengali mother"। এতেই গার্হস্থ পরিবেশ হয়েছে অশ্রুসজল, এসেছে মনুসন্তানের মুক্তি। এর পরিচিতি বহন করছে লেখকের "স্বর্গাদপি গরীয়সী", যা ৩ খণ্ডে ব'য়ে চলেছে। এখানে আছে যে মাতৃবন্দনা তাতে মাতৃহৃদয়ের অন্তঃপুরের সন্ধান পাওয়া যায়। একে 'জীবনোপন্যাস' বলা যায়, যেহেতু এ জীবনীর মতো বিচিত্র আর কথকালির মতো উপভোগ্য। তাই তো ভূমিকা বলেছে: "স্বর্গাদপি গরিয়সী" জীবনী নয়, যদিও অস্বীকার করা চলে না যে ইহাতে জীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্ত্তমান"। যশোদা-গোপালের মারফতে মাতৃস্নেহের যে বান এসেছে, তাতে বাংলা ডুবুডুবু হয়েছে। তাই তো বাঙালীর আছে দুর্গামূর্তি, যা মাতৃত্বেরই স্নেহসজলতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে কিন্তু স্নেহরস উথ্‌লে উঠেছে গিরিমালা ও শৈলেনের ছবিতে। এমন কি তুলসীমঞ্চও দেখা দিয়েছে। এ এক অপূর্ব রূপায়ন।

এর পর বাৎসল্য রস পরিণতি পেয়েছে সাম্য বা মধুর রসে। তাই 'নীলাঙ্গুরীয়' [১৯৪২] এসেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণের যৌন রূপেই-প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একদিকে ঘৃণা, অন্যদিকে ভালবাসা, এ দু'য়েই তৈরী হয়েছে উভয়বল প্রতিন্যাস [ambivalent attitude]। এখানে ফ্রয়েডী মনোবিকলনই চোখে পড়ে। এ রূপায়িত হয়েছে শৈলেন-মীরা-সৌদামিনীর ত্রিভুজে। ৩টি পর্বে গল্পায়ন এগিয়েছে আর গ্রন্থিলতাও সমাধান পেয়েছে। 'মীরা' পর্বে বিষয়বস্তুর রূপ প্রতিভাত হয়েছে জিজ্ঞাসায়—"ভালবাসা কি একটা অভিনয়? ঘৃণা কি সব সময়েই ঘৃণা?" এর ফেনিলতা ভেঙে পড়েছে নায়কের ছাত্রী তরুর দিদি মীরার প্রতি আকর্ষণে। মীরাও দুলেছে প্রেমের ও আভিজাত্যের দুই বিন্দুতে। 'সৌদামিনী' পর্বে শৈলেন আকৃষ্ট হয়েছে বিধবা সৌদামিনীর দিকে। এই আকর্ষণের উৎস অবিচ্ছিন্ন পূর্বস্মৃতি ও সাহচর্ব। এর পর কর্তব্য ও ভালবাসার সমন্বয় হয়েছে 'মীরা-সৌদামিনী' পর্বে। শৈলেন ছেড়ে দিলো সৌদামিনীকে আর সে চলচ্চিত্রে ঢুকলো। মীরার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে প্রেম। এ-প্রসঙ্গে সমস্যার সমাধান রূপায়িত হয়েছে শৈলেনের উক্তিতে: "আমার সদু ও মীরা—কর্ত্তব্য আর ভালবাসা, সব মেয়েই উমার অংশে জন্ম।—উদাসীনের জন্যেই তাদের তপস্যা"। হাস্য রস এসেছে ইমানুলের ব্যর্থ প্রেমচিত্রণে। কাজেই বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য এসেছে উদ্দেশ্যের রূপায়নে। আর এখানে জীবনের পরিধিও হয়েছে বিস্তৃত।

(৩) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩২)

কোন মতবাদকে আমল না দিয়ে নিছক জীবনরস উপভোগের যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা আছে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত তিনি। 'মায়াজাল' সত্যি জাল বিস্তার করেচে মমতার। কুল-ত্যাগিনী তারা ঠাকুরাণী ও তার মেয়ে লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েচে তার স্বামীর বন্ধু যাদব ভট্টাচার্য। যাদবের মৃত্যুর পর তার পুত্র রমেন্দ্র চেষ্টা করেচে লক্ষ্মীর বিয়ের; কিন্তু গ্রাম্য দলাদলিতে পেরে ওঠেনি। শেষে কিন্তু রমেন্দ্র নিজেই বিয়ে করেচে লক্ষ্মীকে। এখানে রমেন্দ্র ও লক্ষ্মীর মনস্তত্ব উদ্ঘাটিত হয়েচে। তবে গল্পায়নে নেই কোন জটিলতা। এর পর অসম্পূর্ণ "ঘৃতকুম্ভ' ও রসদৃষ্টির পরিচিতি বহন করচে। জীবনের স্বরূপ উন্মোচনে লেখক বদ্ধপরিকর। তাই বিজ্ঞানীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়েচে সমাজ ও মানুষের অস্থি-সংস্থান। একে একে শুধু জীবনের জটাজাল খুলে যাচ্চে। 'নিরঞ্জন' [১৯৪৮] শালবনের ভূমিকায় অঙ্কিত আর নায়ক-নায়িকা হ'লো নিরঞ্জন ও এলা। মতবাদের অনুপ্রাসে একে ভারাক্রান্ত করবার কোন চেষ্টা নেই। জীবনরহস্যই এখানে হয়েচে উন্মথিত, উন্মোচিত।

(৪) সজনীকান্ত দাস (১৯০০-)

ব্যঙ্গরসিক হ'য়েও সজনীকান্ত দাস এগিয়েচেন বেদনাচেতন মনে। তাই গল্প-কবিতা পেরিয়ে তিনি সৃষ্টি করেচেন উপন্যাস, যা সংকেতে স্পন্দমান। এখানে মিশেচে যে কবিপুরুষ, সে মনস্তত্বের সুতোয় আবেগের ঘুড়ি উড়ায়। এরি পরিচায়ক হ'লো তাঁর "অজয়" [দ্বিঃ সং ১৯৪৫], যা শক্তিমত্তায় দীপ্তিমান। জীবন একটি মহানাটকের অনুপর্ব, যার আগে ও পরে আছে অন্ধকারের রহস্যলীলা। জীবনের মধ্যে প্রাণনের দাবী অনস্বীকার্য। তাই বর্ণিলতায় এগিয়েচে অমিয়র পরিক্রমা শৈশব থেকে যৌবনে। তার জীবনে এসেচে একে একে চারটি নায়িকা—ডেজি, ডলি, রেণু ও বিমলা। এর মধ্যে ডেজি মারা যায় অল্প বয়সে, ডলি মিলেচে অনিলের সঙ্গে আর রেণু করেচে বিয়ে। বাকি রইল শুধু বিমলা, যে বি, এ, অনার্সে প্রথম হ'য়ে পালিয়ে গেলো অমিয়কে নিয়ে। অন্তঃসত্ত্বা বিমলা পরে জন্ম দিলো অজয়ের। এখানে যে মাতৃত্ব বিকাশ, তাতে অংশ আছে সব নায়িকার। তাই প্রেম দেখা দিয়েচে যৌথ কারবার হিসেবে। রেণু ও ডলির মনে এসেচে দ্বিধা আর তারা দুলচে স্বকীয়া-পরকীয়ার দোটানায়।। গল্প এগিয়েচে সাংকেতিক রহস্যে, ন'টি অধ্যায়ে। লেখনভঙ্গির অভিনবত্বের জন্যে এ গল্পায়ন প্রশংসার্হ। এখানকার বক্তব্য ফুটে উঠেচে Lafcadio Hearn এর কথায়—

> Things never changed since the time of the gods;
> The flow of water and the way of love.

কাজেই এখানকার বৈশিষ্ট্য এসেচে বর্ণনার আঙ্গিকে। ছোট ছোট বাক্যে ভাব দানা বেঁধে উঠেচে অনুভূত অভিজ্ঞতায়। "অজয়"-এর উপসংহারে বেজেচে যে বাউলের একতারা তা 'শ্রীকান্ত'র সগোত্রীয়। এ স্মরণে আনে 'পথের পাঁচালী'কেও। সুখদুঃখের এই পথ চলাতেই আনন্দ: "মানুষের দীর্ঘশ্বাস কোথাও সঞ্চিত নাই। মানুষ পথ হারাইয়াছে, পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, আবার পথ চলিয়াছে।" প্রেমের বিবর্তনই নর-নারীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ফুটে উঠেচে। এর রূপায়নে সাংকেতিকতা যেভাবে এসেচে, তাতে রসোপলব্ধিতে বাধা এসেচে স্থানে স্থানে। কেমন যেন অস্পষ্টতা চোখে পড়ে, সংকেতের মাত্রাধিক্যই এর জন্যে দায়ী। এতে স্মৃতির দোলা অনুভূতিকে দিয়েচে দুলিয়ে। তাই এসেচে সনাতন রীতির নবায়ন। আর এজন্যে লেখক স্মরণীয়।

(৫) প্রফুল্ল কুমার সরকার (১৮৮৪—১৯৪৪)

সমাজ ও রাজনীতির পাঁকে যেসব নীচতা ঘুলিয়ে উঠেচে তারি বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেচেন প্রফুল্লকুমার সরকার। এঁতে ফুটেচে সাংবাদিক মনের চেতনতা, যা সাময়িকতায় হয়েচে উদ্বুদ্ধ। তবে মনন একক চলতে পারে না, তাই এসেচে অনুভূতিও। ফলে তর্ক বহুলতা ও আবেগ প্রবণতা এসেচে যৌথ সমবায়ে। তাঁর "বিদ্যুৎ-লেখা" তথ্যবাহুল্যের পরিচায়ক, যা বিজলীর ঈষৎ দীপ্তিতে দীপ্তিমান। "লোকারণ্য" কিন্তু আকস্মিকের অরণ্যে হারিয়ে গেচে। তাই এসেচে অতি-নাটকীয়তা অনিবার্য ভাবেই। "বালির বাঁধ" (১৯৩৪) কিন্তু কলাকৌশলের দিক থেকে একটু সংযমের পরিচয় দিয়েচে, আর এখানে মিলেচে মনন ও আবেগের সংহত রূপ। উপলব্ধির পথে তাই এখানে নেই কোন সত্যিকার বাঁধ। সাহিত্যিক এখানে সার্থক, সাংবাদিক গৌণ।

(৬) নারীজাগৃতি

শরৎ পর্বে নারীজাগরণের যে বন্যা ব'য়ে চলেছিল, আধুনিক পর্বে তা হয়েচে আরও বেগবতী। অবস্থা বিপর্যয়ে সমাজের চিড়ই লক্ষণীয়। মহিলামহলে যতটা পুরনো প্রসিদ্ধির পরিচয় মেলে, এখানে কিন্তু ততটা নয়। এখন নারীজাগৃতিই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। ফলে কালেজী শিক্ষা ও একান্নবর্তী পরিবারের দোটানায় মেয়েদের ঘরকন্না যেভাবে ব্যাহত হচ্চে, তারি পরিচিতি বহন করচেন মহিলা-লিখিয়েরা। ত্রিশোত্তর সমাজে ইংরেজি শিক্ষা এগিয়েচে মহিলাদের ভিতর, আবার সমাজ-ভাঙনে বিবাহ সমস্যা এক নতুন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েচে। এ দুয়েরি লীলায় যে দোল খেয়েচে নারী, এখানে যেন তারি সুপ্রকাশ।

প্রথমেই নাম করতে হয় আশালতা সিংহের। লেখিকার ব্যঙ্গ-প্রবণতা রূপায়িত

আশালতা সিংহ

হয়েচে তাঁর "সমর্পণে"। এখানে আছে সুরমা-সুপ্রকাশ-হরলাল ত্রিভুজ। সুরমা কিন্তু আত্মসমর্পণ করেচে সুপ্রকাশের কাছে। বিপদ এসেচে দোটানায়—একদিকে সুরমার মার্জিত রুচি, অন্যদিকে বিশ্রী পরিবেশ। মেসের পরিচিতি ফুটেচে বর্ণনায়। এরি এক প্রান্তে আছে আই, সি, এস বা ডিপ্‌টি ছেলের জন্য মেয়েদের "ডানাঝট্‌পটে" নৃত্য, অন্যপ্রান্তে "একান্নবর্ত্তী পরিবারের একান্ন খোঁপ।" তবে গল্পায়নের আড়ষ্টতাই চোখে পড়ে। আধুনিক মেয়েদের চিত্রণ আছে "কলেজের মেয়ে"তে। বৃষ্টিতে ভিজে মোটরে চলে গেলো সুমিত্রা স্বামী সুধীরের কাছে। এখানে সলজ্জতার নেইক বালাই। রবীন্দ্রনাথ থেকে কবিতা-উদ্ধৃতি ভালই হয়েচে। "সহরের মোহে" [১৩৩৭] শান্তার শহরপ্রীতি ও স্বামী প্রকাশের পল্লীপ্রীতি পাশে পাশেই চলেচে। তবে এ দুইধারা একটা সমন্বয় খুঁজে পেয়েচে। "ভুলের ফসলে" (১৯৪৫) রঞ্জনের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েচে। আশালতা সিংহে কচিৎ শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছোট ছোট ঘটনার সমাবেশেই বেশি।

"অন্ধকারের অন্তরেতে" [১৩৩৫] মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এর মুখ্য কথা হ'লো—"যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না"। কমলেশ

আশালতা দেবী

চায় সুমিত্রাকে, কিন্তু পেলো শ্রীলেখাকে। সুমিত্রার বিয়ে ঠিক হ'লো নলিনাক্ষের সঙ্গে আর শ্রীলেখা গেলো তাজমহল দেখতে রঞ্জিতের সঙ্গে। "ছন্দপতনে" [১৩৩৯] গ'ড়ে উঠেচে স্বাতী-ধ্রুবজ্যোতি-সুশোভন ত্রিভুজ। স্বাতীর বোন দীপ্তি কতকটা উপন্যাসের উপেক্ষিতা। অযথা গল্পটাকে ফেনিয়ে তোলা হয়েচে। "দীপালী"তে [১৩৪৮] নীতীশের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েচে। তার জীবনে এসেচে পদ্মা (ঝি) ও দীপালী, যারা আবার চলেও গেচে। এ শোকান্তিক উপন্যাস আর বলার ভঙ্গি সুন্দর।

এর পর শব্দায়নে ও কাহিনী বিন্যাসে দক্ষতা দেখিয়েচেন আশাপূর্ণা দেবী। এঁর হাতে উপন্যাসের গতি এসেচে। "বলয়গ্রাম" মনস্তাত্ত্বিকতায়

আশাপূর্ণা দেবী

এগিয়েচে। টুনি মেয়েটির রূপান্তর হয়েচে লীলায়। সে অল্প বয়সে হারিয়ে যায় আর প্রতিপালিত হয় অন্যখানে। পরে টুনির মা-বাপ যখন তাকে নিতে চেয়েচে, টুনি কিন্তু প্রতিবাদ করেচে। লীলা চেনেনা টুনিকে। একেবারে বিস্মৃতির বলয় গ্রাসে কবলিত হয়েচে টুনি, আর তারি ভস্মস্তূপে জন্ম নিয়েচে লীলা। সমস্যা সংকুলতায় এ তুলিত হ'তে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুয়াশা'র সঙ্গে। তবে ঘটনা সংস্থানে আছে দুয়ের তফাৎ। রচনাশৈলীর জন্যে লেখিকা স্মরণীয়। গিরিবালার 'খণ্ডমেঘে' একটি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। অজানা অবস্থায় ভাই বোনের প্রেম যে সম্ভব তারি অবতারণা হ'য়েচে এখানে। অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের চেয়ে যৌন সম্পর্ক দুর্ম্মর। ভৈরব ও মালার মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠতে লাগলো

তাতে ভৈরব গুহা ছেড়ে পালিয়ে গেল। এ যেন বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র উল্টো পিঠ। ব্রহ্মপুত্রের বর্ণনা চমৎকার ফুটেচে। এর পর বনলতা দেবীর 'দর্পচূর্ণ' নতুনত্ব এনেচে গোয়েন্দাগিরিতে। বিবেক-চন্দ্রিকা ও ব্রজেন্দ্র-অনুকার মিলন হয়েচে। চন্দ্রিকার গয়না চুরির জন্যে অসিতেন্দুকে নিযুক্ত করা হ'লো। ভৈরবই চুরি করেছিল আর তার হ'লো শাস্তি। রোমাঞ্চক উপন্যাস এটা।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' মনোবিকলনে গড়ে উঠেচে। সুপ্রিয়ার জীবনেতিহাসই এর উপজীব্য। আরাবল্লী পর্বতের আওতায় যে প্রেমের আবির্ভাব, তাও রূপায়িত হয়েচে। প্রকৃতি ও মানুষের মিলনে সার্থক হয়েচে এ-রচনা। সুপ্রিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতীক। অজিত ও বিভাস তেমন চিত্রিত হয় নি। এতেই রচিত হয়েচে ছায়াপথ অস্পষ্টতার কুহেলিকায়। এখানে যে কৃতিত্ব আছে তার বাহক 'রাজযোটক'ও। আরো অনেকে পূর্ণ করেচেন সাহিত্যের ডালি। তবে বিশেষ কোন নতুনত্ব ধরা পড়ে না তাঁদের লেখনীতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন সরলা দেবী, ইলা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, সুষমা সিংহ, হেমনলিনী ও চারুবালা সরস্বতী। এঁরা নারীজাগৃতির পাদপূরণের জন্যে স্মরণীয় যদিও নেই কোনো মৌলিকতার ছাপ এখানে।

(৭) শিবরাম চক্রবর্ত্তি (১৯০৫—)

শরৎ পর্বে কেদারনাথ যেমন হাসির খোরাক জুগিয়েচেন তেমনি আধুনিক যুগে শিবরাম চক্রবর্ত্তিও। তবে এ হাসির যোগানদারিরও আছে রকম ফের। মানুষের জীবন একাধারে হসন্তিকা ও শোকান্তিকা। একদিকে তার অসঙ্গতিতে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গ, অন্যদিকে তার দুঃখে ঝরে অশ্রু। হাসি ও অশ্রুর টানাপোড়েনে বয়ে চলেচে এ-জীবন। তাই পাঠকের চিত্তে যা জোগায় ব্যঙ্গের খোরাক, তাই লেখকের কাছে হ'য়ে ওঠে "দস্তুরমতো গঞ্জনাদায়ক"। বস্তুত তিনি অন্যকে হাসালেও নিজে হাসেন না। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়েচেন শিবরাম। রহস্য, বিস্ময় আর কুতুহল হ'লো তাঁর রচনার প্রাণ। সব তত্ত্ব বা জীবনদর্শন তাঁর লেখনীতে ফেনিয়ে উঠে হাল্কা হয়। তাই বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর আবেদন স্বভাবতই ফিকে, বিবর্ণ। W. W. Jacobs-এর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও শিবরাম হয়েচেন ব্যঙ্গরসিক, হাস্যরস তেমন উপচে পড়েনি। এর কারণ অবিশ্যি দেশজ আবহাওয়া, যাতে পাঠক সাধারণ বালপর্বের ব্যঙ্গরসে হাবুডুবু খেতে অভ্যস্ত। লেখকের যেহেতু পাঠকের চিত্তবিনোদনের যোগানদারি করতে হয়, তাই তিনি এ-দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েচেন। বাংলা সাহিত্য সেজন্য হারিয়েচে একজন সত্যিকার হাস্যরসিককে। শিবরাম লিখেচেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি। তবে গল্পের মতো কৃতিত্ব নেই উপন্যাসে। ছোট গল্পের অল্পপরিসরে চুটকি পরি-

যেখানে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন, কিন্তু পারেন নি উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিকায়। এর জন্যে যে ব্যাপক বিশ্ববীক্ষার দরকার, হয়তো তার অভাব আছে শিবরামে। জীবনের গভীরতর তলদেশে না গিয়ে, তিনি এর উপরিকার ঊর্মিমালায়ই বেশি কৌতুহলী। কাজেই তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেচে এরি লীলা।

শিবরামী উপন্যাসে তাই গল্পও মিশে আছে ওতপ্রোতভাবেই। বস্তুত তাঁর উপন্যাস যেন ছোট গল্পেরই বিলম্বিত সংস্করণ। প্রেমই এর উপজীব্য। নর-নারীর ব্যবহারে যে-অসঙ্গতি দেখা যায় প্রেম-পরিক্রমায়, এখানে আছে তারি পরিচয়। এ-সম্বন্ধে তিনি বলেচেন—

> লিখেছি কি আমি অনেক, বন্ধু?
> আমি তো সে সব লিখিনি।
> ছিলো সে লেখিকা অনেক, বন্ধু,
> আমি ছিনু তার লেখনী।

নারীই প্রেরণা জুগিয়েচে লেখকের। তাই মনে হয় প্রেমের প্রকাশনই যেন শিবরাম আর প্রেম ও শিবরাম হরিহর আত্মা। তাঁর 'প্রেমের প্রথম ভাগ', 'মেয়েদের মন', 'মেয়ে ধরা ফাঁদ', 'পাত্রপাত্রী সংবাদ', 'অথ বিবাহঘটিত', প্রভৃতি এর উদাহরণ। 'দেবতার জন্মে' এরি আরেক রসান। মোট কথা শিবরামের আকাশ প্রেমসজল, যা থেকে মাঝে মাঝে ব্যাঙের বাজ পড়ে, আর ঝরে অশ্রুবৃষ্টিও। তবে এদের অবতরণিকা হ'লো শব্দানুপ্রাস। শব্দের কারিকুরিতেই এর বৈশিষ্ট্য, যা জীবনগহনে প্রবেশ করে না। ফলে শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর অর্থও যায় উল্টে। তাই এতে আছে এক ধরণের একঘেয়েমি। বৈচিত্র্য পন্থী নয় বলেই, এ অনুপ্রাস সব সময় আনন্দ দিতে অসমর্থ।

(৮) নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত

কবি ও সমালোচক হিসেবে পরিচিত হ'লেও, নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত এগিয়েচেন কথা সাহিত্যে। এখানে প্রেমই উপজীব্য, যার মারফতে গল্পায়ন ব'য়ে চলেচে। তবে গাল্পিকতার চেয়ে বর্ণিলতা, চরিত্রায়নের চেয়ে বর্ণনাই বেশি ফুটেচে। এদিক থেকে তাঁকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এঁর উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অদৃশ্য সঙ্কেত', 'দুনৌকায়' [১৯৩৭], 'কাঁটাতার' ও 'ধোঁয়া' (১৯৪০)। এখানে রূপক চমক জাগায়। উপন্যাসের নামকরণে ফুটেচে এর স্বরূপ। তাই দু'নৌকায় আখ্যানবস্তু দানা বেঁধেচে জ্যোৎস্না-প্রতিমা-শশিশেখর ত্রিভুজে। নায়ক ভালবাসে দু'জনকে। তাই এসেচে এর প্রতিদ্বন্দ্বী কান্তি, যে মাধুকরী বৃত্তিতে আস্থাবান। কান্তি প্রতিমাকে তার দাদা ভোম্বলের মারফতে বের ক'রে নিয়ে গেলো। কিন্তু বিয়ে কর্তে রাজী না-হওয়াতে ভোম্বল খুন করলো কান্তিকে। এতেই এসেচে

মর্মান্তিক শোকান্তিকা, যার উৎস হ'লো যৌনজ অবিমৃষ্যকারিতা। এখানে গল্পায়ন চলেচে একটি মুহূর্তকে নিয়ে। মনে হয় যেন একটি ছোটগল্প, যাতে আছে মনস্তাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটন। গাল্পিকতা এগিয়েচে আকস্মিকের ধাকায়। তাই চরিত্রগুলি অস্পষ্ট। তবে বাচন ভঙ্গি উল্লেখযোগ্য যেমন বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা। এর উদাহরণ (১) "স্ত্রী স্বাধীনতা এদেশে ধাইগিরি আর মাষ্টারণীগিরিতে এসে ঠেকেছে"; (২) "আমার তৈরি সৌরজগৎ চূরমার হ'য়ে গেলো—আজ আমি স্বকার সৃষ্টির ধ্বংসস্তূপে সাধনা ভ্রষ্ট বিশ্বামিত্র।" এরপর 'ধোঁয়া'য় সত্যিকার ঘটনা চাপা পড়ে গেচে। ফলে সুনীপার জন্তে জেলে গেল প্রশান্ত। দারিদ্র্য ও সংস্কারের নিষ্পেষণে প্রশান্ত'র জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেল। এখানে ছোট গল্পই এসেচে। এ স্মরণ করিয়ে দেয় শরদিন্দুর 'বিষের ধোঁয়া'। তবে গল্পায়ন কি চরিত্রায়ন এর কোনটিই বাস্তব ঘেঁষা হ'তে পারেনি। বস্তুত কবিরানার দোষও এইখানে।

(৯) পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রেমই বেশির ভাগ বাংলা গল্পের উপাদান। এর প্রবাহে ব'য়ে চলেচে গল্প-ধারা। বিদেশী সাহিত্য-কণাও জুগিয়েচে এর প্রাণ প্রেরণা। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'মদন ভস্মের পর'-এ [১৯৩৮]। এখানকার গল্পায়ন এগিয়েচে নরনারীর তিনটি জোড়ে। কেতকী—সুকুমার, ললিতা-অনুপম ও লীলা-জয়ন্ত জোট মারফতে গড়ে উঠেচে এ-উপন্যাস। লেখকের উদ্দেশ্য ফুটেচে বইয়ের নামকরণে। প্রেম আজ আর নেই। তাইতো Count Keyserling বলেচেন—"Lying on its death-bed in Europe, love has become openly unmodern...from now on love is to exist no more." তাই বক্তব্য বেরিয়েচে জয়ন্ত'র চিঠিতে :

"আমরা ভালবেসেছি এবং হারিয়েচি, তুমি আর আমি, এযুগের ভাই আর বোন, মেয়ে এবং পুরুষ। আমাদের গুরু কাইসারলিং রয়েছেন আমাদের মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে, রয়েছেন বার্টরাণ্ড রাসেল, আলডুস হাকসলি—মানস অরণ্যের আরও কত নবনব দিশারী। পথ দেখাচ্চেন তাঁরা আমাদের : প্রেম নেই, প্রেম নেই—পৃথিবীতে প্রেমের পরমায়ু ফুরিয়ে গিয়েছে, ফুলে আর সুগন্ধ নেই, রুপোলী চাঁদ মিত্তে একরাশ শিশে হ'য়ে গিয়েছে।"

কথ্যভাষার ভঙ্গিতে এসেচে ভাবের নবরূপায়ন। বিষয়বস্তুর মৌলিকতা সত্যি স্মরণীয় আর লেখক প্রশংসার্হ।

(১০) অমলা দেবী

প্রেম সমস্যা নিরূপণে যিনি কৃতিত্ব দেখিয়েচেন ব্যঙ্গ রসিকতায় তিনি হলেন অমলা দেবী [ওরফে ললিতানন্দ গুপ্ত]। ব্যঙ্গের ঝাঁজ ও করুণার অনুভূতি

এ দুয়ে মিলে হয়েচে চরিত্র সৃষ্টি। বিষয়বস্তুর মৌলিকতা এসেচে প্রেমের নতুন প্রকাশে। এ-প্রেম নরনারীর দিক থেকে দেখা হয়েচে। এ এক রকমের শোষণ, যা ফুটেচে 'সুধার প্রেম'এ [১৯৪০]। পুরুষের প্রেম ঠাট্টায় হয়েচে কত বিকৃত। প্রেম পুরুষের পক্ষে অভিনয়। মনোজ সুধার সঙ্গে প্রেম করলেও সম্পত্তির লোভে বিয়ে করেচে মাধুরীকে। এদিকে অন্তঃসত্বা সুধা উপেক্ষিত হওয়ায় মালিশ খেয়ে মারা গেল। মনুজ সত্যি নির্মম, নিষ্ঠুর। খবরটা পড়ে সে মাধুরীকে করেচে আলিঙ্গন। মনস্তত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েচে যখন লেখক বলেচেন: "নারীর দেহটার উপরেই তো চিরদিন পুরুষের লোভ। পাইলে এক চুমুকে রস রক্ত ও মজ্জা সব শোষণ করিয়া লইয়া শুষ্ক দেহটাকে ফেলিয়া দিয়া যায়; একবার ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখেনা কি হইল সেই দেহটার।" পুরুষের এই লোভটাকে বশে আনবার জন্যে চলে অনেক রাত্রিক চেষ্টা। এতে একদিকে যেমন "পুরুষের চক্ষে ঘনায় প্রেমাশ্রু, গড়িয়া ওঠে গৃহ" অন্যদিকে "রচিত হয় নারীর ভুলের স্বর্গ"। বিজ্ঞানী আলোকপাতে প্রেমবস্তুর স্বরূপ এখানে ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের ঝাঁজও লক্ষণীয় এবং উপভোগ্য। এর উদাহরণ (১) "লোকে যেমন শখ করিয়া আফিমখাইতে শেখে, মনোজ তেমনই শখ করিয়া প্রেম করিতে গিয়াছিল"; (২) "ভজনখানেক কুহু, দমকা দুই দখিনা বাতাস, ঝলক কয়েক জ্যোৎস্না পার্শ্ববর্তিনীকে যে কোন মুহূর্ত্তে বক্ষবর্তিনী করিতে পারে।" ব্যঙ্গের ঝাঁজালো রূপ বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করেচে।

"সুধার প্রেম"-এ যেমন ঠাট্টা আছে নায়ক নিয়ে, তেমনি নায়িকাকে নিয়ে বিদ্রূপ ফুটেচে "সরোজিনী"তে [১৯৪২]। সরোজিনীর পুরুষালি আচরণ গ্রামে তুলেচে হৈচৈ। একদিকে পুরুষদের মধ্যে অভিভাবকত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে মহিলাদের ঈর্ষাসন্দেহ। এসবে পল্লীস্তব্ধতার ধ্যান ভেঙে গেচে। তাই সরোজিনী ঘূর্ণির বুদ্‌বুদে ফুটেচে ফুটি-মিণ্টার প্রেম ও হারানের প্রায়শ্চিত্ত। দারোগা হাকিম প্রভৃতির সঙ্গে নায়িকার অন্তরঙ্গতা এনেচে কৌতুকের নব পরিচয়। ক্ষণিকের হুল্লোড়ে যে অসঙ্গতি ও যৌনজ সংস্কারের পরিচয় মেলে তারি সুষ্ঠু নিদর্শন হ'লো এ-উপন্যাস। সরোজিনী তাই চিত্রিত হয়েচে হাসিঠাট্টার রকমফেরে। নরনারীর দুটো দিক দেখানোর পর লেখক এসেচেন "চাওয়া ও পাওয়া"তে। আদর্শও বাস্তবের সংঘাতই এর উপজীব্য। তাই গল্পের আরম্ভটা নাটকীয় ভঙ্গিতে। স্থান ও কালের উল্লেখে গাল্পিকতা রূপ ধরেচে। পরেশ চেয়েচে রবি ও কমলাকে, কিন্তু পেলো আরতিকে। এদিকে পরেশ-আরতির মিলন দিনে আরতি স্মরণ করেচে সুখেন্দুকে। পরেশ, রবি ও কমলা প্রত্যেকেই ভাবচে পুরনো বন্ধুকে। এই যে চাওয়া এই হ'লো আদর্শ আর পাওয়া বাস্তব। চাওয়া তাই কাজ করেচে পূর্বস্মৃতির মারফতে। যৌন সম্পর্কের লীলায় তাই দেখা যায়—

চাওয়া যখন নিরাশ হ'য়ে
সত্য করে থাম্‌বে;

পাওয়া তখন আসমানী ফুল
স্বর্গ হ'তে নাম্‌বে।

আঙ্গিক ও বিষয় বস্তুর দিক থেকে এ অভিনব। এখানে আছে প্রেমের নতুন উপলব্ধি যা এগিয়েচে বাস্তবের ভিত্তিতে। গল্পায়নের ব্যাপকতায় এসেচে "কল্যাণসংঘ" [১৯৫০]। এখানে নীরজার চরিত্রায়ন ব'য়ে চলেচে যৌন লীলায়। মাঝেমাঝে জুটেচে সংস্কৃতি বিলাসী সংঘের ঢেউ। মোটকথা লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

(১১) মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরনো প্রসিদ্ধি অনুসরণ করেচেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর 'স্বয়ংসিদ্ধা' [১৯৩৫] উল্লেখযোগ্য, যা চিত্রজগতে চাঞ্চল্য এনেচে। এ চণ্ডী নামে প্রথম বেরোয় ১৯২০ সালে 'প্রবাস-জ্যোতিতে' আর 'বসুমতী' মারফতে রূপ নিয়েচে 'স্বয়ংসিদ্ধায়'। চণ্ডীনাম্নী একটি মেয়ের কাহিনী। তারি সাহচর্যে গোবিন্দ'র হয়েচে রূপান্তর। এতে আছে চারটি পর্ব। অসম্ভব ঘটনায় সমাবেশ হয়েচে যখন চণ্ডী কথা কইচে কমিশনারের সঙ্গে। এর জন্যে লেখক চণ্ডীকে একটু চড়া রঙে চিত্রিত ক'রেচেন। এছাড়া আছে 'যুগের যাত্রী' [১৯৪৬] ও 'হিংসা ও অহিংসা' [১৯৪৬], যাতে আছে সমসাময়িক ঘটনার রূপায়ন। শেষেরটিতে কংগ্রেস আন্দোলন চিত্রিত হয়েচে দুটি আদর্শের পটে। পিনাকীলাল যেমন হিংসার প্রতীক তেমনি সত্যব্রত অহিংসার। এ'দুয়ের দোলায় দোল খেয়েচে চরিত্রগুলি। এদিক থেকে এতে আছে সমসাময়িক মহাকাব্যের ঢঙ। গল্পায়নে এসেচে সংস্কৃতি-বিলাস ও বিদেশিভাবের ঢেউ। কাজেই লেখক এগিয়েচেন ঘরোয়া পরিবেশ থেকে বিশ্বগ চিন্তাধারায়। তাই উদ্দেশ্যের ভিতে উঠেচে গল্পের ইমারৎ। এখানে তাই মেলে বিবর্তনের পরিচিতি।

(খ) বিয়াল্লিশোত্তর অনুপর্ব (১৯৪২-৫২)

উত্তরতিরিশে সমাজতন্ত্রের বিলাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। এ ক্রমশ এগিয়ে এলো বাস্তবতায়। এ প্রগতির মূলে কাজ করেচে সমাজ-ভাঙন। আর্থিক বনিয়াদ ভেঙে পড়েচে, রাজনীতিক ব্যর্থতা পঙ্গু করেচে সমাজ-জীবন। তাই এর উপান্তে এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। এর মধ্যে অবিশ্বি এলো 'ভারত ছাড়' অভিযান [১৯৪২] ও পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)। এতে সব চেয়ে বেশি আঘাত পেলো বাংলা ও বাঙালী। তাই আর্থিক অস্বচ্ছলতায় সমাজে যে চিড় দেখা দিলো তা বেড়েই চল্‌লো। এরি সঙ্গে যুক্ত হ'লো ছেচল্লিশের দাঙ্গা [১৯৪৬], যা সাতচল্লিশের

ভারত বিভাগে (১৯৪৭) শেষ বারের মতো ধক ক'রে জ্বলে উঠলো পাঞ্জাবে। এরি আরেক ঝলক দেখা গেলো দু' বাংলায় ১৯৫০ এর প্রথমে। এ-ভাবে উদ্বাস্তু সমস্যায় এগিয়েচে বাংলা। তার কোন শান্তি নেই। তাই ভাববিন্যাসে দেখা যায় যেমন রাষ্ট্রিক চেতনা, তেমনি সমাজের ভগ্নস্তূপও। একটা বিরাট কালোছায়া ব্যাপ্ত হয়েচে বাংলার আকাশে তথা বাঙালীর জীবনে। সে ভাবচে, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই ব্যর্থতায় এসেচে ঔদাসীন্য। ক্ষয়িষ্ণু বাংলার রূপই ফেটে পড়েচে। বাঙালীর কাছে তাইতো প্রতিভাত হচ্চে—মা কি ছিলেন, মা কি হ'য়েচেন! কিন্তু 'মা কি হবেন' সে সম্বন্ধে সে কোন আশার রেখা দেখতে পাচ্চে না। সাহিত্যায়ন তাই কখনো বা চলেচে মনায়নে, কখনো বা গণজ চেউয়ে। কিন্তু সত্যিকার কোন প্রোলেটারীয় সাহিত্য এখনো গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে নি। হয় তো পঞ্চাশোত্তর সাহিত্যায়ন এদিকে মোড় নেবে। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিই তাই ভেঙে পড়েচে এ-যুগের সাহিত্যে। ফলে করুণরসের প্রাবল্যই চোখে পড়ে। তবে মননের ঔজ্জ্বল্যও কম নয়।

(i) মনায়ন ঃ

বাহির বিশ্বের আঘাতে আন্তর চেতনা জেগে উঠেচে। ফলে চিন্তনের দোলা অনিবার্যভাবেই হাজির হয়েচে। বস্তুর ভিতরকার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাই মানুষ হয়েচে সচেতন। এরি রকমফেরে এসেচে যুদ্ধকালীন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার, যার ফলে সম্ভব হয়েচে আণবিক বোমা। বস্তুর অণুতে অণুতে ছড়িয়ে গেচে এই বিজ্ঞানী অনুসন্ধিৎসা। এতে সমাজের রাষ্ট্র-বিত্ত-বর্ণের হয়েচে স্বরূপ বিশ্লেষণ। শুধু তাই নয়, পুনঃ বস্তুরও হয়েচে নবায়ন। যে প্রেম এতকাল ছিলো আবেগের উদ্গতিতে দেবায়িত, আজ তা দেখা দিলো কুৎসিত কংকালের পলেস্তারা হিসেবে। এ-ভাবে মূল্যায়নে বস্তুর মানের হয়েচে অনেক রদ-বদল। এ-ধারার বাহক হ'লেন কয়েকজন বিশিষ্ট লিখিয়ে।

(১) সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯)

জীবন বিশ্লেষণে যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা আছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যে। বিদেশে টমাস ম্যান, আলডুস হাক্‌সলি প্রভৃতি যে মননের পরিচয় দিয়েচেন সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে, এখানেও আছে তাই। এতে যেমন আছে মননের নেপথ্য, তেমনি ভাবের রঙ্গমঞ্চও। মানসিক যোগসূত্র কখনো লোপ পায়নি বা উগ্র হ'য়ে দেখা দেয়নি। অনুভূতির বিস্তারে এ সুনিয়ন্ত্রিত। সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও রূপায়নই এখানে বড়ো কথা। তাই ধূর্জটীপ্রসাদী মনায়নের উগ্রতা যেমন এখানে অনুপস্থিত, তেমনি অচিন্ত্য-বুদ্ধ'র ভাবাবেগ প্রাবল্য। বস্তুত দু'য়ের আনুপাতিক মিলনেই ফুটেচে বৈশিষ্ট্য বা তুলি বুলিয়েচে অসুস্থ সভ্যতার উপর। নায়ক-নায়িকার সংলাপে এসেচে সমালোচনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিকারের ইঙ্গিতও। সভ্যতার বিরাটরূপে বিশ্ববীক্ষা ভেসে

ওঠে, যাতে দেখা যায় মানুষ নিয়তির পায়ে লুটিয়ে পড়চে। তা হ'লেও পুরুষকার একেবারে উপেক্ষার নয়। নৈরাশ্যের ভেতরও দীপ্তি পায় আশার আলোক, যা দিগন্ত ঝল্সে দেয়। এই অবলোকনে ভুলত্রুটি ধরা পড়ে—ফলে সম্ভব হয় নতুন পৃথিবীর ভিত্তিরচনা। তাই দৈব ও পুরুষকারের দ্বৈতলীলায় চলেচে জীবন নাট্য, যার উপজীব্য হয়েচে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। এদিক থেকে সঞ্জয়ের মানস বিবর্তনে দুটি স্তর লক্ষণীয়। নিয়তির খেলায় এসেচে বৃত্তায়ন, যা ফুটেচে 'মরামাটি' [১৯৪১], 'বৃত্ত' [১৯৪২], 'দিনান্ত' [১৯৪৩] ও 'কয়েদেবার' [১৯৪৪]। এরপর পুরুষকারের জয় ঘোষিত হয়েচে নব সৃষ্টিতে। এরি পরিচিতি বহন কচ্চে 'রাত্রি' [১৯৪৫], 'কল্লোল' [১৯৪৭], 'মৌচাক [১৯৪৮] ও 'সৃষ্টি' [১৯৫০]।

নিরাশার নৈরাশ্যে লেখক পথ খুঁজেচেন, কিন্তু পাননি। তাই তো অন্ধকার নেমে এসেচে, যাতে ডুবে গেচে কৃষি-সভ্যতার ভিৎ। 'মরামাটি'তে দেখা যায় মাটি ম'রে গেচে। যে ভরত মাটি আঁকড়ে ছিল, সে বুঝলো যে এ আর সম্ভব নয়। দিন দিন জমি হচ্চে অজন্মা। এর মূলে কাজ করেচে কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো বা অনাবৃষ্টি। এতে ফসল ফলে না। ভরত বিদেশে কাজ ক'রে যখন বাড়ি ফিরেচে, তখনি সে দেখলো যে তার স্ত্রী সুবর্ণ ও পুত্র বংশী মারা গেচে আর বোন দুর্গাও পালিয়েচে রজনী সা'র সঙ্গে। নিজের বসত বাটিতে উঠেচে রজনী সা'র ধানের গোলা। এতে চাষীর দুঃখই রূপায়িত হয়েচে গণসাহিত্যের প্রসারে। গ্রাম্য গানের মেঠো সুরও ভেসে আসচে ভরতের কণ্ঠে—

> কি শেল মারিলি ভাই তীরন্দাজ রে—
> না দেখ্লাম হরিণার মুখ
> না দিলাম ছাওয়ালের দুধ
> বিনাদোষে মারলি শেলের ঘাই ভাইরে।

এ ঘটনা সত্যি মর্মান্তিক। কৃষির সত্তা ডুবে গেচে অন্ধকারে। তাই শংকর বলেচে: "গাঁ কেউ বাঁচাতে পারবে না।" এতে নৈরাশ্য নিষ্প্রদীপ করেচে প্রাচীন সভ্যতার ভিৎ। এর পর ঘনিয়ে এসেচে অন্ধকার দাম্পত্য পরিবেশেও। তাই বৃত্ত রচিত হয়েচে আর এ আবর্তিত হয়েচে বিবাহকে কেন্দ্র করে। এ বৃত্তায়নের আছে তিনটি পর্ব, য গড়ে উঠেচে ১৯৪১এর ২১শে জুনকে নিয়ে। তবে এক এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়েচে এক একটি পর্ব। ফলে উপন্যাসের ঘটনাকাল হ'লো রাত্রি ৮টা থেকে ১০টা। 'ইউলিসিস' ও 'একদা' যেমন একটি দিনের কাহিনী, এ তেমনি তিন ঘণ্টার। তবে পরিধি ব্যাপকতর হয়েচে স্মৃতিরোমন্থনে। বিবাহবার্ষিকী এসেচে তৃতীয় পর্বে, বিবাহোত্তর ঘটনাপ্রবাহ দ্বিতীয় পর্বে আর ১৫ বছর আগের কথা প্রথম পর্বে। কালের আবর্তন হয়েচে পেছনমুখো। চিন্তনের রূপ এখানে সংহত। কালায়নে স্মৃতি খাদুর মতো ঘুরে বেড়াচ্চে, ঠিকমতো দানা বাঁধতে পারেনি। তাই তো বিবাহ-বার্ষিকীতে স্বামী সত্যবান স্ত্রী সতীর কথা ভুলে গিয়ে ভাবচে শিশির বনানীর কথা।

স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের স্বরূপ ফুটেচে : "স্ত্রী স্বামীর নাগাল পায় না বা স্বামী স্ত্রীর। বিয়ে এদের জীবনে তবু একটা বৃত্ত আঁকতে চায়।" বৃত্তায়ন 'শেষ প্রশ্নে'র ক্ষণিকবাদ বা 'শেষের কবিতা'র স্বকীয়া-পরকীয়া থেকে অনেক দূরে। সংযম ও অসংযমের দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হয়েচে প্রেম 'দিনান্তে'। অবনী বাবুর স্টীল কারখানার দিন ঘনিয়ে আসচে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেও এসেচে ভাঙন। তাই তো অসিত স্ত্রী অলকা ও পুত্র ঝুমুরকে ছেড়ে নেলীকে নিয়ে থাকে; অজিত মন্দারকে ভালবাসলেও বিয়ে করেচে গীতাকে; নীহার স্ত্রী সুনন্দা ও পুত্রদ্বয় টুটুল-টুল ছেড়ে ভালবাসচে স্ত্রীর বোন সুপ্রিয়াকে। নিয়তি মাথা খাড়া করেচে সামাজিক মূর্তিতে। দীপক তাই বলচে : "Conflicting tendencies নিয়ে মানুষ তৈরি—উচ্ছৃঙ্খলতা আর সংযম পাশাপাশি তার মনের রাজ্যে বাস করে—কিন্তু সমাজের চাপে মানুষ বেছে নেয় একটা tendency, বিপরীত tendencyকে গলা টিপে মারতে থাকে।" এরপর 'কস্মৈ দেবায়' আজিকের এক নতুন পর্যায় খুলে দিয়েচে, যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এ হলো 'ভূমিকা সম্বলিত' উপন্যাস, যা স্মরণে আনে বার্নার্ড শ'র ঐ ধরণের নাটক। নিয়তির রকমফেরে প্রকাশ পেয়েচে মরা মাটি, দাম্পত্যবৃত্ত ও সামাজিক চাপ। কিন্তু এখানে নিয়তি সংসারের স্রোতে রূপায়িত হয়েচে। আদর্শের ঘূর্ণি তাই বড়ো কথা এখানে। ২২শে ডিসেম্বর রাত বারোটায় আরম্ভ হয়েচে ঘটনা আর এ বয়ে চলেচে শ্যামলের আত্মকথায়। দ্বিতীয় ভূমিকা গড়ে উঠেচে ১৯৪৩এর ৪ঠা জানুয়ারীকে কেন্দ্র ক'রে। এ হ'লো চিত্রার আত্মকথা। তৃতীয় ভূমিকায় গল্পায়ন শেষ হয়েচে। মানুষের কাজ কর্ম সময়ের বুদ্বুদ, যার নিয়ামক হ'লো নিয়তি। কে কখন দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয় তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। শ্যামলকে তাই ছেড়েচে চিত্রা। শ্যামলও রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে গেলো। দেউলি ক্যাম্প থেকে সে ফিরে এসেচে বাংলায়। এই যে স্রোতে ভাসচে মানুষ তার কারণ সে "পেতে চায়না কিছু—একটা দুর্ণিবার স্রোতের মুখে এঁকে বেঁকে ধ্বংস হ'য়ে, কখনো বা সৌন্দর্যস্ফীত হ'য়ে চলাইতো মানুষের জীবন। এ থেকে তার মুক্তি নেই।" এখানে নিয়তির বিশ্বরূপই ফুটে উঠেচে।

নিরাশার নৈরাজ্য থেকে নিষ্ক্রমণ এসেচে পুরুষকারের আবির্ভাবে। এ সম্ভব হয়েচে বিশ্বাসের মারফতে। ঘূর্ণির আবর্তে যে পাঁক জমে উঠেচে তা দীর্ণ হয়েচে আলোড়নে। তাইতো আশার রেখা উদ্ভাসিত হয়েচে দ্বিতীয় স্তরে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে মুখর হয়েচে 'রাত্রি', যেখানে দুঃখের আঁধার রাত্রি এলেও শাশ্বত আশা পথে হাতছানি দিয়েচে। তাইতো কবির ভাষায় এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েচে—

> সেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সত্তারে
> সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
> খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।

এখানে পাঁচটি দৃশ্যে ঘটনা এগিয়েচে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩এ। কালের ক্রমিক বিবর্তনই এখানে মুখ্য। পোলাণ্ড আক্রমণে হিটলারী আমল সুরু হ'লো আর

দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেলো রাত্রির কালো ছায়া। এ থেকে বাংলাও বাদ পড়েনি! কলকাতায় এসেচে মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা প্রভৃতি যাতে সুদাস ও শ্যামলী দোল খেয়েচে। এই আবর্তে ঘুলিয়ে উঠেচে প্রণব, রম্ভা, মহীতোষ প্রভৃতি। জীবনের স্বরূপ "রোমান্টিসিজ্‌ম্ নয়, আবার পুরাদস্তুর গদ্যও নয়। জীবনটা রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার মতো।" তাইতো আশার আলো ঝিলিক দেয়ঃ "এরাত্রি নয়। কোনো অন্ধকার সূর্য্য বুঝি ছায়ারশ্মিতে ঢেকে দিয়েচে আকাশ—যে রশ্মি পান করে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।" এরপর "কল্লোলে" যে ঢেউ উঠেচে তার কেন্দ্রও রজনীতিক। "রাত্রি" এসেচে রাষ্ট্রিক পোষাকে, যার আরেক রূপ প্রতিভাত হয়েচে ঘূর্ণির "কল্লোলে"। রামেশ্বরের মৃত্যুতে এসেচে কল্লোল যাতে ভাবী দিনের ছবি ফুটেচে প্রতীপ ও সুজাতার মারফতে। ভারতের রাষ্ট্রগুরুর চিন্তায় জাগচে এক সমন্বয়ের সাধনা, নতুন "পথের ইসারা"। এ হ'লো "ইনফ্রা-রেড আর আলট্রা ভায়োলেটের মাঝা-মাঝি পথ—রেড কমিশারদের রক্তচক্ষুর শাসানিও নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনার পথে জগতের কল্যাণ সাধনও নয়।" "মৌচাকে" এসেচে ভাঙনের ইতিহাস, যা স্মরণে আনে টমাস ম্যানের Budden Brooks-এর কথা। চারটি পর্বে গড়ে উঠেচে কাহিনীর ইমারৎ। ১৯১২ এ দেখা যায় বিরজার সংসারে আছে স্বামী মোহিনী ও তিনটি ছেলেমেয়ে, তিতু, মিতু ও হাবুল। ১৯২৪এ মোহিনীর সংসারে কালোছায়া পড়লো। ১৯৩৬ এ তিতু ও তার বাবা মৃত আর বিরজাও চলে গেচে নিঃসঙ্গপুরী ছেড়ে; হাবুল হয়েচে শিশির আর উকিল। বৌ মুকুল ঘরে এসেচে। ১৯৪৮ এ মিতু হয়েচে মিহির। আবার ভাঙার উপর সংসারের নতুন মৌচাক বাঁধবার চেষ্টা চলেচে। আশার স্পন্দনে এ কম্পমান। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে হয়েচে ঘটনা সমাবেশ। মনে হয় এ যেন চতুরঙ্ক নাটক, নাট্যোপান্যাস। Aldous Huxleyর Eyeless in Gaza-র উপায়ন কৌশলও এখানে চোখে পড়ে। সেখানে সময় সামনে ও পেছনে ফিরেচে, কিন্তু এখানে সময় ক্রমিক, শুধু সামনের দিকেই এগোচ্চে। আঙ্গিকের দিক থেকে এ উল্লেখযোগ্য। এরপর 'সৃষ্টি' [১৯৫০] এসেচে। এখানে স্মৃতি একটি চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েচে। দীপায়ন চৌধুরীর সত্তায় ঘিরে আছে স্মৃতি ও সমসাময়িক ঘটনার উল্লাস। প্রতিমুহূর্তে চেতনা চিন্তায় মানুষ আলাদা কিন্তু অপর একটি মানুষের মতো নয়। তাই মানুষের স্বরূপ সন্ধানে অনেক পথ হাঁটতে হয়, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। এরকারণ, "জীবন একটা বস্তু নয়, গতি-ভঙ্গি" আর মানুষ "অজস্র ষ্টীল ফটোগ্রাফ।" এখানে বিজ্ঞানীআলো এসেচে মানুষীসত্তা বিচারেও।

বিশ্লেষনী প্রতিভা তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যে আবেগের দোলায় দুলে উন্মথিত করেচে জীবনজিজ্ঞাসার হাজার জটিলতা। চিন্তনের পরিচিতি বহন করচে তাঁর উক্তিঃ "স্মৃতি শুধু ক্লান্তির ভাটার টানেই টেনে নেয়না, উত্তেজনার জোয়ারে মনকে ফাঁপিয়ে তোলে।" এখানে ভাব রূপায়িত হয়েচে মাননিক আবেগে।

শিল্পায়ন তাই তাঁর মতে জীবনকে লোভ দেখায় যেহেতু "জীবনের একটি সম্ভাব্য ভঙ্গী নিয়েই শিল্পসৃষ্টি হয়—জীবনের হুবহু ভঙ্গী নিয়ে নয়।" কাজেই তাঁর ধারণা "সত্যিকারের উপন্যাস জীবনের ভেতর প্রবেশ করেনা। জীবনকে তার ভঙ্গীতে প্রবেশ করবার লোভ দেখায়।" এরি সুষ্ঠু উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হ'য়ে রইল তাঁর উপন্যাসগুলি।

(২) নবেন্দু ঘোষ

সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন রূপায়নে অনেকে এগিয়ে এসেচেন। এর জন্যে দায়ী তাঁদের সাংবাদিক মন। কিন্তু সাংবাদিকতা কালায়নে রূপান্তরিত হয়েচে সাহিত্যায়নে। বিদিশি সরকারের কার্যকলাপ গণ চক্ষুর সামনে ধ'রে দেয়ায় ফুটেচে রাষ্ট্রিক চেতনার রূপ, যা প্রয়োজন হ'লে অত্যাচার বা কারাবাস করতেও পেছপা হয়না। এতে অবিশ্যি আছে বেদনা রসের ভিয়ান। দুঃখদুর্দশার প্রান্তিকে আছে যে আশার আলো তারি ইঙ্গিত দিয়েচেন নবেন্দু ঘোষ। এর সাহিত্য সাধনায় আছে দুটো পর্ব—সাংবাদিকতা ও সাহিত্যায়ন। প্রথমের পরিচায়ক হ'লো "ডাকদিয়ে যাই" [১৯৪৪], "প্রান্তরের গান" [১৯৪৬], ও "ফিয়ার্স লেন" [১৯৩৭]। দ্বিতীয় ধারার বাহক হিসেবে স্মরণীয় "বসন্তবাহার" [১৯৪৯] এবং "নায়ক ও লেখক" [১৯৪৯]।

প্রথমেই রাজনীতিক উপন্যাসের কথা। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" "ঘরে বাইরে" ও "চার অধ্যায়" এদিকে যে দৃষ্টি দিয়েচে এখানে তারি ব্যাপক প্রসার। তবে উগ্রতাই এখানে বেশি চোখে পড়ে। "ডাক দিয়ে যাই" সাধুভাষায় লেখা। চেতনা প্রবাহে আছে যে এলোমেলো চিন্তার মালা, তার ধাঁচ কিন্তু নিরূপিত হয়েচে স্বদেশিয়ানায়। আখ্যানবস্তুতে দেখা যায় কল্যাণীর চারটি ছেলে—দিলীপ, শেখর, প্রমথ ও গোরা—আর একটি মেয়ে উমা। দিলীপ কবি কিন্তু বিকারগ্রস্ত; শেখর স্বদেশের কাজে খুন হয়েচে; প্রমথ কারাবন্দী; আর গোরা মূক। কল্যাণী যেন ভারতবর্ষেরই প্রতীক—সে "দুঃখিনী, সন্তান হারা, অভাবের নাগপাশে শৃঙ্খলিত।" সভ্যতার মোড় পরিবর্তনে অমৃতের হয়েচে নতুন মূল্যায়ন। বস্তুত অমৃতত্ব এক বিশেষ মানসিক অবস্থা যাতে সংস্কারমুক্ত মনে মানুষ ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। এই মানবপ্রীতিই অমৃত। লেখক এর জন্যেই সবাইকে ডাক দিয়েচেন। নরনারীর নতুন সংজ্ঞা দেয়া হয়েচে—"'নারী'। রঞ্জিত ওষ্ঠ, পাউডারভস্ম-বিভূষিত মুখ, নিতম্বের গতিচ্ছন্দ। 'পুরুষ'। দৃষ্টি, ঊর্ধমুখী, নিম্নমুখী, তির্যক, বক্র, কামনাতুর।" চেতন-অচেতনের লীলায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন প্রকাশ পেয়েচে। 'ইউলিসিস'-এর মতো ছোট ছোট শব্দ ফুটে উঠেচে চেতনাপ্রবাহে। এরা যেন বুদ্বুদ—

"হু—"
রাস্তা।
শব্দ।
আলোর প্রেত!
হাসি!
কলরব।

এরপর 'প্রান্তরের গানে' ২টি খণ্ড আছে। প্রথমের ঘটনাকাল ১৯৩৯ থেকে আগষ্ট আন্দোলন পর্যন্ত আর দ্বিতীয়ের ১৯৪২-৪৩। 'ভস্মলিপি' ও এর আরেক নাম। উপন্যাসের তিনটি পর্ব আছে—প্রান্তরের গান, ঝড়ের সংকেত ও ঝড়। নন্দ ও কাজলতার কথায় পাড়ি জমিয়েচে দেশকর্মী প্রবীর। মাধবী কিন্তু ঝুঁকেচে প্রবীরের দিকে। প্রবীর চালান হয়েচে স্বদেশিয়ানার জন্যে। দেশের বুকে তাই অশ্রু উপ্‌চে পড়েচে করুণায়। মনে হয় দেশ যেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখচে। রাজনীতিক সমস্যা পরে রূপান্তরিত হয়েচে সাম্প্রদায়িকতায়। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। অন্তর্দ্বন্দ্বে যে দাঙ্গা এসেচে তারি পরিচায়ক হ'লো 'ফিয়ার্সলেন' যা ছেচল্লিশের ১৬ই-আগষ্টকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েচে। বাস্তবের এ রূপায়ন সুদুর্লভ। কাব্যে এ-কাজ করেচেন বিষ্ণু দে তাঁর 'সন্দ্বীপের চরে'। লেখক তাই ভূমিকায় বলেচেন: "এর ভালোমন্দ অধিকাংশ চরিত্রই আমার দেখা—তাঁরা নিছক কল্পনা প্রসূত নন।" উপন্যাসের স্থান হ'লো ফিয়ার্স লেন ও সগর দত্ত লেন। আজমল ভালো লোক কিন্তু তার পুত্র লীগপন্থী। গুণ্ডাদের মধ্যে তাজমহম্মদ, আকবর ও মুস্তাক প্রধান। এ সব গুণ্ডা একে একে শেষ করেচে সুমন্দার মা-বাপ, মাসী-পিসী, গিরিবালা—অজিতদের বাড়ীর সবাইকে। এদিকে আজমল আশ্রয় দিয়েচে নিবারণ, পরেশ ও গজাননদের পরিবারকে। এদের রক্ষার্থে আজমল নিজেই খুন হয়েচে আর জখম হয়েচে হোসেন। একটি দিনের কাহিনী নিয়ে এগিয়েচে এ গাল্পিকতা যেমন গোপাল হালদারের 'একদা'। গুণ্ডাদের হিন্দীবুলি জীবনের ছাপ বহন করলেও চরিত্রগুলি অল্প পরিসরে তেমন ফোটেনি।

এরপর এসেচে সাহিত্যায়ন। 'বসন্তবাহার' সাধারণ প্রেমের কাহিনী। অনিমেষ রায় বলচে সুব্রত—কৃষ্ণার প্রেমকাহিনী আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে। এতে কথ্যভাষাই প্রাধান্য পেয়েচে, যা, এক একবার জ্বলে উঠেচে মননের ভাস্বরতায়। সাম্প্রতিক ঘটনায় সাংবাদিকরূপ পেরিয়ে লেখক এসেচেন মনোলোকে, শিল্পায়নে। জীবন ও মনের যে দ্বন্দ্ব তারি রূপায়ন হ'লো 'নায়ক ও লেখক'। এর সঙ্গে তুলনীয় Pirandelloর Six characters in search of an author। জীবনে লেখক ভালবাসে দেবীকে, কিন্তু গৌরী চায় তাকে। অনিল মিত্রের সঙ্গে দেবীর বিয়ে ঠিক হওয়ায়, লেখক বনে পালিয়ে প্রাণ হারায়। মনোলোকে কিন্তু ভাস্কর ভালবাসে বহ্নিকে আর নির্যাতিত মানবের উন্নয়নে এগিয়ে এসেচে। মাতালদের মধ্যেও আছেন ভগবান। সুরতিয়া নাচে আর ছোট্টু ঢোলক বাজায়—

কালো ছোঁড়ার কোমর ধরে
নাচে মাতাল ছুঁড়ীরে—
নাচে মাতাল ছুঁড়ীরে—।

অতিমানব যে দিন ধরায় নামবে, সে দিনই তো বিপ্লব সুরু হবে। এখানে লেখক একদম সভ্যতার গোড়ায় গিয়েচেন আর ভগবান্ স্বয়ং আশ্বাস দিয়েচেন

"মানুষের কোনো অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই। আমি ইন্দ্রিয়াতীত তাই জগতের কোনো কিছুই আমি দিতে পারি না—দিই না।" এখানে বলিষ্ঠতা এসেচে আঙ্গিক নির্বাচনে ও প্রয়োগে।

রাজনীতিক অবস্থা চিত্রণে নবেন্দু ঘোষ যে কৃতিত্ব দেখিয়েচেন তাতে শিল্প কৌশলই বড় কথা। বস্তুর চেয়ে আঙ্গিকই বড়ো হয়েচে। কাজেই বিষয় বস্তুর চমক এখানে কিছুটা বৈচিত্র্য আনলেও, উপায়নের দানও কম নয়। পুরনোর নবায়নে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, তা সত্যি প্রশংসার। নক্সাকাটার জেল্লার সঙ্গে যুক্ত হয়েচে মানসিক অবলোকন ও আদর্শের ঘূর্ণিঝড়। এরা সাম্প্রতিক ঘটনার রূপক হ'য়েই হয়েচে সাহিত্যের উপজীব্য। কিন্তু আঙ্গিকের চমক পদে পদে আনে বিস্ময়। এর পেছনে অবিশ্যি কাজ করেচেন বিদেশি সাহিত্যরথীরা। তাই সব মিলেজুলে নবেন্দু ঘোষ এক নতুন যুগের ইঙ্গিত বহন করচেন।

(৩) অন্যান্য

মনায়নে অনেকে এনেচেন যৌনজ বিষয়বস্তু আর ফ্রয়েডীয় আঙ্গিক। এরি বিস্তারে স্মরণীয় গৌতম সেনের 'প্রিয়া ও মানসী' [১৯৩১] যা নবেন্দু ঘোষের 'নায়ক ও লেখকের' স-গোত্র। এখানে জীবন ও মানসের, বাস্তব ও আদর্শের চিত্র পাশাপাশি ফুটেচে। লেখক সুশান্ত নিজের জীবনে পেয়েচে কমলা, বল্লী ও তৃপ্তি। পরে সুশান্ত'র অন্তর্ধানপটে আঁকা রইল তৃপ্তি। মানসে কিন্তু এরি প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেচে সুশান্ত'র প্রতিরূপ মীর্নাতে। মীর্নার জীবনে এসেচে অজিত, শশাঙ্ক, অরুণ। ধরবার চেষ্টায় জীবনহানি হয়েচে মীর্নার। অরুণ তাই ভাবচে। মনোবিকলনের সহায়তায় চাওয়া ও পাওয়ার স্বরূপ আবিষ্কার হয়েচে। এ-ধারায় এগিয়েচেন পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য। তাঁরি মারফতে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ রূপায়িত হয়েচে 'বিবস্ত্র মানবে' [১৯৪৫]। কাহিনী ব'য়ে চলেচে আদিত্যবাবু, তার মেয়ে তপতী ও পুত্র তপনকুমারকে নিয়ে। প্রেমের বিকাশে তাই তপতী পেলো মানবেন্দ্রকে। মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় তপতী ভালবেসেচে মানবেন্দ্র'র খণ্ডতাকে আর চন্দনা স্বকীয় অভিযানস্পৃহাকে। কাজেই মানবেন্দ্র স'রে পড়লো। এখানে আখ্যানপ্রবাহ ব'লে কিছু নেই, আছে কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ। এর কারণ অবিশ্যি বিশ্লেষণী প্রতিভা। তবু এক একটি চরিত্রের জেল্লা উল্লেখ যোগ্য। সভ্য মানুষমাত্র বিক্ষুভমনা, যে পারিপার্শ্বিক দ্বারা ক্রমশই পিষ্ট হচ্চে। তাই সে খোঁজে মুক্তির পথ। এখানে এসবই রূপায়িত হয়েচে। এরপর যৌনসম্পর্কের বিকাশ বিবৃত হয়েচে 'ময়ূরা নদীতে'। দিগম্বরী বোঝে না স্বামী গুরুচরণের অভি-লাষ, যে হেতু তার বয়স অল্প। যৌবন-উন্মেষ হয়েচে আস্তে আস্তে দিগম্বরীর

জীবনে। এরি বিবরণী এ-উপন্যাস। গুরুচরণের গানে ইছামতীর তীর রূপকে ঝলসে উঠেচে, সঙ্গে সঙ্গে তার মানসও নন্দনপুরে ভেঙে পড়েচে কামনায়—

বাবলা গাছে ঘু ঘু কাইন্দা মরে,
ওরে আমার গাঁয়ের মরা নদী চরে।
চৈত্তির মাসে আমার কাঁদন ঘুঘুর চক্ষে ঝরে—

এখানকার অবস্থা গুরুচরণের মনেরই। 'শাশ্বত যৌবনে' [১৯৪৫] আছে অনীতা-কল্যাণী-রমেনবাবু ত্রিভুজ। এতেও যৌনজ বাসনার বর্ণনা আছে। এ থেকে কিছুটা নিষ্ক্রমণ এসেচে 'দেহ ও দেহাতীতে' এবং 'পতঙ্গে'। শেষেরটি সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বুদ্ধ। আদর্শের বহ্নিশিখায় মানুষ যুগে যুগে পুড়ে মরেচে। আরেক দল হয়েচে সুবিধাবাদী, যারা অন্য আদর্শে ভাসমান। কিছুটা রাষ্ট্রিক ছাপও আছে এখানে। মানস অবলোকনের ব্যাপক প্রয়োগে পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য কিছুটা নতুনত্বের অধিকারী হয়েচেন।

এরপর প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'আগামী প্রতিচ্ছবি' এগিয়েচে যৌনসম্পর্কের লীলায়। নায়ক বাবলু কেবল প্রেম ক'রে যাচ্ছে, যেমন করেচে 'বেদে'র পঁচা। মিনতি, বন্দনা, সিন্ধু, দয়া প্রভৃতি একেকটি মেয়ে তার জীবনে ভিড় করেচে। আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি যে জাতক তার আবির্ভাব হ'লো বন্দনার গর্ভে। এই একটিই প্রেম, আর সব ধূমকেতু। গল্পায়নে সজনীকান্ত'র 'অজয়ের' ছায়া ও পড়েচে মাতৃত্বের যৌথ দাবীতে। এখানে লেখক বে-আব্রু করেচেন জীবনের রূপ। পশুপতি ভট্টাচার্যের 'অবশ্যম্ভাবী' ও উল্লেখ যোগ্য এ-প্রসঙ্গে। মানুষী জীবনে শূন্যতা নেই। এক আশ্রয় ছিঁড়ে গেলে আসে অন্যটি। তাইতো রাসবিহারী ভাগ্নে বলাইয়ের মৃত্যুতে সন্ন্যাসী হ'লেও আবার ফিরে এসেচে মাটির ঘরে। সে আবার সংসারের চৌম্বক আকর্ষণে গড়ে তুললো দাতব্য চিকিৎসালয়। সংসারের এ হ'লো অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এরপর 'মুক্ত ধারায়' অনুসৃত হয়েচে 'ঘরেবাইরে'র আঙ্গিক। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে নায়ক অমরনাথ ও নায়িকা মীরা আত্মকথা বলে যাচ্ছে। এ যেন চলচ্চিত্রের খেলা। অমরনাথ তার স্ত্রীকে আর মীরা তার স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি। এরা পরে প্রেমে পড়েচে। শেষে কিন্তু অমরনাথ নিল মর্ত হ'তে বিদায়, আর পড়ে রইল মীরা। করুণ রসের ভিয়ান তাই এসেচে অনিবার্য ভাবেই। এ-সব রচনা উপাদান ও উপায়নের নতুনত্বের জন্যে উল্লেখযোগ্য, যদিও রসাভাস আছে অনেক জায়গায়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন ঘোষালের 'রক্তনদীর ধারা' স্মরণীয়। Dr. Jekyll ও Mr. Hyde এর লীলায় ফুটেচে ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ। 'দুই পক্ষ' এই দ্বিধা খণ্ডনের অন্তরূপ। বিশ্লেষণী প্রতিভাই এখানে চোখে পড়ে।

(ii) রাজ স্তম্ভ

বিয়াল্লিশোত্তর যুগে রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে। বিশ্বগ চিন্তার সঙ্গে এর আছে সমতা। গোটা জাতি জেগে উঠেচে আত্ম-সচেতনতায়। ব্রিটিশ

শাসনে জাতির সত্তায় এলো চিড়; নিষ্পেষণে ছিবড়ে হ'য়ে ভেঙে পড়লো আদর্শের ভিৎ; শোষণে শুকিয়ে গেল বাঙালীর তথা ভারতবাসীর প্রাণপ্রেরণা। তাই বাঙালী লিখিয়ে রূপায়িত করেছেন আগস্ট আন্দোলন [১৯৪২], যার মারফতে বিদ্রোহ এসে নাড়া দিয়েচে গোটা দেশটাকে। এই যে উপাদানের আবির্ভাব এতে বিষয় বস্তুর ক্ষেত্র হ'লো বিস্তারিত। আর এ এলো কৌটিল্যায়নে, যা রাজনীতি চর্চার নামান্তর। এতে তাই মেলে নতুনত্বের সন্ধান।

(১) মনোজ বসু (১৯০১—)

পল্লীকেন্দ্রিক আবর্তনে যিনি এগিয়েচেন তিনি হ'লেন মনোজ বসু। প্রাকৃতিকতা পেরিয়ে তিনি এসেচেন মানুষী স্তরে। এদিক থেকে তিনি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-ধর্মী। কিন্তু মানুষী স্তরে পেয়েচেন দুটো জিনিষ—এক, প্রেমবিলাস; দুই, রাজনীতিচর্চা। বস্তুতঃ এ দুয়েয় চিত্রণে তাঁর উপন্যাস স্মরণীয়। রাজনীতিই প্রেমের উপরে স্থান পেয়েচে। গোটা দেশের রাষ্ট্র কাঠামো যেভাবে মানুষকে জাঁতা কলে পিষচে, তাতে ব্যথিত হয়েচে তাঁর মন। দুঃখ দুর্দশার শেষে যে শান্তি আসবে এই আশাতে তিনি আস্থাবান। এ রকম বলিষ্ঠ আশাবাদ আছে লেখকের বিপ্লবের মূলে। পরাধীন দেশে সাহিত্য সাধনা যে কত কঠিন সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। যে আত্ম-ব্যাপ্তি তিনি চান লেখার মারফতে, তা এখানে স্বভাবতই সীমায়িত। বাইরের ঘটনায় তিনি বিচলিত হন আর জানাতে চান তার প্রতিবাদ। রচনা তাঁর কাছে তাই ব'য়ে আনে উদ্দেশ্য। তিনি বলেচেন—"অবিচার দেখে বিচলিত হ'য়ে উঠি; প্রতিবাদ জানাতে চাই। যোদ্ধা হলে মেসিন গান নিয়ে ছুটতাম, চাষী মজুর হলে ঘরে এসে বউ ঠেঙাতাম, শিশু হ'লে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম।" এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কলম ধরেচেন। তাঁর এ-উপলব্ধি চারিয়ে-যাওয়ার জন্যে চাই পাঠকের গ্রহণ শক্তি। তাই মনোজের সাহিত্যায়ন ধরা পড়েচে দুটি বিশেষ স্তরে। প্রেম বিলাসের পরিচায়ক হ'লো 'ওগো বধূ সুন্দরী' [১৯৪৬] ও 'শত্রুপক্ষের মেয়ে'। কৌটিল্যায়ন দেখা যায় 'ভুলি নাই' [১৯৪৩], 'সৈনিক' [১৯৪৫], 'আগষ্ট ১৯৪২' [১৯৪৭] ও 'পৃথিবী কাদের' এ।

প্রথম পর্যায়ের 'ওগো বধূ সুন্দরী' কথ্য ভাষায় ব'য়ে চলেচে গেঁয়ো পরিবেশে। বসন্ত বিয়ে করতে চায় না শোভাকে, যদিও আগে এজন্যে কথা দেয়া হয়েচে। এর জন্যে দায়ী অবিশ্যি দু'জনের মনানৈক্য। তার পর সে বিয়ে করলো লক্ষ্মীকে, যেহেতু সে সুন্দরী, "এ জল ঢালে, ডাব ছুঁড়ে মারে না।" সৌন্দর্যের আদর্শই এখানে রূপায়িত হয়েচে। এখানে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এর পর আছে 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' যা চিতলমারীর খাল নিয়ে আরম্ভ হয়েচে। এখানে ঘটনায় একটু জটিলতা এসেচে। নরহরির পুত্রের সঙ্গে সৌদামিনীর মেয়ের বিয়ে হ'লো না। পরে সৌদামিনীর

ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লো নরহরির মেয়ের। এ সবের মাঝখানে অবিশ্যি মামলা চলেচে বৌভাসির চর নিয়ে। বর্ণনা সবই গ্রামীন পরিবেশে ফুটে উঠেচে। অতি সাধারণ ঘটনার সমাবেশ হয়েচে এখানে। কৌটিল্যায়নের পরিচিতি বহন করচে 'ভুলি নাই।' এ হ'লো রাজনীতিক উপন্যাস। কাহিনীর কাল ১৯০৫—১৯, ১৯২১ ও ১৯৩৬। স্মৃতির সুড়ঙ্গ পথে এসেচে গল্পায়ন। শঙ্করই কথক,যে বিপ্লবীদের এঁকেচে স্মৃতি-তুলিতে। একে একে মানসপটে ভেসে উঠেচে কুন্তল দা, বাণী, আনন্দকিশোর, নিরুপমা, সোমনাথ, মায়া, মল্লিকা। ঘটনার বাস্তবতা এসেচে খুলনা জিলার ভৈরব নদী ও খালিসপুর মারফতে। আনন্দকিশোর ও সোমনাথের কাহিনী বেশি জীবন্ত। অবিশ্যি কুন্তল দার স্মৃতিতে ভরপুর হয়েচে গল্পায়ন। নকসা হিসেবে চরিত্রগুলি যেমন উপভোগ্য, উপন্যাস হিসেবে তেমন নয়। গল্পায়নের চেয়ে চরিত্রায়ণই এখানে ফুটেচে বেশি।

'ভুলি নাই'য়ের স্মৃতিতে উঠেচে 'সৈনিকে'র ইমারত। কংগ্রেস-কর্মী পান্নালালের কাহিনী এখানে হয়েছে বর্ণিত। তার কারাবাস, ইস্কুল-পরিচালনা, পীড়িতদের সাহস দান প্রভৃতি কাজ দিয়েচে তাকে নায়কের মর্যাদা। দুর্ভিক্ষ, লঙ্গরখানা, উমা-সুপ্রিয়ার কাজকর্ম এসেচে ঘটনা প্রবাহে। আলাদা অলাদা ভাবে এরা উল্লেখযোগ্য। সবটা মিলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। উপাদান আছে অনেক, কিন্তু সংহতি বা শৈল্পিক সুষমা নেই। 'ভুলি নাই' শেষ হয়েচে এই আশায় যে দেশে "শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে।" এখানেও আছে সেই আশার ঝিলিক: "বাঁকা মেরুদণ্ড আবার খাড়া হয়ে উঠবে খাদ্য পেলে—সে খাদ্য স্বাধীনতা।" সৈনিকরা তাইতো বেরিয়েচে দলে দলে, তাদের "মাথায় নির্যাতনের শিলাবৃষ্টি, পিছনে টলমল অশ্রুসমুদ্র।" উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা তেমন ফুটে ওঠেনি। কাহিনীর পূর্ব ও উত্তর ভাগের সুমিতি সূত্রের অভাবই ধরা পড়ে। বিচারালয়ের বর্ণনায় লেখক একটু অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমন হাকিমের সঙ্গে আসামীর সংলাপে। তবে পল্লীর সৌন্দর্য রূপায়ণে কবিত্ব আছে, যা ফুটেচে বউডুবির বিলকে কেন্দ্র করে। 'আগষ্ট ১৯৪২'এ আছে তিনটি পর্ব। 'আদি কথায়' বর্ণিত হয়েচে চন্দ্রার জীবনযাত্রা। চন্দ্রার স্বামী শিশির মহকুমা হাকিম। 'সংগ্রামে' চন্দ্রা শিশিরকে বলেচে চাকরি ছাড়তে। এখানে জড়ো হয়েচে মহীন, যূথী, প্রভৃতি। 'উত্তর কথায়' যূথী বিয়ে করেচে মহীনকে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ভারতের বুকে যে প্রলয়ঙ্করী ঢেউ তুলেছিল এখানে আছে তারি রূপায়ণ। উপন্যাসের উপাদান থাকলেও, নেই উপায়নের ঐক্য। এরপর 'পৃথিবী কাদের' ঘোষণা করেচে বিপ্লব, যাতে সমীকরণের সুরও ধ্বনিত হয়েচে।

মনোজ অতিমাত্রায় আশাবাদী। আধুনিক মরুতে তাই তিনি তৈরি করেচেন তাঁর মরূদ্যান, যেখানে আহূত হয়েচে নির্যাতিত, নিষ্পিষ্ট জনসাধারণ। তাঁর বিদ্রোহী মেজাজে কথনেচ্ছা প্রবল, কিন্তু প্রকাশনদক্ষতা একটু কম। তাঁর বিপ্লবী মনের আশা এই যে "কলঙ্ক লিপ্ত কলম ভাবীপ্রভাতে নূতন সূর্যের আলোয় ঝলকিত

হ'য়ে উঠবে।" তাই আশার ঝণকই বড়ো এখানে। বাস্তব মনন ও অনুভূতির রঙে যে পর্যন্ত না সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠচে, সে-পর্যন্ত এ শুধু কংকাল। এতে প্রাণ-সঞ্চারে লেখক তেমন কৃতকার্যতা দেখাতে পারেন নি। তবুও বলিষ্ঠ আশাবাদের মূল্য ও কম নয় সামাজিক দিক থেকে। তাই যে পরিমাণে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সজাগ সে পরিমাণে শিল্প-সচেতন নন।

(২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮—)

'দেশে' সাহিত্য সাধনা সুরু ক'রে 'বিচিত্রার' ভেতর দিয়ে যিনি পৌঁছুলেন 'শনিবারের চিঠিতে', তিনি হ'লেন নারায়ণ ওরফে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাব্যের রঙিন জমি থেকে হয়েচে তাঁর গল্পের বিচিত্র ভূমিতে অবতরণ। সমাজচিত্রণে তাই দুটো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে—এক, সমাজতন্ত্র; দুই, রাষ্ট্রতন্ত্র। বস্তুত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ধারায় এগিয়েচে তাঁর সাহিত্যায়ন। একটা বিপ্লব আসবে যাতে বিদূরিত হবে দুঃখদুর্দশার অন্ধকার। কাজেই তিনি এনেচেন এ অন্ধকারে বাণীদূত। অন্ধকারের পরে দেখা দেবে সূর্যসারথি। কাজেই যা-কিছু অভাব-অভিযোগ সবি ক্ষণস্থায়ী। আশাতেই তিনি আস্থাবান। এখানে তিনি মনোজ বসুর সহধর্মী। তবে মনোজের যেখানে উড়চে শুধু বিশ্বাসের ধ্বজা, সেখানে নারায়ণ এনেচেন কাব্যিক রসায়নও। অনুভূতির দ্রাবকশক্তি এখানে খুব কার্যকরী হয়েচে। ফলে যেসব উদ্দেশ্য বাণীবাগীশের পরিচয় দেয়, তাকে তিনি করেচেন রসোত্তীর্ণ! এ-কাজ দুরূহ। তাই মনায়নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তিনি যান নি। সাদা চোখে জিনিষ দেখে, তাকে রূপায়িত করেচেন যৌক্তিক ব্যাখ্যায়। কার্যকারণ সূত্রেই এগিয়েচে গল্পায়ন। কাজেই নারায়ণের মানস-বিবর্তনে দুটো ধারার পরিচয় মেলে। সামাজিক স্তরে আছে 'উপনিবেশ' [১৯৪৩], 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' [১৯৪৫] ও 'স্বর্ণসীতা' [১৯৪৬] আর রাজনীতিক স্তরে 'তিমির তীর্থ' [১৯৪৩], 'মন্ত্রমুখর' [১৯৪৫], 'সূর্যসারথি' [১৯৪৬] ও 'শিলালিপি' [১৯৪৯]।

সমাজে যে চিড় এসেচে তা সভ্যতারই ফাটল। ছেলেবেলাকার রঙিন কল্পনা জলে উঠেচে "আত্রাইয়ের নীল ধারায়" ও "কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জে।" বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এরও হয়েচে রূপান্তর। তাই সুদূরের ইশারা এসেচে 'উপনিবেশে'। এখানে আছে তিনটি পর্ব। তেঁতুলিয়ার মুখে অবস্থিত চরইসমাইল ভাঙাগড়ায় এগিয়ে চলেচে। এখানে আছে যে সামুদ্রিক উল্লাস "সমুদ্রের ঔরসে প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম।" এখানে প্রেমেন্দ্র'র 'নীলকণ্ঠ' কবিতার হয়েচে রূপান্তর কথা সাহিত্যে। 'মৃত্তিকা' জেগেচে আর 'ফসল' ফলচে। এখানে আছে যে আদিমতা তা চরে চারিয়ে গেচে ডি-সুজা, লিসি, জোহান, গঞ্জালেস, হরিদাস, বলরাম ভিষকরত্ন প্রভৃতির সহায়তায়। অন্যভাবে বলা চলে এরা আদিমতারই শ্রেষ্ঠ ফসল। মণিমোহন তাই মা-ফুনের সঙ্গে

প্রেম করচে, যদিও তাঁর স্ত্রী বর্তমান। জোহান পালিয়েচে লিসিকে নিয়ে। বলরাম করেচে মুক্তাকে গর্ভবতী। দ্বিতীয় পর্বে এ-সব চরিত্র প্রাণবান হয়েচে 'বিভ্রান্ত বসন্ত' ও 'চৈতালিতে'। তাই প্রশ্ন মাথা খাড়া করেচে—"মানুষ কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে? ইতিহাস মানুষকে রচনা করেনা কোনোদিন?" তৃতীয় পর্বে 'সূর্যস্বপ্ন' জেগেচে দশ বছর পরে। মণিমোহন সার্কেল অফিসার হয়েচে। যেহেতু সে সইতে পারেনা মা-ফুনকে, তাই সে পালিয়ে গেচে ভয়ে, যেমন করেচে বলরাম। সভ্য মানুষেরা সহ্য করতে পারবে না উপনিবেশের এই দুরন্ত উল্লাস। এ গা-সওয়া হয়েচে শুধু পর্তুগীজ ও দেশজ মানুষের কাছে। যুগে যুগে চর ইসমাইলের নতুন নতুন রূপ। আর এ থেকে "মণিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামেরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করতে পারে না।" কিন্তু এতে কোনো ক্ষতি নেই, যেহেতু "বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি" আসবে এখান হ'তে। আর এতেই সুস্থ হবে কৃমিকীটের সভ্যতা। 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' হ'লো সামাজিক রূপান্তরের দ্যোতক। লেখকের মতে এ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সভ্যতার বিকাশে সামন্ততন্ত্র জন্ম দেয় বণিক সভ্যতা, যা কালক্রমে স্থান করে দেবে গণশক্তির। এই বিবর্তনের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সামন্ত বিশ্বনাথ, বণিক লালাজী ও গণশক্তিধর অপর্ণা। কাহিনীর পটভূমি হ'লো কুমারদহ ও নবীপুর, যার নায়ক যথাক্রমে বিশ্বনাথ ও লালা হরি শরণ। সোনাদীঘির মেলা উপলক্ষ্য ক'রে সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর বিবাদ সুরু হয়েচে। এ বিবাদের মূলে লুকিয়ে আছে ইতিহাস-বীজ, যা কালান্তরে মহীরুহে বিস্তার লাভ করেচে। 'স্বর্ণসীতার' আর্থিক পটে ফুটে উঠেচে প্রেমের চেহারা। অনুপমা হ'লো স্বর্ণসীতা, যার বিয়ে হয়েচে সোমনাথের সঙ্গে। সে কিন্তু ভালবাসে অরুণকে। অরুণ অনুপমার কথা না শোনায়, অনুপমা সহায়তা করেচে অরুণের ঘরে আগুন জ্বালানোয়। এতে প্রমীলাও পুড়ে মরেচে। ফলে মহানন্দার জলে অনুপমার আত্ম-বিসর্জন হয়েচে অবশ্যম্ভাবী। মনস্তাত্ত্বিক আলোচনারও ইঙ্গিত আছে এখানে। এ হ'লো অর্থ ও প্রেমের দ্বৈতরূপ। সমাজ ভাঙন এখানে পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় স্তরে রাজনীতি এসেচে, যা মিশেচে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'তিমিরতীর্থে'। এর আছে তিন ভাগ। প্রথম ভাগের 'চক্রবালে' আড়িয়াল খাঁ দেখা দিয়েচে "ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, কুৎসা এবং কলঙ্কে"র প্রতীক হিসেবে। এর কারণ, কলকাতা তার রাক্ষস বাহু বাড়িয়ে টেনে নিয়েছে "অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, মস্তিষ্ক।" 'অরণ্য' ভাগে প্রফুল্ল মাস্টার চেষ্টা করচে স্বদেশিয়ানার ঢেউ তুলতে, কিন্তু পারেনি। সে ভাবচে—"জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী।" 'তিমির তীর্থে' দেখা যাচ্চে গণশক্তির আধার, নমঃশূদ্র ও বেবাজিয়া [বেদে] প্রভৃতির ভেতর, যদিও এখন তারা মদের নেশায় টলমল। এ শক্তির যে স্ফূরণ হবে তার ইঙ্গিত বহন করচে প্রফুল্ল-নীলিমা, তপন-শুক্লা প্রভৃতি। এর পর 'মন্ত্রমুখর' যা স্মরণ করিয়ে দেয় মনোজ বসুর 'আগষ্ট ১৯৪২'। 'ভাভার-মারীর' ভয়ালতা নিশ্চিন্তপুরে চিন্তা এনেচে। কাহিনী আবর্তিত হয়েচে বিনোদ বাবু

হাকিমকে কেন্দ্র ক'রে। সংগ্রামের রক্তাক্ত স্বাক্ষর রয়ে গেল এখানে। তাই মনে হয়েচে "আকাশ যেন লালচাঁদ মণ্ডলের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে লাল।" এর প্রকৃত খবর একমাত্র ভবিষ্যৎই উদ্ধার করতে পারে। লেখকের ইঙ্গিত তাই বলিষ্ঠ: "জ্বলে-যাওয়া গ্রাম আর মরা মানুষের ভাঙা পাঁজরে যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রইল তা উদ্ধার করবে অনাগত কালের প্রত্নতাত্ত্বিক, স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক।" "সূর্যসারথি" বিপ্লবোত্তর আশার প্রতীক। বোমার হিড়িকে সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্চে। তাই নীচতার নাচ চলেছে কলকাতায় ও ডুয়ার্সের চা-বাগানে। যুদ্ধের আওতায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেচে লক্ষ লক্ষ স্বার্থপরতা—"দেবতার বেদী বলির রক্তে লিখা। লোভী পুরোহিত জাগিছে বিশ্বময়।" যেহেতু এচরম সত্য নয়, তাই জেগেচে শূদ্রশক্তি ডুয়ার্সের চা-বাগানে আর রবার্টের রক্তে লাল হয়েচে কালীঝোরা খাদের কালো জল। আদিত্য'র স্বপ্ন তাই রূপায়িত হয়েচে: "কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণশিখর থেকে সাগরপ্রান্তের কলকাতা পর্যন্ত সূর্যসারথির রথচক্রে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে।" এরপর "শিলালিপিতে" রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের আত্মকথা ফুটেচে। স্মৃতিরোমন্থনে ভেসে আসচে পদ্মাক্যাম্পের অন্তহীন অবস্থা। রঞ্জনের জীবনে আবর্তিত হয়েচে কালের রথচক্র, যা গুঁড়িয়ে দিয়েচে কতনা স্বপ্ন, কতনা রঙিন আশা, কতনা কল্পনার পক্ষ বিস্তার। লেখক ও নায়ক এখানে এক। ইস্কুল-পালানো বাউলের ছবি জাগচে। কল্পনা থেকে জীবনে অবতরণ করচে রঞ্জন। তার কানে বাজচে বৈরাগীর সুর—

> একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
> অভয় রামের দ্বীপান্তর মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
> জনম নেব মাসীর ঘরে মাগো,
> চিনতে যদি না পারো মা, দেখবে গলায় ফাঁসি।

একে একে স্মরণে আসচে চট্টগ্রামের কাহিনী, রাজনীতিক ডাকাতি, তরুণ সমিতি প্রভৃতি। সীতা রঞ্জনের মন রাঙিয়েছিল। আলীপুরের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে রঞ্জন দেখচে "আগুনের পথে মিতা তাকে ডাক দিয়েছে। তার হাতে অনির্বাণ বিপ্লবের রক্ত মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলচে।সত্যের স্বাক্ষর—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রের শিলালিপি।"

নারায়ণের বৈশিষ্ট্য হ'লো বাস্তব চেতনা, যা ভেঙে পড়েচে কাব্যায়নে। চরিত্র চিত্রলতার চেয়ে ভাবপ্রবাহই বেশি চোখে পড়ে। কথায় ভাবের অতি অল্পই প্রকাশ পায়। কিন্তু যেটুকু এসেচে প্রকাশনে, তার দামও কম নয়। বিশ্বকে তিনি ভালোবেসেচেন সুখেদুঃখে, যেহেতু "এ ভালবাসাই সত্য এ জন্মের দান।" এতে পরিহাস স্বভাবতই অনুপস্থিত। মানুষের শাশ্বত সত্য উদ্‌ঘাটনে যে মনোনিবেশের দরকার এখানে আছে তাই। তবে এ এসেচে অনুভূতির সুড়ঙ্গ পথেই। শৈল্পিক সুষমা তাই এসেচে অনিবার্য ভাবেই। আর এখানেই মেলে তাঁর কবি মনের পরিচয়।

(৩) সুবোধ ঘোষ (১৯০১—)

ছোট গল্পের দক্ষতা নিয়ে সুবোধ ঘোষ হাত দিয়েছেন উপন্যাসে। সমাজের পটে আঁকা হয়েছে তাঁর সাহিত্যসাধনা। সমাজ বদলালে, লেখাও বদলায়। ঘটনার জাল তেমন বিস্তার লাভ করেনি। সমসাময়িকতার বুনো হাওয়া জুগিয়েছে এর উপাদান। তাই শিল্প যে সমাজ-নির্ভর, এখানে আছে তারি পরিচয়। সমাজতন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে মনস্তত্ত্বও এসে হাজির হয়েছে, তবে গৌণভাবে। গল্পায়ন বয়ে চলেছে মতবাদের অনুপ্রাসে। বাংলা সাহিত্যে দুটো ধারায় সাক্ষাৎ মেলে। একটি হ'লো প্রেমপ্রবাহ, অন্যটি রাজনীতিচর্যা। এতকাল প্রথমটিই সর্বজয়ী ছিলো। কালায়নে দ্বিতীয়টির হচ্ছে ব্যাপক প্রয়োগ। এ দুয়ের সমন্বয়ে মনোজ যেখানে দেখিয়েছেন উগ্রতা, ও নারায়ণ কাব্যিক অনুভূতি, সেখানে সুবোধ অনুসরণ করেছেন মাঝপথ। অর্থাৎ তাঁর একদিকে যেমন উগ্রতার আছে নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে তেমনি অনুভূতির অনুশীলনও। ফলে গোটাটা ঘিরে রয়েছে মনন। এরি চেহারায় ফুটেছে কখনো প্রেমবৃত্ত যেমন 'শতভিষা' [১৯৪৩] ও 'কল্পলতিকা' [১৯৪১], কখনো বা রাজবৃত্ত যেমন 'তিলাঞ্জলি' [১৯৪৪] ও একটি 'নমস্কারে' [১৯৪৭]। মাঝখানে অবিশ্যি পড়ে 'গঙ্গোত্রী' ও 'ত্রিযামা'। এদের নামেই আছে উপাদানের পরিচয়। প্রথমে ভাবের উৎস মুখই খুলে গেছে আর দ্বিতীয়ে প্রকাশ পেয়েছে কালায়নের তিনটি পর্ব।

রূপকথার মারফতে 'শতভিষা'য় এসেছে আদর্শ সংসারের চিত্র। রাজপাট পুরগাঁয়ে পুঁটি মাসিমা গল্প বলছে আর সেখানে জড়ো হয়েছে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। রজনী ও প্রমীলার ৪টি সন্তান—অমিয় ও যতী দুই পুত্র আর মঞ্জু ও মীনু দুই মেয়ে। অমিয় বিয়ে করেছে শুভাকে; যতী মাষ্টারের বৌকে; মঞ্জু নীহারকে আর মীনু সাধনকে। আদর্শের ঐক্যে এসেছে এ-মিলন। বাপ মা এতে সায় দিতে পারেনি বলে প্রমীলা আশ্রয় নিয়েছে ঠাকুরঘর। কিন্তু অমিয়-শুভার জাতকের মাধ্যমে পিতা-পুত্রের মিলন হয়েছে সার্থক। পরিবারের ছেলেমেয়ে নক্ষত্রের মতই দীপ্তিমান আদর্শ বিস্তারে। পুরনো-নতুনের আমদানিতে ফুটেছে আদর্শ সংঘাত। এই আদর্শের আরেক রূপ দেখা যায় 'কল্পলতিকায়', সেখানে বিদেশিয়ানা ও স্বদেশিয়ানার সংঘাতই বড়ো হয়েছে। রেণু দিবাকরকে বিয়ে করে, থাকে জাগরণী ক্লাবের বন্ধুদের নিয়ে। দিবাকর এদিকে গর্ভবতী করেছে শিবানীকে। পরে মালিনীর বিয়ে হয়েছে অশোকের সঙ্গে। 'শতভিষা'য় যেমন দ্বন্দ্ব আছে নতুন পুরাতনের, এখানে তেমনি স্বদেশি-বিদেশির। বিদেশি আদর্শ যে দেশের পক্ষে অশুভ তাই বলেছেন শিবেনবাবু: "বিদেশির সঙ্গে বহুকাল বাস করেও তাদের সদ্‌গুণ আমরা কিছু পাইনি। পাশ্চাত্যের আবর্জনা এসে জমেছে আমাদের দেশে, আমরা মূর্খের মত তাই গ্রহণ করেছি সাগ্রহে।" এ তেমন ফোটেনি। চরিত্রায়নও খোলেনি।

প্রেমভিত্তির উপর উঠেছে রাজনীতির আদর্শ, যার পরিচায়ক হ'লো 'তিলাঞ্জলি'। মতবাদ ও দুর্ভিক্ষ রচনা করেছে এর ভূমিকা। কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসের সংঘাত

রূপায়িত হয়েছে শিশির-সীতার আকর্ষণকে কেন্দ্র ক'রে। লেখকের পক্ষপাতিত্ব কিন্তু কংগ্রেসের দিকে। তাই জাগৃতি সংঘের নেতাদের প্রতি তিনি ছুড়েছেন বিদ্রূপ-বাণ। ফলে প্রকাশ, ইন্দ্রনাথ ও জয়ন্ত চিত্রিত হয়েছে ষড়যন্ত্রীরূপে। এরাই ধরিয়ে দিয়েছে কংগ্রেসকর্মী অবনী বাবুকে। এরপর দুর্ভিক্ষে তিনি দেখেছেন ধ্বংসের পূর্বাভাস। এরি পটে আঁকা হয়েছে বিপিন, টুণার মা, টুনা ও পুনি কেউটানি। এ স্মরণে আনে দান্তের নরক দৃশ্য। সীতার মানসিক দ্বন্দ্ব বেশ ফুটেছে। এক একটি ঘটনার আবর্তনে গল্পের গতি হুঁচোট খেয়েছে। ভাষার ধারাল রূপ উল্লেখযোগ্য হ'লেও, চরিত্রায়ণ তেমন নয়। এরপর 'একটি নমস্কারে' ফিরে এসেছে রাজবৃত্তে। সরকারী অভিযান জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করেছে। তাই সোমার প্রণয়ী প্রবীর ধরা পড়লো দারোগার কাছে। সোমা-প্রবীরের মিলনে এলো কারার প্রাচীর। তাই তো সোমা একটি নমস্কারেই জানিয়ে দিলো তার "অনুরাগে গড়া মূর্তিটিকে; কাব্যতীর্থের মন্ত্রকে, সাতটি প্রদীপের আলোককে।" এতে অনিবার্যভাবেই এসেছে শোকান্তিকা।

সমাজ ভাঙনে মনোরাজ্যে বইছে যে আদর্শ সংঘাত, সুবোধ ঘোষে আছে তারি রূপায়ণ। চিন্তার ঘূর্ণিপাকে ঘুলিয়ে উঠছে এর কর্দমও। ফলে সমসাময়িক বুনো হাওয়া এসে দোলা দিয়েছে লোককে। এ যে পরিমাণে উপস্থিত তাঁর উপন্যাসে, সে-পরিমাণে রসোত্তীর্ণ হয়নি। শিল্পায়িত হতে পারেনি অনেক ভাব। কেমন যেন শীর্ণ চেহারা চোখে পড়ে একটি কাহিনীর। বলিষ্ঠ কোন চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। তাই গল্পায়ন যেমন হুচোট খেয়েছে ঘটনার বিচ্ছেদে, তেমনি চরিত্রায়ণও অভিব্যক্তির অভাবে। তারপর উপায়ন কৌশলও তেমন কোন নতুনত্বের দাবী করতে পারে না। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে তিনি যতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধিতে ততটা সাফল্য নেই। তবুও যুগ পরিচায়ক হিসেবে স্মরণীয় হ'য়ে রইল তাঁর কথকালি।

(৪) সতীনাথ ভাদুড়ী

রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার পেয়ে যিনি কথাসাহিত্যে ব্যাপক পরিচিতির অধিকারী হয়েছেন, তিনি হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। রাজনীতিক পটভূমিকায়, বিশেষ করে বিয়াল্লিশের পটে তিনি যে ছবি এঁকেছেন আত্মোৎসর্গের, তা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি অভিনব। তাঁর 'জাগরী' [১৯৪৮], আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে লেখা। এর সগোত্রীয় হ'লো রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'। এর স্থান হ'লো ফাঁসি সেল আর সময় রাত্রি। বিলু, নীলু ও তার মাবাপ এই চার জনের আত্মকথায় ব'য়ে চলেছে গল্পায়ন। লেখক ভূমিকায় বলেছেন: "রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।" পূর্ণিয়ার জেলে আছে, বিলু, তার বাপ, মা ও ভাই নীলু। চার জনের চারটি দৃশ্য চলচ্চিত্রের

আঙ্গিকে ফুটে উঠেচে। প্রথমেই 'ফাঁসি সেলে' দেখা যায় বিলুকে। সে স্মৃতিসূত্রে মালা গেঁথেচে তেত্রিশ বছরের। স্মরণে এসেচে ১৯৩২ ও ১৯৪২এর কথা। অতীতের কাহিনী যখন তাকে অভিভূত করেচে স্মৃতির ব্যথায়, তখনি বর্তমান এসে তাকে চেতিয়ে তুলেচে। ওয়ার্ডারদের যাতায়াত, এরোপ্লেনের শব্দ ও ট্রেন-স্টীমারের বাঁশি মারফতেই এসেচে বর্তমান। হাক্স্‌লির Brave new worldএর Savageএর কথা মনে আসচে আর নিজের ফাঁসির ভয়ালতাই করাল বদন ব্যাদান করেচে। মৃতদেহ যেভাবে ঘুরপাক খায় তাতে দেখা যায় দোলার গতি, "উত্তর, উত্তরপূর্ব, পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ, দক্ষিণপশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্বদক্ষিণ, পূর্ব, উত্তরপূর্ব, উত্তর।" দ্বিতীয় দৃশ্য হ'লো 'আপার ডিভিশন ওয়ার্ড' সেখানে আছে বিলুর বাবা। বাবা ভাবচে তার উচিত ছিল বিলুকে নিষেধ করা। জেলে তিন শ্রেণীর রাজবন্দী আছে—যোগাড়ানন্দ, ঝপট্যানন্দ ও বেকুফানন্দ। মাঝে মাঝে কানে আসচে "রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।" তৃতীয় দৃশ্যের 'আওরৎ কিতায়' আছে বিলুর মা। সে ভাবচে বিলুকে বিয়ে দিলে হয় তো বা তার এ অবস্থা হতো না। মার মাথায় অডি কোলোন দেয়া হচ্চে। ৪র্থ দৃশ্য হ'লো 'জেল গেট' সেখানে আছে ভাই নিলু। সে ভাবচে বিলুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া তার ঠিক হয়নি। ১৯২২ ও ১৯৪০ সাল প্রভৃতি ভিড় করেচে তার মনে। ফাঁসির উদ্বেগে সে হয়েচে অতিমাত্রায় ম্রিয়মাণ। এমন সময় ডাক্তার অঘোর জানিয়ে দিলো বিলুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত হয়েচে। এ এক 'চিত্রোপন্যাস', যাতে স্থানিক রঙ দেখা দিয়েচে হিন্দী শব্দের প্রয়োগে। মনোজ ফুটিয়েচেন বিয়াল্লিশের বিপ্লব তাঁর 'আগষ্ট, ১৯৪২'এ ও নারায়ণ 'মন্ত্রমুখরে', আর এখানে সতীনাথ।' সব চেয়ে চিত্রল হয়েচে 'জাগরী'। আঙ্গিকের নতুনত্বই চোখে পড়ে।

এর পর লেখক এগিয়েচেন গণসাহিত্যে। তাঁর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯, ৫১) এদিকে উল্লেখযোগ্য। এর আদর্শ তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'। বস্তুত আদিম জাতির পরিচয়ে এসেচে অধ্যাত্মায়ন, যার কেন্দ্রক হ'লো ঢোঁড়াই। তুলসীদাসে যেমন রাম এখানে তেমনি ঢোঁড়াই। একে ঘিরে গল্পায়ন এগিয়েচে। মাঝে মাঝে এদের উপভাষা এনেচে স্থানিক রঙ, যাতে রাঙিয়ে গেচে গাল্পিকতা। কাজেই সতীনাথ রাষ্ট্র ও গণের দুটো ধারায় এগিয়েচেন। তাঁর বিবর্তনে আছে একটার পর আরেকটার অগ্রগতি। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এখানে যতটা প্রসংশার্হ শিল্পায়ন ততটা নয়। তবুও এ 'ভাব' বিন্যাসে আসনের অধিকারী। আঙ্গিকের দিক থেকে উল্লেখ্য "চিত্রগুপ্তের ফাইল" [১৯৫৯] শিউচন্দ্রিকার স্মৃতি রোমন্থনে ঘটনাপ্রবাহ চলেচে। এরপরে আছে কৌশলী সমাপ্তি যাতে চিত্রগুপ্ত হয়েচে "বাণী প্রতিষ্ঠানে" রূপান্তরিত। এ অভিনব বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান।

(৫) অন্যান্য

হেমেন গুপ্তের '৪২ [১৯৪৯] কথ্য ভাষায় লেখা। এর বিষয়বস্তু হ'লো বিয়াল্লিশের ঘটনাবর্ত। ছায়া ছবিরই এ উপন্যাসরূপ। অজয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মারা গেল আর তার স্ত্রী পাগল হ'লো। একটি পরিবার কেমন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে এলো এখানে আছে তারি পরিচয়। ঠাকুরমার চিত্রণে পড়েচে মাতঙ্গিনী হাজরার ছায়া। কি গল্পায়ন, কি চরিত্রায়ণ এর কোনোটাই তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। এর পর দাঙ্গার ছবি হিসেবে প্রবোধ সরকারের 'ছায়াপথ' [১৯৪৭] উল্লেখযোগ্য। প্রেমের নিষ্ঠায় জরিফ ও শ্যামলীর মিলন সূচিত হয়েচে। এ-রাজ্যে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু বাস্তব জগৎ সীমায়িত, তাই এদের স্থান হ'লোনা এখানে। নায়ক-নায়িকার তাই অন্যত্র যেতে হ'লো। সোফিয়াকে লেখা মহিমের চিঠিতে সব পরিস্ফুট হয়েচে। এ হ'লো ১৯৪৬এর দাঙ্গার ছবি। এর সঙ্গে তুলনীয় নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন'। তবে দাঙ্গা তেমন ফুটে ওঠেনি। এরপর লেখক আরো বাস্তবায়নে এগিয়েচেন তাঁর 'মাটি ও মানবী'তে। সমস্যা ফুটেচে দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপণে ও রূপায়ণে। আধুনিক প্রচেষ্টা হিসেবে এ উল্লেখযোগ্য। এরপর হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইরাবতী' [১৯৪৮] স্মরণীয়। এর পটভূমি হ'লো বর্মা। বর্মীদের প্রাণশক্তি ব'য়ে চলেচে ইরাবতীর স্রোতের মতো দুর্বার বেগে। এখানে যে-জাতির পরিচয় আছে, তার গড়নে কাজ করেচে চানশিটা, মিনডন মিন ও মহাবাণ্ডুলা। এখানকার জাতি-জাগৃতির উন্মেষ হয়েচে থারাওয়াডির বিদ্রোহে। এতে রাজনীতি থাকলেও এ উপন্যাস, যার নায়ক ভারতীয় সীমাচলম। এর মারফতে ব'য়ে চলেচে হৃদয়াবেগ, যা জীবনায়নে কখনো মা-পান, কখনো ফতিমা, কখনো হামিদা, কখনো বা বাংগাম্মাকে আশ্রয় করেচে। এর পূর্ব নাম ছিলো 'মোহানা'। নামের পরিবর্তনে ফুটে উঠেচে প্রাণচাঞ্চল্যের চেহারা। ভাষার বর্ণিলতা মাঝে মাঝে চমক দেয়। বাংলা উপন্যাস তাই অনেকটা এগিয়েচে বিদেশের চিত্রণে। আঞ্চলিকতাই এর বড়ো কথা, যাতে আছে 'স্থানিক রঙ'।

(iii) প্রেমপরিক্রমা

বাংলা সাহিত্যের প্রায় পনেরোআনাই প্রেম নিয়ে গড়ে উঠেচে। এই প্রেম হাল আমলে হয়েচে কামুকতার নামান্তর। তাহ'লেও এ জুগিয়েচে সাহিত্যের প্রাণ প্রেরণা। মানুষের জৈবলীলা প্রেমে স্পন্দমান। তাই এর রূপায়ণ সাহিত্যে থাকবেই। তবে বাংলায় এর প্রাধান্যই চোখে পড়ে। যুগে যুগে এর রূপ গেচে বদলে। এ-কাজে সহায়তা করেচে পরিবেশের পরিবর্তন। যাঁদের লেখনী এদিকটা তুলে ধরেচেন তাঁদের পরিচিতি উল্লেখের দাবী রাখে।

(১) স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'অগ্রণী'র লেখক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য নতুন পরিবেশ এনেচেন তাঁর 'অন্ত্যেষ্টি'তে। এজগৎ "প্রুফ রীডারের"। সরোজকুমার তাঁর 'হংস বলাকা'র এর কিছুটা সন্ধান দিয়েচেন। তপেশ ভ্যানগার্ড আফিসের প্রুফ রীডার। এখানকার কাজ রাতেই আরম্ভ হয় আর "কারেকটার কম্পোজিটার, মেক-আপম্যান, লাইনো-ম্যান—নিদ্রাবিজয়ী বীরের দল বিড়ি চুষিয়া আপন আপন কাজে ব্যস্ত।" যন্ত্রদানবের অত্যাচারের কি ভয়াল রূপ এটা। যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা মানুষ, কিন্তু সে আজ তার কাছেই বন্দী। স্রষ্টা সৃষ্টির কাছেই শৃঙ্খলিত। এ মর্মান্তিক। তপেশের বিবর্তনের ইতিকথা আছে এখানে। যে যে খাতে বয়ে চলেচে এ-ধারা, এখানে ফুটে উঠেচে তার পরিচিতি। তপেশ সাংবাদিক থেকে লেখক হ'লো আর তার 'সংসার সমুদ্র' গল্প বেরুলো 'দেশমুকুরে'। 'ভ্যানগার্ড' উঠে যাওয়ায় তপেশ বিশ্ববাণীতে চাকরি পেল ৩০৲ টাকায়। এদিকে স্ত্রী মঞ্জুলী মৃতসন্তান প্রসব করেচে। তপেশের জনপ্রিয়তা ছড়াল 'সংসার সমুদ্র' ও 'আঁধারে আলো' মারফতে। প্রথমটির কদর হ'লো চিত্রজগতে আর দ্বিতীয়টির নাট্যজগতে। তপেশ বিখ্যাত হ'লো রেডিও-খ্যাতির সঙ্গে। স্ত্রী মঞ্জুলী কিন্তু অনাদরে অবহেলায় মারা গেল। তিন মাস পরে 'আঁধারে আলো'র নাট্যরূপ বেরোল, নাম 'জীবনবেদী'। তপেশ খ্যাতির মধ্যে দেখলো শূন্যতা। আর প্রতিজ্ঞা করলো 'দেখা-অদেখায়' সে সতীদেহ খান খান করে ছড়াবে গ্রামে ও শহরে। এই যে শোকান্তিকা এর মূলে আছে সাহিত্যায়নের একমুখো গতি, যা পরিবারকে অস্বীকার করে। এও এক রকমের প্রেমের ত্রিভুজ যা গড়ে উঠেচে লেখক-লেখা-স্ত্রীকে নিয়ে। লেখা আর স্ত্রী যেন পরস্পর সতীন। একদিকে যেমন ফুটেচে শোকান্তিকা, অন্যদিকে এসেচে ব্যঙ্গের ঝাঁজ। দুয়েরি প্রাণ-কেন্দ্র কিন্তু তপেশ।

শহর ছেড়ে গ্রাম নিয়েও গল্পায়ন চলেচে। এর উদাহরণ হ'লো 'তীর ও তরঙ্গ', যা গড়ে উঠেচে পদ্মাপাড়ের গ্রাম বকুলতলাকে নিয়ে। প্রেমের আকর্ষণ বিকর্ষণে এসেচে সুনীল-অনিমা-নমিতা ত্রিভুজ। পদ্মার যেমন আছে তীর ও তরঙ্গ তেমনি বকুলতলার, তেমনি সুনীলের মা মন্দাকিনীর। অন্যদিকে অনিমার ও। সুনীলের ভালবাসার ঢেউয়ে তীর ভেঙে গেচে আর তরঙ্গের সঙ্গে তীরের মিলন হয়েচে নমিতাকে নিয়ে। সাধু ভাষায় নদীর বর্ণনা হয়েচে চমৎকার। অনিমার দুঃখ মর্মান্তিক। পরে সুনীল-নমিতা চলেচে নিরুদ্দেশ যাত্রায় স্টীমারের ধক ধক ছন্দে। অনিমার গণ্ডদেশে গড়িয়েচে প্রেমাশ্রু, যেমন মন্দাকিনীর বুক বেয়ে পড়েচে স্নেহধারা। এখানে প্রেমের কোমলতার দিকটাই উদ্ঘাটিত হয়েচে।

(২) সুমথনাথ ঘোষ (১৯১০)

ভ্রমণকাহিনীকে উপন্যাসের উপজীব্য করার কৃতিত্ব আছে সুমথনাথ ঘোষের। এতে ফুটেচে একদিকে যেমন সফরের চঞ্চলতা, অন্যদিকে তেমনি বাউলের ঔদাসীন্য। বস্তুত যাযাবর ও ভবঘুরে জীবনের রূপায়ণে তিনি প্রবোধকুমারের সগোত্রীয়। উদাস-করা সুরই তাকে টেনে নিয়েচে সুদূরে আর করেচে 'সুদূরের পিয়াসী' [১৯৪১]। এ হ'লো 'মহাপ্রস্থানের' রঙে রঙা। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে এখানে ফুটে উঠেচে কাহিনীপ্রবাহ। চন্দ্রনাথে দেখা গেল মেনকাকে আর ব্রজেন বাগ্‌চির পালান স্ত্রীকে। তাইতো সে রূপান্তরিত হ'লো মাতাজীতে। এরপর সুরু হ'লো পরিক্রমা, সফরের বিস্তার। এক অদৃশ্য সংকেতে সে তাই ঘুরচে হরিদ্বার, কাশী, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে। নারীর যেন দুই রূপ—মেনকা ও মাতাজী, এ স্মরণে আনে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন'কে, যেখানে নারীকে মা-জাতি ও স্ত্রী-জাতি ব'লে অভিহিত করা হয়েচে। এই স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রকাশ পেয়েচে মনস্তাত্ত্বিক অবলোকন। আলেখ্যে তাই প্রতিভাত হয়েচে এর বিশ্লেষণী রূপ: "নারী ভালবাসে নিজেকে সকলের চেয়ে বেশি, বহুদর্পণে প্রতিফলিত না হ'লে সার্থক হয় না রূপ। সে ভালবাসা চায় অনেকের, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের পূজা চায় সে।" তাই তো নারী সুদূরের পিয়াসী, যার মধ্যে বিরাজ করচে বহু বল্লভ-প্রয়াসী মনোবৃত্তি।

এরপর 'বাঁকা স্রোতে' আত্মজীবনীর আরেক ভিয়ান। আলোকের আত্ম-কথায় এ সমুজ্জ্বল। এখানে তার দুঃখকষ্টের একটা খতিয়ান তৈরি হয়েচে। পরিক্রমার বেজেচে বাউলের একতারা। তার মনের স্রোতে এসেচে কতনা ঘূর্ণি, কতনা চিন্তার জাল, কতনা অবচেতনার তোলপাড়। কিন্তু এর শেষ হয়েচে যখন দোটানার অধিজ্ঞাতা লোপ পেয়েচে সন্ন্যাসে। একদিকে অর্থ-যশোলিপ্সা মাথা চাড়া দিয়েচে মধু, কমল ও ভুতোর মারফতে, অন্যদিকে হৃদয় আকুল হয়েচে শান্তির প্রতি আকর্ষণে। শেষের দিকে পা বাড়ানোর পর কিন্তু শান্তি ধরা দেয়নি, সে চলে গেচে। তাই সন্ন্যাসীর গেরুয়া নিয়ে বেরিয়েচে আলোক শান্তির খোঁজে। এখানে প্রকাশ পেয়েচে 'শ্রীকান্ত'র ছন্নছাড়া রূপ, যা স্মরণ করিয়ে দেয় 'অপরাজিতের' ভবঘুরেমি ও। ঔদাস্যে উপচে পড়েচে করুণা ও। শুধু তাই নয় এখানে মনের অলি-গলির পরিচয়ও আছে, উদাস ভাবের পেছনে যে সব ঘটনা কাজ করেচে, তার রহস্য উদ্ঘাটনে লেখক সচেষ্ট। মোট কথা, এখানকার রস দানা বেঁধে উঠেচে ভ্রমণ ও প্রেম নিয়ে। তবে মনস্তাত্ত্বিকতাও অনিবার্যভাবে এসে গেচে। বাউলের সুর বাঙালীর নিজস্ব। এর প্রয়োগে আরেকবার বাঙালী নিজেকে চিনেচে। তবে লেখকের শিল্পায়ন তেমন সার্থক হয় নি।

(৩) ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পল্লী চিত্রণের বাহাদুরি আছে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের। নিতান্ত গ্রামীন পরিবেশে ফুটেচে চারিত্রায়ণ এখানে। শৈলজানন্দ যেখানে দেখেচেন সাঁওতাল কুলিমজুর, তারাশঙ্কর বাউরি-বাগ্দী, সেখানে ফাল্গুনী এনেচেন বীরভূমের গ্রামের পরিবেশ। আর এ জীবন্ত হয়েচে লোকসঙ্গীতে, যেমন ভাদু, ঘেটু, কবি ও ঝুমুর। লোক-সাহিত্যের তাই হয়েচে ব্যাপক প্রসার। এতে কল্পনা বাস্তবানুগ না হ'য়ে হয়েচে খেয়ালী। একটা বাস্তবাতিগ ধারার পরিচয় আছে এখানে। তাই প্রেমের পরিধি ব্যাপৃত হয়েচে ধরণীর ধূলিকণা থেকে সুদূর আকাশ পটে। কল্পনার খেয়ালীপনায় গল্প অনেক জায়গায় চাপা পড়েচে। কি চরিত্রায়ণে, কি ঘটনাবিন্যাসে নেই তেমন সূক্ষ্মতা।

তন্দ্রা-কনক-স্বপনের কাহিনী কথ্যভাষায় কথিত হয়েচে 'আকাশ বনানী জাগে' [১৯৪৩] তে। তন্দ্রা ভালবাসে স্বপনকে, কিন্তু স্বপন হ'লো কনকের বাগ্‌দত্ত। কাজেই ঠিক হ'লো, কনক হবে স্বপনের শয্যাসঙ্গিনী আর তন্দ্রা তার সহধর্মিনী। প্রকৃতি ও মানুষের যোগসূত্র রচিত হয়েচে এখানে। তাই যখন "দূর দিক চক্রবালে চন্দ্র-করোজ্জ্বল নীলাকাশ বনানীর বুকে লুটিয়ে পড়েচে" তখন কনকের "চির মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষার আর্তিকে আচ্ছন্ন করে জেগে রয়েচে চিরমুক্তির আনন্দ স্বপ্ন।" এর সঙ্গে তুলনীয় 'শেষের কবিতা' ও পুরাকালের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী চন্দ্রলেখা। ভাদু গানে এসেচে স্থানিক রঙ—

সরু কাপড় পরবে ভাদু পানেতে ঠোঁট করবে লাল,
ঝুমঝুমিয়ে যাবে ভাদু দুটি পায়ে বাজবে মল।

এ চমৎকার চিত্র। এর পর 'ধরণীর ধূলিকণা'র অবতরণ করেচেন লেখক। মাধবী স্বামীর অত্যাচারে পালিয়ে এলো বাপের বাড়িতে। এখানে গ্রাম-সম্পর্কীয় ভাই অঞ্জনের সাহচর্যে স্নেহ জেগে উঠ্‌লো, যা হ'লো ভালবাসারই নামান্তর। পরে অঞ্জন বিয়ে করেচে কাজললতাকে। এদের একটি জাতক হ'লো, নাম কাটিম। কাটিমকে ঘিরে মাধবীর মাতৃত্ব ধারা কিন্তু ব'য়ে চললো। জর হওয়ায় অঞ্জন চলেচে মাধবীকে নিয়ে হাওয়া বদলের জন্যে। গ্রাম্য কবি ও ঝুমুর গানের উপস্থিতি বেশ-লক্ষণীয়, যেমন—

বড়্ ঠাকুরের বিয়া হে বড়্ ঠাকুরের বিয়া,
বউ আইল লাল টুকটুক শাঁখা শাড়ি নিয়া হে
শাঁখা শাড়ি নিয়া।

পল্লীমায়ের চিত্রলতা সত্যি চমৎকার।

(৪) রামপদ মুখোপাধ্যায়

পল্লীর ধ্বংসোন্মুখ রূপ প্রকাশে দক্ষতা দেখিয়েচেন রামপদ মুখোপাধ্যায়। কালের পুতুল মহাকালের বিবর্তনে যেভাবে আবর্তিত হচ্চে তারি প্রতিভাস

এখানে। তবে এ পল্লী পশ্চিম বাংলার, যেখানে নদী মজে গেচে আর গ্রাম উজাড় হয়েচে। বেদনাবোধ তাই এক পোড়ো মাঠের সন্ধান দেয়. যার ছবি এলিয়ট এঁকেচেন তাঁর Waste Land এ। সৃষ্টির ধ্বংসে স্বভাবতই অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আসে উদাস ভাব। তাঁর 'মজানদীর কথা' [১৯৪১] গড়ে উঠেচে অমিয়, বিশ্বজিৎ ও বীরেনের মারফতে। রেল অফিসে চাকরিই হ'লো প্রাণকেন্দ্র। শহুরে চাকরির ফসল ফলে বটে, কিন্তু তার জন্যে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা ভয়াবহ। নদী সংস্কারের জন্য এতটা যত্ন নিলে, জীবিকার উপভোগী ফসল নিশ্চয়ই এখনো ফলে পল্লীতে। অধিকন্তু পল্লীশ্রীও ফিরে আসবে। অমিয়'র চাকরি আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা স্বার্থপরতারই ইঙ্গিত করচে। তার কাছে দেশ কিছু নয়, চাকরিই সব। তাই ব্যর্থতা-বোধে এসেচে শহুরে অভিযান। 'মহানগরী' [১৯৪৫] রচিত .হয়েচে আত্মজৈবনিক রীতিতে। গেঁয়ো ছেলে সুপ্রিয় এসেচে কলকাতায়, যেখানে সে ঘরোয়া শিক্ষণ কাজ করে নীতিশ-বাবুর বাড়িতে। অরু ও তরু তার ছাত্রছাত্রী। শহুরে গতিবেগই বেশি করে চোখে পড়ে। নীতিশ বাবু মহানগরীর প্রতীক। এঁর জীবনে আছে তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে আছে নীতিশের পুত্র রণজিৎ,, যে "উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল"; দ্বিতীয় স্তরে সুজিত, যে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন "বিশিষ্ট কর্মী"; আর তৃতীয় স্তরে স্মরজিৎ, যে বিপ্লবী হ'য়ে দার্জ্জিলিংএর বাতাসিয়া চাবাগানে পুলিশের গুলিতে মারা গেচে। মহানগরীরও আছে স্তর বিন্যাস, যার শেষ পর্ব সুপ্রিয়'র কাছে মনে হয়েচে, "সন্ধ্যা-অভিমুখী সুসজ্জিতা মহানগরী সেই গতিবেগে চারি পাশ হইতে মুদিয়া যাইতেছে।" এই ধ্বংসিল রূপ সত্যি বেদনাদায়ক। এরপর 'রতনদীঘির জমিদার-বধূ' [১৯৫০]। এর প্রধান চরিত্র জমিদার-বধূ মহামায়া, যে মাণিককে পেয়েচে পুত্র হিসেবে। রেণুকে বিয়ে করলনা মাণিক, তাই মহামায়া মনোকষ্ট পেয়েচে। মদনের সঙ্গে রেণুর বিয়ে হ'লো। এদিকে মাণিক ডাক্তার হ'লো আর মদনের কারাবাস অনীতা-ধর্ষণের জন্যে। পরে মাণিকের মিলন হয়েচে অনীতার সঙ্গে। মোটামুটি প্রেমকাহিনী, যাতে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসিলতাই চোখে পড়ে। সমাজ ভাঙন এখানে সুপরিস্ফুট। তাই লেখকের বৈশিষ্ট্য পল্লীর এ ধ্বংস—রূপায়ণে। তবে কলাকৌশলের দিক থেকে এ রচনা তেমন কোন মৌলিকতা দাবী করতে পারে না।

(৫) শচীন্দ্র মজুমদার

প্রেমের কাহিনীর আঙ্গিক বিবর্তনে শচীন্দ্র মজুমদার স্মরণীয়। তাঁর 'লীলা মৃগয়া' পরকীয়া তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এখানে এসেচে কাব্যিক অনুভূতি যা কথা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েচে। প্রাণের এই লীলাই এখানে মৃগয়ায় বেরিয়েচে। কাজেই উপন্যাসের নামেই আছে ব্যঙ্গ লুকিয়ে। এরপর 'পলাতকা' [১৯৪৮]র নায়িকা হ'লো আধুনিক বাঙালী নারী, যে বিজ্ঞানের সাধনা করে ও পুলিশের গুলি উপেক্ষা

করে। প্রয়োজন হ'লে সে পালায় পুরুষের ছদ্মবেশে। এলাহাবাদের আবহাওয়ায় গড়ে উঠেচে এ-কাহিনী ১৯৪২এর পটভূমিকায়। লম্পট বিত্তশালীর কবল থেকে উদ্ধারের জন্ত কমলা পলাতকা। এ নারীত্বেই আস্থাবান্ নয়। ভাবার সংহতি ও ধারাল তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়, তবে চরিত্র-চিত্রণ সুপরিস্ফুট নয়। মনস্তাত্ত্বিকতা থাকলেও, তা প্রকট হ'য়ে রুদ্ধ করেনি গল্পায়ন। আঙ্গিকের পরিবর্তন এসেচে দৃশ্যের নতুনত্বে। উপ-ন্যাসের উপজীব্য প্রকাশ পেয়েচে এর নামে। এখানে সমাজের সংস্কৃতিবিলাসীর পরিচয় মেলে। মার্জিত রুচিবোধই দিয়েছে এ জয়মাল্য।

(৬) নবগোপাল দাস

নবগোপাল দাস প্রেমের রোমাঞ্চক দিকটা উদ্‌ঘাটিত করেচেন খেয়ালী কল্পনায়। এরি পরিচায়ক হ'লো তাঁর 'সাগর দোলার ঢেউ', 'চলতি পথের বাঁশি', 'হে আত্ম-বিস্মৃত' ও 'অনবগুণ্ঠিতা' [১৯৪৩]। শেষেরটি হ'লো অমল-প্রতিমার কাহিনী। প্রতিমার আঙিনায় এসেচে সাধন ও প্রদীপ। এদের সঙ্গে প্রতিমার একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেচে। ফলে প্রতিমা পরিক্রমায় বেরিয়েচে হাওয়া বদলের জন্তে। এরি মারফতে ভাঙন এগিয়ে এসেচে প্রেমের বেলাভূমিতে। তাই প্রতিমার হ'লো মৃত্যু। এর মূলে আছে যৌন আকর্ষণ-বিকর্ষণের দোটানা, যাতে ভরা ডুবি অনিবার্য। আঙ্গিকের দিক থেকে মনোবিকলন লক্ষণীয়, যা ফুটে উঠেচে "প্রতিমার ডাইরিতে।" বস্তুত "প্রতিমার ডাইরি" Point Counter Pointএর [A. Huxley] Quarlesএর Note-Bookএর নামান্তর। এ এক চরিত্রের ভূমিকায় অবতরণ করেচে। জায়গায় জায়গায় অবিশ্যি প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেচে। মনে হয় এ-বিশ্লেষণই মুখ্য আর গল্প ও চরিত্র কথার সূত্রে ঝুলচে ঝাড়-লণ্ঠনের মতো। গল্প শেষে রহস্য অনাবৃত বা অনবগুণ্ঠিত হয়েচে। কাজেই আবিষ্কারের চমকে এসেচে গোয়েন্দা মনোবৃত্তিও। মোট কথা, উপন্যাস তেমন উৎরায়নি।

(৭) প্রতিভা বসু [১৯১৫—]

মেয়েলী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়েচেন প্রতিভা বসু। পুরুষালির অভিনয় নেই এখানে, যেমন দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবীতে। মহিলা মহলে প্রতিভা বসু এনেচেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এদিক থেকে তাঁর 'মনোলীলা' স্মরণীয়। সমস্যা এখানে রূপায়িত হয়েচে মেয়েলী অবলোকনে। নারীর দিকটাই তুলে ধরা হয়েচে। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েচে লীলার চরিত্রে। সে সত্যশরণ মিত্রকে বিয়ে করলেও, পালিয়ে গেলো বিকাশের সঙ্গে। লীলার নিজের মেয়ের স্মৃতিও তার পথ আটকাতে পারেনি। তাই প্রাণনই জয়ী হয়েচে সমাজের উপর। স্বামীর ব্যক্তি-পুরুষ দুর্বল হ'লে

স্ত্রী তাকে ছেড়ে যায়। লীলাও করেচে তাই। সে স্বামীকে তাই কাপুরুষ বলেচে: "স্ত্রীর উপর যে জোর করে না সে কাপুরুষ ছাড়া কী?" পরে অবিশ্যি লীলার মেয়ের বিয়ে হয়েচে সুনীলের সঙ্গে। এখানকার আঙ্গিক উল্লেখযোগ্য। ঘটনার আরম্ভ হয়েচে স্মৃতিরোমন্থনে আর ব'য়ে চলেচে চেতনাপ্রবাহে। এর উপজীব্য অবিশ্যি বিবাহ ও সমাজ। এরপর 'সেতুবন্ধে' চেষ্টা চলেচে স্বামী স্ত্রীর সেতু রচনার। ছোট ছোট শব্দের আমদানিতে বাক্য হয়েচে সরল অথচ অর্থব্যঞ্জক। অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনাই অনেক জায়গায় প্রকট হয়েচে। এদিক থেকে স্মরণীয় প্রতিভা বসু।

(৮) অন্যান্য ঃ

অনেকেই হাল আমলে উপন্যাস লিখেচেন ও লিখচেন। এর মধ্যে স্মর্তব্য গজেন্দ্রকুমার মিত্র [১৯০৯—]। ইনি গল্প লিখিয়ে হিসেবেই বেশি পরিচিত। তা সত্ত্বেও তিনি উপন্যাসেও হাত দিয়েচেন। এরি পরিচায়ক হ'লো 'রাত্রির তপস্যা' যাতে গোটা জাতির দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বর্ণিত হয়েচে। দুর্ভিক্ষের সহচরী মড়ার মিছিল দেখান হয়েচে ভুপেননামা নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভুপেনের জীবনায়নে ভিড় করেচে একে একে সন্ধ্যা, কল্যাণী প্রভৃতি। প্রেম যেন বৃহত্তর সীমায় ছড়িয়ে পড়েচে এখানে। গল্পায়ন সাধারণ খাতেই বয়ে চলেচে যাতে মধ্যবিত্ত'র দুঃখই ফুটে উঠেচে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' মানব জাতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেচে। এখানে জোট মিলেচে দু'টো কাহিনীর—মঙ্গলা ও সুবল এবং মুরলী ও মনোরমা এগিয়েচে গল্পায়নে। এক এক জন মানুষ যেন এক একটি দ্বীপ। লেখক বলেচেন—"প্রত্যেকটি দ্বীপই সুবল স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে… সবাই স্বার্থপরতায় ঘেরা, স্বার্থ চিন্তায় এক থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবনার সমুদ্র সাঁতরে একজন আর এক-জনকে ছুঁয়ে আসতে পারে না।" এ বাস্তব চেতনা তাই মর্মন্তুদ। তারপর সুধাংশু হালদারের 'প্রত্যাখ্যান' [১৯৪৫] নাগরালির পরিচায়ক। অসীম ও মল্লিকার প্রেম কাহিনী হ'লো উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মনান্তরে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হ'লো। সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর মল্লিকার সঙ্গে দেখা হ'লো অসীমের। রোগ-শয্যার এ-মিলনে ঘনিয়ে এলো মহামিলন। তাই এ হয়েচে শোকান্তিকা। বর্ণনার বাহাদুরি আছে। চিত্রালির জেল্লা ফুটেচে ইটালির রূপায়ণে। এখানে অবিশ্যি লক্ষণীয় মধ্যবিত্ত'র সংস্কৃতি-বিলাস।

এরপর উপেন্দ্রনাথ ঘোষের 'নাচওয়ালী', 'দামোদরের বিপত্তি' ও 'দিগ্‌ভ্রষ্ট' লক্ষণীয়। রক্ষণশীলতাই এখানে ধ্বজা উড়িয়ে এসেচে। নগেন্দ্র খৃষ্টান হ'য়ে বিয়ে করেচে লিলিকে। পরে এরি জন্যে হ'লো প্রায়শ্চিত্ত। কলা-কৌশলের পরিচয় এখানে তেমন কিছু নেই। উপেন্দ্রনাথ দত্তের 'নকল পাঞ্জাবী' চলচ্চিত্রে খুবই জন-প্রিয়তা অর্জন করেচে। অবিশ্যি ভাওয়াল ঘটনারই রূপান্তর। তাই পটভূমিকায়

বাস্তবতাই একে এনেচে লোকচক্ষুর গোচরে। এরপর চরণদাস ঘোষের 'নাগরিকা' ও 'নিরক্ষর' উল্লেখযোগ্য। 'নাগরিকার' কণ্ঠে রয়েচে "বৌদ্ধযুগের এক বিচিত্র কাহিনী" যদিও ঐ যুগের ইতিহাসের সঙ্গে "এর আদৌ সম্পর্ক নাই"। বর্তমানই এখানে রূপায়িত হয়েচে বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায়। গত কাল ও বর্তমান তাই বাঁধা পড়েচে এক অদ্ভুত মেল বন্ধনে। এখানে যদি "সঙ্গীত থাকে তবে সে সঙ্গীত অতীতের আর যদি রোদন থাকে, তবে সে রোদন বর্তমানের।" সবাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হওয়ায় নাগরিকা হয়েচে নিরুপায়। কঙ্কণ ও চিত্রার চরিত্রায়ণ ভাল ফুটেচে। এ-প্রসঙ্গে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রান্তিক' ও উল্লেখযোগ্য, যেমন রঞ্জনের 'অনুপূর্বা'। বাণী রায়ের "প্রেম" [১৯৪৫] এখানে উল্লেখযোগ্য। রূপালীর জীবনে প্রেমের বিস্তার দেখানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এর আঙ্গিকে রূপালীর ডাইরী একটি চরিত্রের কাজ করেচে। দেশ বিদেশের উপাদানে সঞ্জীবিত হয়েচে গল্পায়ন। এর পর বিমল মিত্রের "ছাই" প্রেম কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেচে। তবে পিতা পুত্রের যৌন আকর্ষণ দানা বেঁধে উঠেচে একটি মেয়েকেই ঘিরে। এতে সমাজ ভাঙন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেচে ছাই-এ।

(iv) গোয়েন্দাকাহিনী প্রবাহ

রবীন্দ্রপর্বের পর গোয়েন্দাগিরির হয়েচে ব্যাপক প্রয়োগ হাল আমলে। রহস্যের আকস্মিকতাকে যুক্তির উপর স্থাপিত করার দিকে এসেচে প্রবণতা। তবে এ প্রচেষ্টা হিসেবে যেমন উল্লেখযোগ্য, সৃষ্টি-রূপে তেমন নয়। তবুও এর উল্লেখের প্রয়োজন আছে। "মোহন সিরিজের" বালসুলভ চাপল্যই এর বৈশিষ্ট্য অনেক জায়গায়। তাই শৈল্পিক সুষমা স্বভাবতই অনুপস্থিত। শশধর দত্তের শতাধিক বইয়ে কেবল উদ্ভট রহস্যের উদ্‌ঘাটনই চিত্রিত হয়েচে। মোহনের 'জার্মানী অভিযান' 'ফাঁসীর মঞ্চে মোহন' প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ-ছাড়া আছে অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ', মিহির কুমার সিংহের "বিচিত্র রহস্য সিরিজ" ও শরৎচন্দ্র চক্রবর্তির "রহস্য চক্র সিরিজ"। এরা উদ্ধৃতির দাবী রাখে।

এ-ধারার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি এসেচে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারফতে। যদিও তাঁর গল্পেই দেখা যায় এর বিকাশ, তবুও গল্পগুলি গড়ে তুলেচে উপন্যাসের বৃহত্তর পরিবেশ। এ হিসেবে গল্প উপন্যাসের দাবী করতে পারে। কাজেই গল্পগুলি স্মরণীয় একক ও সম্মেলকরূপে। শরদিন্দুর "ব্যোমকেশের গল্প", "ব্যোমকেশের" কাহিনী ও "ব্যোমকেশের ডায়েরী" গড়ে তুলেচে ব্যোমকেশের উপন্যাস। একক ভাবে প্রথম সংগ্রহের 'রক্তমুখী নীলা', 'অগ্নিবাণ', 'উপসংহার' এবং 'ব্যোমকেশ ও বরদা' স্মরণীয়। গল্প রোমাঞ্চক হ'লেও মাননিক। দ্বিতীয় সংগ্রহের উপাদান জুগিয়েচে 'চোরাবালি' ও 'অর্থমনর্থম্'। এখানকার ব্যোমকেশের গোয়েন্দা কার্যকলাপ লক্ষণীয়। 'চোরা-বালিতে' দেওয়ান কালীগতি প্রাণ হারিয়েচে বন্দুকের গুলিতে। এ চাঞ্চল্যকর

ঘটনা। তারপর তৃতীয় সংগ্রহে আছে 'ব্যোমকেশের ডায়েরী', 'সত্যান্বেষী', 'পথের কাঁটা', 'সীমন্ত হীরা' ও 'মাকড়সার রস'। এ-উপন্যাসের ব্যোমকেশ হ'লো Sherlock Holmesএর নামান্তর। গোয়েন্দাগিরির আঙ্গিক এখানে উপজীব্য হয়েছে গাল্পিকতার। প্রথম দু'টি গল্প রোমাঞ্চক খুন নিয়ে, আর শেষের দু'টি চুরি নিয়ে। 'মাকড়সার রস' ট্যারানটেলা নাচের আদর্শে পরিকল্পিত। এখানে ব্যোমকেশের সহায়ক হয়েছে অজিত, যে ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে যাচ্চে। শরদিন্দু সত্যিকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গোয়েন্দা গল্পে। গোয়েন্দায় ফুটেচে অনুসন্ধিৎসার পরিচয়ই বেশি ক'রে। আবিষ্কারের চমকও আছে, তবে গৌণভাবে। লেখকের বৈশিষ্ট্য হ'লো গোয়েন্দাগিরির মাননিক অবলোকনে, যাতে সম্ভব হয়েচে শিল্পজ সংহতি। উপাদান-বৈচিত্র্যে খুনখারাবি ও চুরি থাকলেও, এ হয়েচে সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রয়োগের দরকার আছে।

(৮) সমাজ চেতনা

বিয়াল্লিশোত্তর যুগে গণসাহিত্যের প্রগতিও লক্ষণীয়। সমাজ-চেতনা এখানে আরও নিবিড় হয়েচে। চারিদিকে যে ভাঙন চলেচে তাতে ব্যক্তিত্ব ও বিলাস গুঁড়িয়ে যাচ্চে। এর আর্থিক অসচ্ছলতা তাই মাথা চাড়া দিয়েচে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সমস্যাও এগিয়ে এসেচে। সাম্যবাদ এসেচে যদিও আসেনি সমতা। এও এক রকমের বিলাস। এরি চেহারায় হয়তো পঞ্চাশোত্তর পর্বের স্বরূপ চেনা যাবে। আজ আছে তারি পূর্বাভাস।

(১) জ্যোতির্ময় রায় [১৯০৮—]

ধনী দরিদ্রের বৈষম্যে সাম্যবাদ মাথা খাড়া করেচে। মানুষে-মানুষে মননের ও গড়নের তফাৎ আছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ বিভেদ মারাত্মক। তাই বিত্তহীনতায় এরি রূপ ধরা পড়েচে। জ্যোতির্ময়ের 'উদয়ের পথে' [১৯৪৪] তাই যেমন এগিয়েচে চলচ্চিত্রের গতিতে, তেমনি সামাজিক চাহিদায়ও। একে "সাজ ঘর থেকে টেনে আনা হয়েচে।" কাজেই উপন্যাসের গল্পায়ন কিছুটা ব্যাহত হয়েচে। একে চিত্রোপন্যাসও বলা চলে। ১৯৪৩এর পটভূমিকায় একে আঁকা হয়েচে। ঘটনাবস্তু সাধারণ হলেও, ইঙ্গিত অসাধারণ। সুমিতা ও অনুপ ভাই বোন। সামন্ততান্ত্রিক ব্রজেন্দ্রের মেয়ে গোপা অনুপের সঙ্গে চম্পট দিয়েচে। ব্রজেন্দ্রের রক্তে যে ধ্বংসবীজ আছে এ যেন তার শেষ পরিণতি। সমাজ এগিয়ে চলেচে ভাঙনের পথে। একদিকে বেজেচে নটরাজের ধ্বংসডঙ্কা, অন্যদিকে এগিয়ে এসেচে নতুনের সূর্য। রক্ষণশীলতার গোঁড়ামি কখনোই টিকতে পারেনা, যেহেতু কাল এক বিরাট শিল্পী। সে আপন মনে এঁকে চলেচে ক্ষয় ও সৃষ্টির রূপ। ইতিহাসের অনিবার্যতায় একদিন

এ সামন্ততন্ত্র ভেঙে যাবে, ফুটে উঠবে গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এই আশাতেই উদয়ের পথ উজ্জ্বল হ'য়ে দিশারী হয়েছে। উপন্যাস অবিশ্যি শেষ হয়েছে ভান্দি ভাসিলিয়েভস্কার 'রামধনুর' প্রান্তিক রঙে। চরিত্রায়ণ এগিয়েছে সংলাপের সংক্ষিপ্ত ও তির্যক ভঙ্গিতে। এক একটি কথার মূল্য দেয়া হয়েছে ওজন করে। কথনে তাই যেমন এসেছে চিন্তনের গভীরতা, তেমনি ব্যঙ্গের তীব্রতা। তবে চিত্রজগতে এ জনপ্রিয়তা আনলেও, উপন্যাস হিসেবে তেমন উৎরায়নি। বস্তুত লেখকের ছোটগল্পই এদিক থেকে বেশি সার্থক। উপাদান ও সংলাপের নতুনত্বের জন্যে এ প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

(২) সন্তোষ কুমার ঘোষ

সমাজ-চেতনায় এগিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'কিনু গয়লার গলি' [১৯৪০]তে। মধ্যবিত্ত সমাজ নিচে নামছে অথচ তার উপরতলার মোহ কাটছে না। তাই নতুন যুগ চেতনায় নীলার বাপ শিবব্রতবাবু সূর্যস্নাত পপ্‌লার পার্ক থেকে নেমে এসেছেন কিনু গয়লার গলিতে। এতে দারিদ্র্যই সূচিত হয়েছে। পুত্র দেবব্রত এ পারেনি। তাই তার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে বোনের বিয়ে ধনীর সঙ্গে দেওয়াতে। মণীন্দ্র ও ইন্দ্রজিৎ সাহিত্যিক। একজন অর্থের জন্যে রঙ্গালয়াধ্যক্ষের কাছে এসেছে, অন্যজন রইল দারিদ্র্য আঁকড়ে। বনেদি নোংরামি নিয়ে রাজধানী কলকাতা হাজির হয়েছে চরিত্রের ভূমিকায়। এখানে সমাজ ভাঙনই রূপায়িত হয়েছে অবক্ষয়ের ধূসর মহিমায়। এতে বলি পড়েছে শকুন্তলা ও শিবব্রত। মনুষ্যত্ব এখানে অর্থনৈতিক কারণে পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যন্ত্রযুগের এ এক মহাবিদ্রূপ। ধ্বংসিলতারূপই কিনু গয়লার গলি, যার প্রাণ "বাঘ ভালুকের মতো এমন তেজী নয়, ময়ূরীর মতো নৃত্য-পরা নয়, হরিণের মতো চঞ্চল নয়। কেঁচোর মতো, কোনক্রমে আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিব্রত। বুকে হেঁটে চলে, এগোয় কি এগোয় না।" সন্তোষকুমারের প্রতিভার সাক্ষ্য ফুটেছে এখানে।

(৩) বিজন ভট্টাচার্য

জ্যোতির্ময় যেখানে দেখিয়েছেন উদয়ের পথ, সন্তোষকুমার কিনু গয়লার গলি, সেখানে বিজন ভট্টাচার্য এনেছেন 'জনপদ' [১৯৪৫]। রামপদ মুখোপাধ্যায়ে আছে ব্যর্থতাবোধ কি পল্লী কি শহরের চিত্রণে। কিন্তু বিজন শুনিয়েছেন আশার বাণী। মানুষের চেষ্টায় এই ধ্বংসিলতা লোপ পাবে, জাগবে নতুন নতুন নগরী। শতনামপুর গ্রাম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ এসেছে শহরে। তাই তো কলকাতায় আনা-গোনা করছে মালিনী, সুনন্দা, কালীচরণ, গোবর্ধন প্রভৃতি। এরপর মালিনী গ্রামে ফিরে এসেছে। ঘিওয়ের চরে কোদাল চলছে। এতে করে সুজা নদীর জল বইয়ে দেওয়া হবে চর-কাশুন্দি মৌজায়। এখানে কি চরিত্রায়ণ, কি গল্পায়ন এর কোনোটাই বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে না।

(৪) অন্যান্য

আরো অনেকেই আধুনিক যুগ সমস্যা রূপায়িত করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। তাঁদের লেখনী এখনো চলচে। তাই গোটা বিবর্তনের ইতিহাস বর্তমানে দেওয়া সুকঠিন। তবু কীর্তির নামোল্লেখ সমীচীন। নুটবিহারী মুখোপাধ্যায় এঁকেচেন আধুনিক মরুর চিত্র তাঁর 'মরু যাত্রীতে'। অন্যদিকে মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙর ছেঁড়া নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল' উল্লেখযোগ্য। গুণময় মান্নার "লখীন্দর দিগর" সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে স্মরণীয় এ-প্রসঙ্গে। এখানকার নামেই ফুটে উঠেচে বৈশিষ্ট্য। তারপর অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁর 'কলের নৌকা' "কল্লোলে"এগিয়েচে, যা আজ"সুবিশাল জাহাজ" হ'য়ে উঠেচে। গ্রামকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে ফুটেচে 'দক্ষিণের বিল', যেখানে পরিচয় আছে নদী-নালা, ঝিল-বিলের। এখানে পল্লীপ্রকৃতিই কথা কয়ে উঠেচে। শুধু তাই নয়, এখানে আছে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও। এরপর স্মরণীয় তাঁর 'পদ্মদীঘির বেদেনী' [১৯৪৯]। এখানে ময়না নাম্নী বেদেনীর কথা বলা হয়েচে। সে ভৈরবের কাছে মন্ত্র শিখচে আর নয়ন যোগাচ্চে সাকরেদি। যাযাবরী মাতৃত্ব চাইল ভৈরবের কাছে। প্রকৃতি-পরিবেশে পদ্মদীঘি রূপায়িত হয়েচে কবিত্বে। রচনাশৈলী সরসতার পরিচায়ক। ছোট ছোট কথায় আঁকা হয়েচে ছবিগুলি। ময়নার জীবন এক জীবন্ত শোকা-স্তিকা। তার নিরুদ্দেশযাত্রায় বাউলের সুরই বেজে উঠেচে: "পদ্মদীঘির বেদেনী বিশ্বের যত অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা বহন করে পথে নামল। চঞ্চলা যাযাবরী যাত্রা করলো কোন যেন অজানা অনামা নিরুদ্দেশে।" আধুনিক উপন্যাসও তাই প্রগতি-প্রবাহে চলেচে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে, বুকে ল'য়ে অপূর্ণতার বেদনা। এতে আছে এক রকমের স্বপ্নবিলাস, যা খেয়ালীপনার নামান্তর। কল্পনার এই নতুন মোড়ে এসেচে 'চর কাশেম', যা গড়ে উঠেচে কীর্তিনাশার পদ্মার পাড় ও চরের দরিদ্র মুসলমান, জেলে ও কিষাণের জীবন নিয়ে। মেছো হাসেমের পুত্র কাসেম। তার বাবা মারা যায় যে দুর্ভিক্ষে, তা "ভূমিহীন কৃষকের বেকার জীবনের।" তাই দুটো স্বপ্নে মশগুল হয়েচে কাসেম—এক, চর কাসেম; দুই ফুলমন। এই ফুলমন "পদ্মার তীরের মেয়ে—পদ্মিনীর মতই তার রং।" নতুন দেশ ও নতুন মানুষ আসবে এই আশাতেই কাসেম স্বপ্ন দেখচে। এ স্বপ্ন আধুনিক সাহিত্যেরও। বাংলা সাহিত্য এগিয়ে চলেচে প্রগতির চাকায়। এর সামনে ভবিষ্যতের বরাভয়, পেছনে অতীতের জয়ধ্বনি আর যাত্রাপথে বর্তমানের পাথেয়। এ চলেচেই।

এ-ছাড়া বাস্তবায়নে এগিয়েচে যুগচিত্রাবলি। এরি পরিচিতি বহন করচে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "সূর্যমুখী", সমরেশ বসুর "উত্তরঙ্গ" ও "বিটিরোডের ধারে", কাজি আফসারউদ্দিন আহমদের "চর-ভাঙা চর" এবং নগেন দত্ত'র "আমরা আবার বাঁচব"। প্রথমের অভিযান চলেচে শহরের রূপান্তরে, পুরনোর নবায়নে। দ্বিতীয়ের

আকাশ বিস্তার লাভ করেচে অতীত ও বর্তমানে। "উত্তরঙ্গের" পটভূমি সিপাহী-যুদ্ধোত্তর বাংলা দেশ। তৃতীয়ের উপজীব্য হ'লো মোগল-ইংরেজ আমলের মধ্যবর্তী ঢাকা ও ধলেশ্বরী। আবহ-প্রধান উপন্যাস হিসেবে এ উল্লেখ্য। চতুর্থের রূপকল্পের ইঙ্গিত স্মরণীয়। এর ঘটনাকাল বিস্তৃত হয়েচে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-সাতচল্লিশ ঘিরে। "সূর্যমুখীর" পরিপূরক হিসেবে উল্লেখযোগ্য মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অন্তরীপ", যার অবক্ষয় চিত্রণ ফুটেচে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে। বিদেশের আমেজও এসেচে বাংলা সাহিত্যে। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিমল করের "ঝড় ও শিশির" এবং সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের "অন্য নগর"। প্রথমটির পটভূমিকা রচনা করেচে-মধ্যপ্রদেশের খনি অঞ্চল আর দ্বিতীয়টির লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড। এর পর দু'একটি বাঁকাচোরা ইঙ্গিতে ভাস্বর হয়েচে গ্রাম ও নগর। এরি রূপায়ণে উল্লেখ্য হ'লো রমেশ সেনের "গৌরীগ্রাম", সুশীল জানার "মহানগরী", সুশীল রায়ের "রুদ্রাক্ষ" ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আগামী"। এ-ছাড়া নামের বাহারে ফুটেচে কাহিনী পরিচয় যেমন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দনডাঙার হাট" ও "রাগিণী", গোলাম কুদ্দুসের "বাদী", সাবিত্রী রায়ের "স্বরলিপি", শৈলেন ঘোষের "তিনরঙ", চিত্তরঞ্জন ঘোষের "কালো আকাশ", মিহির আচার্যের "দিনবদল" এবং লীলা মজুমদারের "শ্রীমতী"। এই যে উপন্যাস পরিচিতি দেয়া হ'লো এ বড় গল্পেরই রকমফের। উপন্যাসের বৃহত্তর পরিবেশ এখানে অনুপস্থিত। এ বাংলা উপন্যাসেরই দৈন্য। এখনো বাংলায় সত্যিকার উপন্যাস খুব কমই গড়ে উঠেচে। টলস্টয়ের "বিগ্রহ ও শান্তি", টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউণ্টেন", রম্যা রলাঁর "জাঁ ক্রিস্তফ" বা গলস্‌ওয়ার্দির "ফরসাইট সাগা"র বিরাট পটভূমিকা এখনও বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। যা আছে তা প্রায় বড় গল্পেরই সগোত্রীয়। এই বৃহত্তর সৃষ্টির সাধনায় বঙ্গ সরস্বতী আজ সমাহিতা। ভবিষ্যতে-যে বঙ্গবীণা "শতবেণুবীণা" রবে বেজে উঠবে বৃহত্তর সাহিত্যিক আকাশে সে-আশায় বর্তমান স্পন্দমান।